# পঞ্চতন্ত্র

## ২য়. পর্ব

ডাক্তার রণজিৎ রায়কে
স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার
চিহ্নস্বরূপ

সৈ. মুজতবা আলী

# ঐতিহাসিক উপন্যাস

কলকাতায় এসে শুনতে পেলুম, বর্তমানে নাকি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মরসুম যাচ্ছে। আশ্চর্য লাগলো। বঙ্কিম আরম্ভ করলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সামাজিক - কিঞ্চিৎ রোমান্টিক-ঘ্যাষা—উপন্যাস, শরৎচন্দ্র লিখলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে, তারাশঙ্কর তথাকথিত নিম্ন সম্প্রদায় নিয়ে। এর পর আবার হঠাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস কি করে যে ডুব-সাঁতারে রিটার্নজার্নি মারলে ঠিক বোঝা গেল না। আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কাজেই আর পাঁচ-জনের মত হতভম্ব হতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাকি এখন জোর কাটতি। আবার একাধিক জন বলছেন, এগুলো রাবিশ। পাঁচজনের মত আমি আবার হতভম্ব।

কিন্তু এতে করে আমার ব্যক্তিগত উপকার হয়েছে। বছর পঁচিশেক পূর্বে আমাকে বিশেষ কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। সে যুগের প্রায় সব কেতাবপত্রই ফার্সীতে। বহু কষ্টে তখন অনেক পুস্তক যোগাড় করেছিলুম। তার কিছু কিছু এখনো মনে আছে। মাঝে মাঝে আজকের দিনের কোনো ঘটনা হুবহু 'শেষ মোগলদের' সঙ্গে মিলে যায় এবং লোভ হয় সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু সে সব কেতাবপত্র এখন পাই কোথায়? স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হবে।

কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক উপন্যাসই এক্ষণে আমার পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। ধরে নিন্, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাসই লিখছি।

মারাঠারা যখন গুজরাত সুবা (বা সুবে অর্থাৎ প্রদেশ, প্রভিন্স) দখল করে তার রাজধানী অহমদাবাদে ঢুকল তখন সেখানকার দেওয়ান (প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী) মুহাফিজ্‌খানার (আর্কাইভ্‌স্-এর) তাবৎ কাগজপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়ে গুজরাত-কাঠিয়াওয়াড়ের একখানা প্রামাণিক ইতিহাস লেখেন। বইখানি তিনি দিল্লীর বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ শাহ বাদশাহ রঙ্গীলাকে ডেডিকেট করেন। ইতিহাসের নাম 'মিরাৎ-ই-আহমদী'। পুস্তকের মোকদ্দমায়[১] তিনি

১ বাংলায় মোকদ্দমা বলতে মামলা, 'কেস' বোঝায়। আরবীতে অর্থ অবতরণিকা। 'কদম' মানে পদক্ষেপ ('কদম্ কদম বঢ়হায়ে যা'); মোকদ্দমা প্রথম পদক্ষেপ, অবতরণিকা। আবার প্রথম পদক্ষেপ বলে তার অর্থ মামলা রুজু

বাদশা-সালামৎকে উদ্দেশ করে বলেন, যে রাজনীতি অনুসরণ করার ফলে দিল্লীর বাদশারা গুজরাতের মত মাথার-মণি প্রদেশ হারালেন সে নীতি যদি না বদলানো হয় তবে তাবৎ হিন্দুস্থানই যাবে। সেই নীতির প্রাথমিক স্বর্ণযুগ, ক্রমবিকাশ ও অধঃপতন তিনি সেই ইতিহাসে ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করেছেন।

সেই ইতিহাস থেকে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখছি—তাই আবার বলছি ভুলচুক হলে ধরে নেবেন, এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একবার পর পর কয়েক বৎসর ধরে গুজরাতে বৃষ্টি না হওয়ার ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দলে দলে লোক অহমদাবাদ পানে ধাওয়া করে; সেখানে যদি দু'মুঠো অন্ন জোটে। অগণিত পিতামাতা তাদের পুত্র-কন্যাকে দাস-দাসীরূপে বিক্রয় করে দেয়। গুজরাতি মেয়েরা যে টাকা-মোহর ফুটো করে অলঙ্কার হিসেবে পরে সেগুলো পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয়। বিস্তর লোক উপবাসে মরলো।

গুজরাত সুবার সুবেদার (গভর্নর, কিন্তু বর্তমান গভর্নরের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষমতা ধরতেন এবং দেওয়ানের সঙ্গে এক জোটে প্রদেশ চালাতেন) তখন অহমদাবাদের সব চেয়ে ধনী শ্রেষ্ঠীকে পরামর্শের আমন্ত্রণ জানালেন। এইসব শ্রেষ্ঠীরা প্রধানত জৈন, এবং স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে করে বহু অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন (বর্তমান দিনের শ্রেষ্ঠী কস্তুরভাই লালভাই, হটিসিং এই গোষ্ঠীরই লোক)।

সুবেদার সেই শ্রেষ্ঠীকে শুধালেন, দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কিছু করা যায় কি না। শ্রেষ্ঠী বললেন, মালওয়া অঞ্চলে এবারে প্রচুর ফসল ফলেছে, সেখানে গম-চাল পাওয়া যাবে। তবে দুই প্রদেশের মাঝখানে দারুণ দুর্ভিক্ষ। মালবাহী গাড়ি লুট হবে। অতএব তিনি দুই শর্তে দুর্ভিক্ষ-মোচনের চেষ্টা করতে পারেন: ১) সুবেদার নিরাপদে মাল আনানোর জন্য সঙ্গে গার্ডরূপে ফৌজ পাঠাবেন, ২) মাল এসে পৌঁছলে সুবেদার শ্রেষ্ঠীতে মিলে যে দাম বেঁধে দেবেন মুদীরা যদি তার বেশী দাম নেয় তবে তদ্দণ্ডেই তাদের কঠোর সাজা দেবার জিম্মাদারী সুবেদার নেবেন। সুবেদার সানন্দে সম্মতি দিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠী সুবেদারের কাছ থেকে অর্থ-সাহায্য চান নি।

---

করার প্রথম কদম—এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে লাতিনে যাকে বলে প্রিমা ফাশি কেস্—কিন্তু বাঙলায় এখন মোকদ্দমা বলতে পুরো কেসটাই বোঝায়।

বাড়িতে এসে শ্রেষ্ঠী বংশানুক্রমে সঞ্চিত অর্থ, অলঙ্কার-জওহরাৎ বের করলেন ; স্ত্রী কন্যাকে তাঁদের অলঙ্কার পর্যন্ত খুলে দিতে বললেন।

সেই সমস্ত ঐশ্বর্যভাণ্ডার নিয়ে শ্রেষ্ঠীর কর্মচারীরা সুবেদারের ফৌজ সহ মালওয়া পানে রওয়ানা দিলেন। কিছুদিন পরেই মুখে মুখে অহমদাবাদে খবর রটে গেল, মাল পৌঁছল বলে। পথে লুটতরাজ হয় নি।

সেই সব গম ধান ও অন্যান্য শস্য যখন অহমদাবাদে পৌঁছল তখন শ্রেষ্ঠী তাঁর একাধিক হাভেলি—বিরাট চক মেলানো বাড়ি, একসঙ্গে গোষ্ঠীর বহু পরিবার একই বাড়িতে বসবাস করতেপারে—খুলে দিয়ে আঙ্গিনার উপর সেসব রাখলেন। তারপর সুবেদারের সঙ্গে হিসেব করলেন, কি দরে কেনা হয়েছে, রাহ-খর্চা ( ট্রান্সপোর্ট ) কত পড়েছে এবং তাহলে এখন কি দর বেঁধে দেওয়া যায়? সুবেদার বললেন, 'আর আপনার মুনাফা?' শ্রেষ্ঠী বললেন, 'যুগ যুগ ধরে মুনাফা করেছি ব্যবসা বাণিজ্যে। এ ব্যবসাতে করবো না। যা খর্চা পড়েছে সেই দর বেঁধে দিন। মুদীর সামান্য লাভ থাকবে।' দাম বেঁধে দেওয়া হল।

এবারে শুনুন, সব চেয়ে তাজ্জবকী বাৎ! শ্রেষ্ঠী শহরের তাবৎ মুদীদের ডেকে পাঠালেন এবং কোন্ মুদী কটা পরিবারের গম যোগায় তার শুমারী ( গণনা ) নিলেন। সেই অনুযায়ী তাদের শস্য দেওয়া হল। .সোজা বাঙলায় আজকের দিনে একেই বলে রেশনিং। এবং তাব সঙ্গে গোড়াতেই ব্যবস্থা, যাতে হোর্ডিং না হতে পারে। এবং ফেয়ার প্রাইস।

অহমদাবাদে চতুর্দিকে আনন্দোচ্ছ্বাস। ইতিমধ্যে শ্রেষ্ঠীর চর এসে জানালে অমুক মহল্লার দু'জন মুদী ন্যায্যমূল্য থেকে এক না দু' পয়সা বেশী নিয়েছে।

শ্রেষ্ঠী তৎক্ষণাৎ স্বয়ং সেই মহল্লায় গিয়ে সর্বজন সমক্ষে তদন্ত করলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সোজা সুবেদারের বাড়ি গেলেন। সুবেদার তখন ইয়ার-বক্সী[২] সহ গমাগমন সেলেব্রেট করছিলেন। কিন্তু পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বেরিয়ে এসে সব কিছু শুনে সেপাই পাঠালেন মুদীদের ধরে আনার জন্য। সাক্ষীসাবুদও যেন সঙ্গে সঙ্গে আনা হয়।

২ বক্সী বা বখশী ( বখ্শিশ কথা একই ধাতু থেকে ) অর্থ, একাউন্টেন্ট জেনারেল, অডিটার জেনারেল ও ফৌজের চীফ পে-মাস্টার—এ তিনের সমন্বয়। কায়স্থরা প্রধানত এই দায়িত্বপূর্ণ চাকরি করতেন। প্রধান বা মীর বখ্শী নিয়োগ করতেন স্বয়ং দিল্লির বাদশা-সালামৎ। আর সরাসরি নিয়োগ হতেন কাজী উল কুজ্জাৎ অর্থাৎ চীফ জাস্টিস, সদ্র্-উস্-সদ্র্ ( সেই অঞ্চলে বাদশা-সালামতের

তদ্দণ্ডেই সুবেদারের সামনে সাক্ষীসাবুদ তদন্ত-তফ্‌তীশ হয়ে গেল। প্রমাণ হয়ে গেল সত্যই তারা বেশী দাম নিয়েছে।

সুবেদার হুকুম দিলেন, বড্ড বেশী 'খেতে চেয়েছিল' বলে মুদী দুটোর পেট কেটে ফেলা হোক। তাই করা হল। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেল।

সবাই যেন এই দৃষ্টান্ত থেকে সজাগ সতর্ক হুঁশিয়ার খবরদার হয় সেই উদ্দেশ্যে সুবেদার হুকুম দিলেন, শহরের সব চেয়ে উঁচু দুটো উটের পিঠে তাদের লাশ বেঁধে দিয়ে নগর-পরিক্রমা করা হোক।

সমস্ত রাত ধরে তাই করা হল।

এরপর ঐতিহাসিক যেন নিতান্ত সাদামাটা ডালভাতের কথা বলছেন, ঐভাবে মন্তব্য করছেন, 'অতঃপর আর কেউ অন্যায্য মুনাফা করার চেষ্টা করে নি।'

( আমার হাতে যে পাণ্ডুলিপিখানা পৌঁচেছিল তাতে দেখি এ জায়গাটায় এ যুগের কোন্ এক সুরসিক পাঠক লিখছেন, 'we are not surprised!' )

* * *

আমি আর কি মন্তব্য করবো? রেশনিং, ফেয়ার-প্রাইস, নো চান্‌স্ ফর হোর্ডিং, তন্মুহূর্তে তদন্ত, তদ্দণ্ডে দণ্ড, জনগণকে হুঁশিয়ারী দেওয়া এসবই হয়ে গেল চোখের সামনে। অবশ্য আমি নিরীহ প্রাণী, পেট কেটে নাড়িভুঁড়ি বের করার আদেশ শুনলে আমার গা শিউরে উঠে। তবে যারা দিনের পর দিন রেশন-শপের লাইনে দাঁড়িয়েছেন, চোখের সামনে কালো-বাজার এবং যাবতীয় অনাচার দেখেছেন, পুত্রকন্যাকে কচুঘেচু খাওয়াতে বাধ্য হয়েছেন এবং বিত্তশালীরা কি কৌশলে তোফা খানাপিনা করছেন সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁরা হয়তো উল্লাস বোধ করবেন। আমি আপত্তি করবো না—কারণ পূর্বেই বলেছি, আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি॥

---

আপন জমিজমা তদারকের জন্য, তথা কেউ নিঃসন্তান মারা গেলে তার সম্পত্তি অধিকার করতে)। সরকার=চীফ-সেক্রেটারী, কানুনগো=লিগেল রিমেম্‌ব্রেনসার পরে নিযুক্ত হতেন। বখ্‌শীর কাছ থেকে টাকা পেয়ে ব্যবসায়ীরা সঙ্গে সঙ্গে সামনের বাজারে হুণ্ডি কাটতো বলে সে বাজারকে 'বখ্‌শী বাজার' বলা হত। বখ্‌শী সরকার ইত্যাদি বড় বড় এডমিনিস্‌ট্রেটিভ চাকরি প্রধানত কায়স্থরাই করতেন। ইংরেজ মোটামুটি এই পদ্ধতিই চালু রাখে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে কথা হচ্ছিল। আর বলছিলুম, এতে করে আমার বড্ডই উপকার হয়েছে। ইতিহাস নিজেকে মাঝে মাঝে পুনরাবৃত্তি করে। চোখের সামনে যখন তাই কোনো কিছু একটা ঘটে, তখন স্মৃতিপথে আসে প্রাচীন দিনের ঐরকম কোনো একটি ঘটনা। প্রথম যৌবনে কোনো এক প্রাচীন ইতিহাসে পড়েছি। সে বই এখন আর পাবো না। একে ফার্সীতে লেখা, তদুপরি বইখানা হয়তো সে ভাষার পুস্তকের মাঝেও দুষ্প্রাপ্য। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করলে হয়তো ঐতিহাসিকের প্রতি অবিচার করা হবে।

ইতিমধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস এসে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কেউ যদি ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিয়ে দেয় তবে নিঃশরমে বলবো, আমি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছি।

গুজরাতের ইতিহাস 'মিরাৎ-ই-আহমদী'র কথা হচ্ছিল। বইখানা লেখা হয়, নাদির শাহ যখন ভারতবর্ষ লণ্ডভণ্ড করে যান মোটামুটি সেই সময়। এ পুস্তক গ্রন্থকার আরম্ভ করেছেন জৈন সাধু মেরুতুঙ্গাচার্যের সংস্কৃতে লেখা গুজরাতের প্রাক্-মুসলিম যুগের ইতিহাসের[১] সারাংশ নিয়ে, তারপর আছে গজনীর সুলতান মাহমূদ[২] কর্তৃক সোমনাথ আক্রমণ।

সুলতান মাহমূদ এমনিতে বলতেন, তিনি কাফিরেব বিরুদ্ধে জিহাদ করেন, কিন্তু সিন্ধুদেশ সপ্তম অষ্টম শতাব্দী থেকে মুসলমান অধিকারে। সে দেশ কি করে আক্রমণ করা যায়? সুলতান বললেন, 'সিন্ধুদেশের মুসলমানরা যদিও কাফির নয়, তবু কাফির-তুল্য—তারা হেরেটিক; অতএব আক্রমণ করা যায়।'

তা সে যাই হোক, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল কাঠিওয়াড়ের সোমনাথ মন্দিরের বিরাট ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করা। সেটা সিন্ধুদেশ জয় না করে হয় না।

কিন্তু তার পরই আসে কচ্ছের রাণ। সেটা অতিক্রম করা সিন্ধু-বিজয়ের চেয়েও কঠিন। মাহমূদের সাঙ্গোপাঙ্গ তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল হলেন।

কচ্ছের রাণ অতিক্রম করতে গিয়ে মাহমূদের ফৌজের অসংখ্য সৈন্য ও অশ্ব

---

১ সংস্কৃত বইখানার নাম আমার মনে পড়ছে না। বোধ হয় 'প্রবন্ধ চিন্তামণি'।

২ মাহমূদ ও মুহম্মদ দুই ভিন্ন নাম। যে রকম হাসন, হুসেন ও হাস্সান (সুহ্রাওয়ার্দী), তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নাম।

তৃষ্ণায় প্রাণ হারালো। চোরাবালিতেও অনেকে। তখনকার দিনের ঐতিহাসিকরা তার জন্য গাইডকে জিম্মেদার করেছেন; সে নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কিন্তু মাহমুদকে বাধ্য হয়ে ঐ পথেই ফিরে যেতে হয়েছিল। মাহমুদ ছিলেন ল্যাণ্ডলক্‌ট্‌ (অর্থাৎ যে দেশের সঙ্গে সমুদ্রের কোনো সংস্পর্শ নেই) দেশের লোক—হিটলারেরই মত।[৩] তাই দ্বারকা থেকে নৌবহর যোগাড় করে 'ঠাট্টা' (করাচীর কাছে প্রাচীন বন্দর) যাবার সাহস করেন নি।

* * *

এর পর পাগলা রাজা মুহম্মদ তুগলুক এই কচ্ছের রাণের কাছে মার খান।

ফার্সী ঐতিহাসিক লিখেছেন 'তগী', ফার্সীতে 'ঠ' ধ্বনি নেই—শব্দটা বোধ হয় তাই 'ঠগী'। সেই তগী মধ্য-পশ্চিম ভারতে লুটতরাজ আরম্ভ করে। বাদশাহী ফৌজ বার বার তার বিরুদ্ধে অভিযানে বেরিয়ে বার বার বিফলমনোরথ হয়ে দিল্লি ফিরে আসে। মুহম্মদ রেগে টঙ। বললেন, 'আমি স্বয়ং যাবো।'

একটা সামান্য ডাকুর বিরুদ্ধে স্বয়ং হুজুর যাবেন!

না যাবোই।

হুজুর স্বয়ং আসছেন জেনে তগী অহমদাবাদ পালালো। হুজুর বললেন, চলো অহমদাবাদ। পারিষদরা মহা অসন্তুষ্ট। সেই সুদূর অহমদাবাদ—দিল্লি থেকে কত দিনের রাস্তা! হুজুর কিন্তু গোঁ ছাড়লেন না। অহমদাবাদে পৌঁছলে পর জানা গেল, তগী পালিয়েছে কাঠিয়াওয়াড়ে। হুজুর বললেন, 'চলো কাঠিয়াওয়াড়।' কিন্তু তখন বর্ষা নেমে গিয়েছে। এবং শ্রান্তি-ক্লান্তিতে হুজুরের হল জ্বর। কি জ্বর, আমি বর্ণনা থেকে বুঝতে পারি নি। ম্যালেরিয়া খুব সম্ভব নয়। ম্যালেরিয়া বোধ হয় এ-দেশে পরে এসেছে। তা সে যাই হোক, হুজুর তামাম বর্ষাকালটা অহমদাবাদে জ্বরে ধুঁকে ধুঁকে রোগা-দুবলা হয়ে গেলেন। কিন্তু বর্ষা-শেষেও গোঁ ছাড়লেন না—তাঁকে যে পাগলা রাজা বলা হত সেটা প্রধানত তাঁর গোঁর জন্যই—'চললেন কাঠিয়াওয়াড়। তগী পালালো কচ্ছে। হুজুর গেলেন কচ্ছ। তগী পালালো কচ্ছের রাণের উপর দিয়ে সিন্ধুদেশে। সে ডাকাত—রাণের কোথায় কি, জানে—সেখানে একাধিক বার আশ্রয় নিয়েছে। তদুপরি

---

৩ ফ্রান্স জয়ের পর হিটলার ইংলণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। এর নাম অপারেশন 'সী লায়েন' (সমুদ্রসিংহ, 'জে লোয়ে') কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা বাতিল করে দেওয়া হয়। তার বহুবিধ কারণ নিয়ে নানা গুণী নানা আলোচনা করেছেন। অন্যতম কারণ বলা হয়, হিটলার ল্যাণ্ডলক্‌ট্‌ দেশের লোক ছিলেন

সে তো আর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাচ্ছে না ; তার দানাপানির আর কত-টুকুই বা দরকার।

এবারে পারিষদরা তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। গজনীর মাহমুদ বাদশা যে রাণে কি রকম নাজেহাল হয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাজসভার সরকারী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনী ( ইনি 'দিল্লি দূর অস্ত'-এর সাধু নিজামুদ্দীন আউলিয়া ও কবি আমির খুসরুর নিত্যালাপী বন্ধু ছিলেন ); তিনিও নিশ্চয়ই প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করেছিলেন। তদুপরি তুগলুক নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। ইতিহাস ভূগোল উত্তমরূপেই জানতেন। কিন্তু হিটলার যদিও অত্যুত্তমরূপেই নেপোলিয়নের রুশ-অভিযান ও তার মারাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং যদিও তাঁর সেনাপতিরা তাঁকে বার বার রুশ-অভিযান থেকে নিরস্ত থাকতে উপদেশ দেন, তবুও তিনি সেই কর্মটি করেছিলেন। এখানেও তাই হল। তুগলুক নিরস্ত হলেন না।

কচ্ছের রাণে বাদশা মুহম্মদ তুগলুকের কী নিদারুণ দুরবস্থা হয়েছিল, তার বর্ণনা একাধিক ঐতিহাসিক দিয়েছেন। আজ আমার আর ঠিক মনে নেই, তাঁর সৈন্য এবং ঘোড়া খচ্চরের ক'আনা বেঁচেছিল, আর ক'আনা মরেছিল।

এ সময়ের একটি ঘটনা ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন। রোগে জীর্ণ দুর্বল দেহ নিয়ে ঘোড়ার উপরে বসে মুহম্মদ তুগলুক ধুঁকতে ধুঁকতে এগোচ্ছেন। এমন সময় তিনি ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরনীকে ডেকে পাঠালেন—কাউকে ডেকে না পাঠালে হুজুরের কাছে যাবার কারো অনুমতি ছিল না। বরনী কাছে এলে তুগলুক তাঁকে বললেন, 'আচ্ছা বরনী, তুমি তো জানো আমি আমার প্রজাদের কতখানি ভালোবাসি। আমি যে-সব ফরমান-হুকুম জারি করেছি সে তো একমাত্র তাদেরই মঙ্গলের জন্য। তবে তারা একগুঁয়েমি করে আমার আদেশ অমান্য করে কেন ?' তারপর শুধোলেন, 'আচ্ছা বরনী, তোমার কি মনে হয়, আমি বড্ড কড়া হাতে শাসন করেছি, প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শাস্তি দিয়েছি ? তবে কি এখন আমার উচিত আরো ক্ষমা-দয়ার সঙ্গে শাসন করা ?'

---

বলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে দুআভুআ করতেন। গ্রীস জয় করার পর তিনি তাই মণ্টাদ্বীপ আক্রমণ ক্রমাগত পিছিয়ে দিয়ে ভুল করেন। ফলে রমেলও পুরো সাহায্য পেলেন না। এ-দেশের মোগল-পাঠান রাজাদের বেলাও তাই। নৌ-বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না বলে তাঁরা ইংরেজকে অবহেলা করেন। ফলে ভারতবর্ষ সমুদ্রপথে বিজিত হয়।

বরনী লিখছেন, 'এই শেষকালে যদি হুজুর হঠাৎ তাঁর নীতি বদলান তবে হয় তো আরো বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে ভেবে আমি নীরব থাকাটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলুম।'

এদিকে দিল্লিতে বসে তুগলুকের প্রধান মন্ত্রী পড়েছেন মহাবিপদে। হুজুরের কোনো খবর নেই। রাণ থেকে তো দূত পাঠানো যায় না, যে দিল্লি আসবে। দূত আর তার পার্টি পথে জল পাবে কোথায়? পিছনপানে অবশ্য মৃত্যু—সম্মুখ দিকে তবু বাঁচবার আশা আছে। কাজেই দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, হুজুরের কোনো খবর নেই। প্রধান মন্ত্রীর ভয়, খবরটা রটে গেলে তুগলুকের কোনো আত্মীয় বা অন্য কোনো দুঃসাহসী রাজা মরে গেছেন এই সংবাদ রটিয়ে কিছু সৈন্যসামন্ত যোগাড় করে দিল্লির তখতে না বসে যায়। রাজকোষ তখন তার হাতে এসে যাবে এবং ফলে সে আরো সৈন্য সংগ্রহ করে নেবে। হুজুর যখন ফিরে আসবেন তখন তাঁর সঙ্গের সৈন্যদল পরিশ্রান্ত ক্লান্ত। হুজুর তখন লড়াই দেবেন কি করে? প্রধান মন্ত্রী তখন শুরু করলেন স্রেফ ধাপ্পা। হুজুর রোজ সকালে যে ঝরোকায় দাঁড়িয়ে দেখা দিতেন সেখানে প্রধান মন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলতেন, 'বড় আনন্দের বিষয়, আজও হুজুরের চিঠি পেয়েছি। হুজুর বগাল তবীয়তে আছেন। শিগগীরই রাজধানীতে ফিরে আসছেন।' তারপর আঙ্গরখার (অঙ্গরক্ষা) ভিতরের জেব থেকে বগাস্ চিঠি বের করে, গভীর সম্মানের সঙ্গে সেটি চুম্বন করে উচ্চকণ্ঠে সেটি পড়ে শোনাতেন—আগাগোড়া নিছক গুল! তার পর আরো সসম্মানে চিঠিখানা চুম্বন করে পকেটে রেখে দিতেন।

প্রধান মন্ত্রী হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ধাপ্পা, গুল, থিয়েটারি সব কিছুকা এলেম পেটে ধরতে হয়।

ওদিকে অশেষ ক্লেশ ভুগে হুজুর সিন্ধুনদের তীরে এসে পৌঁছলেন। তগীর কি হল আমার মনে নেই। পৌঁছেই হুজুর দিল্লি-পানে ঘোড় সওয়ার রওনা করলেন। তারা দিল্লি পৌঁছলে প্রধান মন্ত্রীর ধড়ে জান এল।

হুজুর আর কচ্ছের রাণ ধরে দিল্লি ফিরলেন না। স্থির হল, নৌকায় করে সিন্ধু উজিয়ে উজিয়ে তারই উপনদী দিয়ে লাহোর পৌঁছবেন। উত্তম ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে রোজার মাস বা রমজান এল। হুজুর বললেন, 'উপোস করবো।' আমীর-ওমরাহ বললেন, 'হুজুর একে অসুস্থ, দুর্বল। তদুপরি ভ্রমণকালে উপবাস করা ইচ্ছাধীন—কুরান শরীফের আদেশ।' হুজুর তেড়ে বললেন, 'যে মুসাফিরীতে (ভ্রমণে) তকলীফ হয় আল্লাতালা সেইটের কথাই বলেছেন। আমরা তো যাচ্ছি আরামসে নৌকায় শুয়ে শুয়ে। আমি উপোস করবোই।'

পুনরায় গোঁ। তর্ক করবে কে? মুহম্মদ তুগলুকের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করবার মত এলেম কারো পেটে ছিল না। (আরেক ধনুর্ধর পণ্ডিত ছিলেন ঔরঙ্গজেব)।

কয়েকদিন পরে ধরা পড়ল একটি চমৎকার মাছ। কিন্তু এ জাতের মাছ দিল্লিবাসীরা কখনো দেখেন নি। তারা বললেন, 'যে মাছ চিনি নে সেটা খাব না।' হুজুর বললেন, 'কুরান, হদীস কোনো শাস্ত্রে এ জাতীয় মাছের বর্ণনা দিয়ে খেতে যখন বারণ করা হয় নি তখন আমি ইটি খাবই।' আবার গোঁ।

খেলেন। দারুণ তেলওলা মাছ ছিল। হুজুরের শরীরও ছিল রোগা, রাণের ধকলে দুর্বল। পেট ছাড়লো। কিছুতেই বন্ধ হয় না। বোধ হয় তৃতীয় দিনে হুজুর ইন্তিকাল করলেন, অর্থাৎ পটল তুললেন।

ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন লিখছেন, 'এই প্রকারে হুজুর তাঁর অবাধ্য প্রজাকুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে রক্ষা পেলেন; প্রজাকুলও হুজুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলো!'

* * *

আমি বঙ্গসন্তান। মাছের নামে অজ্ঞান। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, বাদশা-সালামৎ কি মাছ খেয়ে শহীদ হলেন!

বরনী, মিরাৎ দিয়েছেন মুসলিম চান্দ্র মাসের হিসাবে তুগলুকের মৃত্যুদিবস। তার থেকে কোন্ ঋতুতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ধরা যায় না। বিস্তর ক্যালেণ্ডার ঘেঁটে যোগবিয়োগ করে বের করলুম ঋতুটি।

আমার এক সিন্ধী দোস্ত আছেন, ইতিহাসে তাঁর বড়ই শখ। তার বাড়ি গিয়ে তাঁকে শুধালুম।

তিনি বললেন, 'নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, পাল্লা মাছ।'

* * *

গঙ্গা উজিয়ে যেটা আসে বা একদা আসতো, সেটা ইলিশ—হিল্‌সা। নর্মদা উজিয়ে ঐ মাছটা যখন আসে তখন ব্রোচের (broach—ভৃগুকচ্ছ) লোক এটাকে বলে মদার, পার্সীরা বলে বিম্। সিন্ধু উজলে এই মাছকেই বলে পাল্লা।

অনেকেই অনেক কিছু চড়ে স্বর্গে যান, ঐরাবত, পুষ্পকরথ, কত কি?

শাহ-ইন্-শাহ বাদশা-সালামৎ মুহম্মদ তুগলুক শাহ ইলিশ চড়ে স্বর্গে গেলেন। স্বর্গে যাবেন না তো কোথায় যাবেন? ইলিশ খেয়ে যে প্রাণ দেয় সে তো শহীদ—মার্টার!

# দর্শনাতীত

ছন্নের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি বিরাট বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে। সবে এসেছি 'ছ্যাশ' থেকে—হাইকোর্টটি দেখিয়ে দেবার মতও কোনো খাটাশকে পাচ্ছি নে। কিন্তু রমণীজাতি দয়াশীলা—বেদরদীরা বলে হরবকৎ শিকার-সন্ধানী—আমার সঙ্গে কথা কইলে নিজের থেকে। আমি তখন বিবর্ণ বিস্বাদ বদখদ কোন এক মাংস, তদধিক বিজাতীয় হর্স-ক্যাবেজ ( সচরাচর এ বস্তু ঘোড়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেওয়া হয় ) খাবার চেষ্টা করছি, চোখের জলে নাকের জলে। সব শুনে বললে, 'দর্শন? তাহলে শ্মিটকে মিস্ করো না; বুড়ার বয়স আশী পেরিয়ে গেছে, কখন যে পটল তুলবে ( জর্মনে বলে 'আপজেগ্‌লেন' ) ঠিক নেই।'

পোড়ার দেশে লেকচার-রুমে সীট রিজার্ভ করতে হয়। পাগুক্ত যুবতীটি ধানী-লংকার মত এফিশেণ্ট। সাত দিন পরে প্রথম লেকচারে গিয়ে দেখি, একদম পয়লা কাতারে পাশাপাশি দু'খানা চেয়ার রিজার্ভ করে বসে আছে প্রফেসারের চেয়ার থেকে হাত আষ্টেক দূরে।

অধ্যাপক এলেন ঘণ্টা পড়ার মিনিট পাঁচেক পরে। বয়েস আশী না, মনে হবে সোয়া-শো—যেভাবে আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ঘরে ঢুকলেন। ইয়া বিরাট লাশ। ফ্রলাইন উরজুল লাফ দিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর দিকে। বুড়ো রোষকষায়িত লোচনে তাঁর দিকে তাকিয়ে হাত দু খানা অল্প তুলে ধরলেন। উরজুল এক দিকের ওভারকোটটা তাঁর দেহ থেকে মুক্ত করার পর তিনি অতি কষ্টে শরীরে একটু মোচড় দিলেন। এই গুহ্যতম তান্ত্রিক মুষ্টিযোগ প্রসাদাৎ তিনি তাঁর ওভারকোটের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করলেন। শেষনাগকেও বোধ হয় তাঁর বাৎসরিক খোলস থেকে মুক্ত হতে এতখানি মেহন্নৎ বরদাস্ত করতে হয় না।

ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্মে উঠে চেয়ারে আসন নিলেন। সচরাচর অধ্যাপকরা প্ল্যাটফর্মের নিকটতম কোণে উঠেই বক্তৃতা ঝাড়তে আরম্ভ করেন। ইনি চুপচাপ বসে রইলেন ঝাড়া পাঁচটি মিনিট। ধবধবে সাদা কলারের উপর হাঁড়িপানা তাঁর বিরাট মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তাতে অন্তত ডজনখানেক কাটাকুটির দাগ। লেকচার আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ফিস্‌ফিস্ করে কথা কইতে বারণ নেই। আমি উরজুলকে শুধালুম, 'মুখে ওগুলো কিসের দাগ?'

'ফেনসিঙের। সিনেমাতে দেখ নি, লম্বা সরু লিকলিকে তলওয়ার দিয়ে

একে অন্যের কলিজা ফুটো করার পায়তারা কষে? পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তলওয়ার নাকের কাছে এলেও ইনি পিছু-পা তো হনই নি, মাথাটা পর্যন্ত পিছনের দিকে ঠেলে দেন নি। প্রত্যেকটি কাটাতে ক'টা স্টিচ লেগেছিল ওঁকে শুধোতে পারো।

আমি বললুম, 'উনি না দর্শনের অধ্যাপক!'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর বাপ-পিতামো ছিলেন কট্টর প্রাশান ঐতিহ্যের পাঁড় জেনারেল গুষ্টি। তাঁদের বর্মের মত শক্ত হৃদয় ভেঙে ইনি দর্শনের অধ্যাপক হয়ে গেলেন। কৈশোরে বোধ হয় সে মতলব ছিল না। তাই ছুঁদে ছুঁদে ফেনসারদের চেলেঞ্জ করে এসব অস্ত্র-লেখার কলেক্‌শন্ আপন মুখে নিয়ে বাকী জীবন দর্শন পড়াচ্ছেন। তাইতে বাপ-দাদার ততোধিক মনস্তাপ যে, এমন পয়লানম্বরী তলওয়ারবাজ হয়ে গেল মেনিমুখো মেস্টার-মেলের একজন।'

আমি বললুম, 'পেন্ ইজ মাইটিয়ার দেন সর্ড!'

'ছোঃ! ভদ্রলোক জীবনে এক বর্ণ কাগজে কলমে লেখেন নি—সাত ভলুমি কেতাব দূরে থাক, এক কলমের প্রবন্ধ পর্যন্ত না। কলমই ওর নেই। বোধ হয় টিপসই দিয়ে—'

অধ্যাপক ছাদ-ছোঁয়া গ্যালা'রর উপর-নিচ ডান-বাঁ'র উপর চোখ বুলিয়ে আরম্ভ করলেন—ওঃ, সে কি গলা! যেন নাভিকুণ্ডলী থেকে প্রণবনাদ বেরুচ্ছে, 'মাইনে ডামেন্ উন্‌ট্ হেরেন্!'—'আমার মহিলা ও মহোদয়গণ!' তার পর দম নিয়ে বললেন, 'অন্যবারের মত এবারেও আমি রেকটরকে'—তার পর গলা নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেও সমস্ত ক্লাসই শুনতে পেল—'আস্ত একটা গাধা—'

আমার তো আক্কেল গুড়ুম। রেকটর যিনি কিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কর্তা, তাঁকে গর্দভ বলে উল্লেখ করা—তা সে বিড়বিড় করেই হোক আর রাসভ-কণ্ঠেই হোক—এ যে অবিশ্বাস্য!

অধ্যাপক বলে যেতে লাগলেন, 'রেকটরকে আমি অনুরোধ জানালুম, আমাকে এই টাম থেকে নিষ্কৃতি দিতে। অবাচীন বলে কিনা, আমাকে না হলে তার চলবে না। এ উত্তর আমি ইতিপূর্বেও শুনেছি। তার পূর্বের রেকটর—' আবার বিড়বিড় করলেন, 'বলদ, বলদ! স্রেফ বলদ—তাকেও আমি একই অনুরোধ করেছিলুম, এবং একই উত্তর পেয়েছিলুম। তার পূর্বের রেকটর—কিন্তু কাহিনী সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন নেই—এবং তার পূর্বেরও সবাই একই উত্তর দেয়। বস্তুত, মাইনে ডামেন্ উন্‌ট্ হেরেন্, গত বাইশটি বৎসর ধরে আমি এই একই উত্তর শুনে আসছি। মনে হচ্ছে, অরিজিনালিটি রেকটর সম্প্রদায়কে

এড়িয়ে চলেন। তা সে যাক, তাদের বক্তব্য, আমাকে ছাড়া চলবে না, আমি ইনডেস্‌পেন্‌সিবল।'

এবারে তিনি স্বয়ং সিন্ধী বলদের মত ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তবে কি সাতিশয় সন্তাপের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, জর্মনি এমনই চরম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, এদেশে আর দার্শনিক নেই? কিন্তু এই আমার শেষ টার্ম। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।' তার পর চোখ বন্ধ করে খুব সম্ভব প্রথম বক্তৃতায় প্রথম কি বস্তু দিয়ে আরম্ভ করবেন তার চিন্তা করতে লাগলেন। উরজুল আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন, 'তাঁর শেষ টার্ম। এ ভয় তিনি নিদেন পঁচিশ বচ্ছর ধরে দেখাচ্ছেন—প্রতি টার্মের গোড়ায়।' বুড়ার চোখ বন্ধ হলে কি হয়, কান দিব্য সজাগ। চোখ খুলে বললেন, 'নো, আবার নো। এই আমার শেষ টার্ম—কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

তার পর গ্রীক দর্শন নিয়ে আরম্ভ করলেন। তাঁর পড়াবার পদ্ধতি অনুকরণ করা অসম্ভব। কারণ, তাঁর পড়ানোটা সম্পূর্ণ নির্ভর করতো তাঁর স্মৃতিশক্তির উপর। সে স্মৃতিশক্তি বিদ্বিদত্ত। কোন্‌ সালের, কোন্‌ বইয়ের, কোন্‌ অধ্যায়ে, এমন কি মাঝে মাঝে কোন্‌ পাতায় কি তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো বলে যেতে লাগলেন কোনো প্রকারের নোট না দেখে। প্রত্যেকটি সেন্টেন্স স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভাষা সরল। এবং মাঝে মাঝে প্লাতো, আরিস্ততল বোঝাতে গিয়ে হঠাৎ মারেন দু'হাজার বছরের ডুব-সাঁতার। এ যুগের কে তার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা করেছেন, কোথায়, কোন্‌ পরিচ্ছেদে—তার সবিশদ বর্ণন। আমি হতভম্ব।

ঘণ্টা পড়তে আস্তে আস্তে উঠলেন। ফ্রলাইন উরজুল তাঁকে পুনরায় ওভার-কোট পরিয়ে দিলেন। ধীরে মন্থরে করিডরে নামলেন।

আমি উরজুলকে বললুম, 'এ কী কাণ্ড! গণ্ডাখানেক রেকটরকে ইনি গাধা-বলদের সঙ্গে—?'

'ওঃ! এঁরা সবাই এসব জানেন। এঁরা সবাই তাঁর ছাত্র।'

'ওকে ছুটি দেয় না কেন?'

'সকলেরই বিশ্বাস, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল তুলবেন বলে। মাধ্যাকর্ষণ নয়, দর্শনাকর্ষণ তাঁকে ইহলোকে আটকে রেখেছে।'...

এখানে রোল-কল হয় না। টার্মের গোড়াতে ও শেষে আপন আপন 'স্টুডেন্টস বুকে' অধ্যাপকের নাম দু'বার সই করিয়ে নিতে হয়।

গোড়ার দিকে ভিড় ছিল বলে হাল্কা হলে পর আমি আমার 'বুক' নিয়ে পাতলুম। এযাবৎ অন্য কারো সঙ্গে তিনি বাক্যবিনিময় করেন নি। আমাকে

দেখে চেয়ারে আরামসে হেলান দিয়ে বললেন, 'আঃ! বাঃ বাঃ! তার পর? আচ্ছা। বলুন তো আপনি কি জর্মন বেশ বুঝতে পারেন?'

আমি বললুম, 'অল্প, অল্প।'

'বেশ, বেশ। তা—তা, আপনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন?'

'ইণ্ডিয়া।'

কেন যে এতখানি তাজ্জব হয়ে তাকালেন বুঝতে পারলুম না। বললেন, 'ইণ্ডিয়া? কিন্তু ইণ্ডিয়াই তো দর্শনের দেশ। আপনি এখানে এলেন কেন?'

আমি সবিনয় বললুম, 'নিশ্চয়ই, কিন্তু আধুনিক দর্শনে জর্মনির সেবা ও দান তো অবহেলার বিষয় নয়।'

কী আনন্দে, কী গর্বে অধ্যাপকের সেই কাটাকুটি-ভরা মুখ যে প্রসন্ন হাস্যে ভরে গেল, সেটি অবর্ণনীয়। শুধু মাথা দোলান আর বলেন, 'বস্তুত তাই, প্রকৃতপক্ষে তাই।'

এবারেও যখন তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করলেন তখন আমি যেন 'তুমি' শুনতে পেলুম। তাঁর বিরাট সাদা মাথাটা আমার দিকে ঠেলে কাছে এনে বেদনা-ভরা গলায় বললেন, 'কিন্তু জানো, ভারতীয় দর্শন—অবশ্য সব দর্শনই দর্শন—শেখবার সুযোগ আমি পাই নি। ব্যাপারটা হয়েছে কি, আমার যৌবনে ভারতীয় দর্শনের জর্মন-ইংরিজি অনুবাদ পড়তে গিয়ে দেখি সব পরস্পরবিরোধী বাক্যে পরিপূর্ণ। আমি বললুম, "এ কখনই হতে পারে না। ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা এরকম কথা বলতে পারেন না। যাঁরা অনুবাদ করেছেন তাঁরা কতখানি জর্মন জানেন জানি নে, কিন্তু দর্শন জানেন অত্যল্প, এবং ভারতীয় দর্শনে তাঁদের অপরিচিত যে দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিকোণ সেটা আদৌ বুঝতে পারেন নি।" ছেড়ে দিলুম পড়া, বিরক্তিতে। কিন্তু জানো, বছর দশেক পূর্বে আমার ছাত্র—' তিনি রেকটরের নাম করলেন—'অমুক—ভারী ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে—আমাকে বললে, এখন নাকি কম্পিটেন্ট অনুবাদ বেরুচ্ছে। কিন্তু ততদিনে আমি বড্ড বুড়িয়ে গিয়েছি। নূতন করে নূতন "স্কুলে" যাবার শক্তি নেই। বড় দুঃখ রয়ে গেল।'

আমি একটু ভেবে যেন সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'তার জন্য আর অত ভাবনা কিসের, স্যর? হিন্দুরা পরজন্মে বিশ্বাস করে। আপনি এবারে জন্ম নেবেন কাশীর কোন দার্শনিকের ঘরে।'

এবারে তাঁর যে কী প্রসন্ন অট্টহাস্য! শুধু বলেন, 'ঐ তো! ঐ তো! বাঃ, বাঃ! বেশ, বেশ। যাক, শেষ দুশ্চিন্তা গেল।'

তারপর শুধালেন, 'বক্তৃতা সব বুঝতে পারো তো ?'

আমি বললুম, 'আজ্ঞে, জর্মন ভালো জানি নে বলে মাঝে মাঝে বুঝতে অসুবিধে হয়।'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন হাত তুলো ; আমি সব ভালো করে বুঝিয়ে বলবো।'

আমি কাঁচু-মাচু হয়ে বললুম, 'আমার জর্মন জ্ঞানের অভাববশত সমস্ত ক্লাস সাফার করবে—এটা কেমন যেন – '

গুরু গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—প্রত্যেকটি শব্দ যেন আমার বুকের উপর হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে—'আমি একশজনকে পড়াবো না একজনকে পড়াবো, কাকে পড়াবো আর কাকে পড়াবো না, সেটা স্থির করি একমাত্র আমি।'

* * *

আমার দুর্ভাগ্য, আমি খুব বেশী দিন তাঁর কাছ থেকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাই নি। পরের টার্মেই তিনি ওপারে চলে যান।

তার পর প্রায় ৩৫ বৎসর কেটে গিয়েছে।

আমার ব্যক্তিগত সংস্কার যে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পৃথিবী নামক জায়গাটিতে একবারের বেশী দু'বার পাঠান না। একই নিষ্ঠুর স্থলে একাধিকবার পাঠিয়ে একই দণ্ড দেওয়ার মধ্যে কোনও বৈদগ্ধ্য ( রিফাইনমেণ্ট ) নেই। তবু যখন কোনো যুবাজনের মুখে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা শুনে মনে হয়, এ-তরুণ এর কিছুটা গভীরে ঢুকতে পেরেছে, তখন আপন অজান্তে তার চেহারায় জর্মনগুরুর বিরাট কাটাকুটি-ভরা, হাঁড়াপানা চেহারার সাদৃশ্য খুঁজি॥

## মা-মেরীর রিস্ট-ওয়াচ

একদা রম্য রচনা কি রীতিতে উত্তমরূপে লেখা যায়, এই বাসনা নিয়ে কলেজের ছেলের বয়সীরা আমাকে প্রশ্ন শুধাতো ; অধুনা শুধোয়, ঐতিহাসিক উপন্যাস কি প্রকারে লেখা যায় ? আমি বাঙালী, কাজেই বাঙালীর স্বভাব খানিকটে জানি—পাচু, ভূতো আর পাঁচজন যে ব্যবসা করে—যথা পাব্লিশিং হাউস কিংবা লণ্ড্রী—পয়সা কামিয়েছে, সে সেইটেই করতে চায়, নূতন ব্যবসার ঝুঁকি নিতে সে নারাজ। অতএব হাল-বাজারে যখন ঐতিহাসিক উপন্যাস ছেড়ে দিয়ে কালোবাজারের চেয়েও সাদা-বাজারে লাভ বেশী, তবে চলো ঐ লালকেল্লা ফতেহ্ করতে ; মা-মেরীতে বিশ্বাস রাখলে কড়ি দিয়েও কিনতে হবে না,

সায়েবের মুন্‌শীও ঐ আশ্বাস দিয়েছেন।

যাঁরা পণ্ডিত লোক, ইতিহাস জানেন ও উপন্যাস লেখার কায়দাটাও যাঁদের রপ্ত আছে, তাঁরাই ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে পারেন। আমি ও আমার মত আর পাঁচজন পারে না, আমরা পণ্ডিত নই। কিন্তু পণ্ডিত না হয়েও দিব্য বুঝতে পারি, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে যাওয়ার বিপদটা কি?—পাখীর মত উড়তে না জেনেও চমৎকার বুঝতে পারি মনুমেণ্টের উপর থেকে লাফ দিয়ে পাখীর মত ওড়বার চেষ্টা করলে হালটা মোটামুটি কি হবে।

এই তো হালে একটি সাপ্তাহিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অলস নয়নে পড়লুম, 'তুমি ওমরাহ নও।'

সর্বনাশ! এটা কি প্রকার হল? 'ওমরাহ' তো 'আমীরে'র সাদামাটা বহুবচন—যে রকম 'গরীব' থেকে 'গুরবাহ'; তাই বলি 'গরীব-গুরবো'। সেই আইনেই বলি 'আমীর-ওমরাহ' ('আমীর-ওমরো'ও শুনেছি; আকারান্ত শব্দ বাঙলায় 'এ' 'ও'-তে আকছারই পরিবর্তিত হয়, যেমন 'ফিতে' 'জুতো'—এর কোনো পাকা নিয়ম নেই)। আরবী বা ফার্সী শব্দের একবচন এবং বহুবচন পাশাপাশি বসিয়ে আমরা অনেক সময় বাঙলায় কালেকটিভ নাউন তৈরি করি—যেমন 'আমীর-ওমরাহ্' অর্থাৎ 'আমীরসম্প্রদায়' কিংবা 'গরীব-গুরবো' 'দীনসম্প্রদায়' 'দীনজন'। তা সে যাই হোক, 'ওমরাহ' কথাটা বরহক্ বহুবচনেই আছে। কাজেই যে রকম আপনি 'আমীরসম্প্রদায় নন' ব্যাকরণে ভুল, তুমি 'ওমরাহ্ নও' ভুল।

(ঠিক সেই রকম 'আলিম্' পণ্ডিতের বহুবচন 'উলেমা'—জমিয়ৎ-ই-উলাম-ই-হিন্দ; অনেকেই না জেনে ইংরিজীতে লেখেন ulemas।)

কাজেই প্রথম চোরাবালি শব্দ নিয়ে। ঠিক ঠিক অর্থ না জানলে আমাদের মত অপণ্ডিত জন খায় মার। ঠিক সেই রকম গুপ্তযুগের উপন্যাস লিখতে গিয়ে না ভেবে ফুটিয়ে দিলুম রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া—শব্দ দুটো থেকে বিশেষ করে যখন সংস্কৃতের সুগন্ধ বেরিয়েছে—অথচ দুটো ফুলই এদেশে এসেছে অতি হাল আমলে। এবং শুধু শব্দার্থ জানলেই হয় না—রূঢ়ার্থে তার ব্যবহার জানতে হয়। তসবী[১]-

---

১ কত না হস্ত চুমিলাম আমি
তসবীমালার মত,
কেউ খুলিল না কিস্মতে ছিল
আমার গ্রন্থি যত।

খানা কথাটির দুটো শব্দই আমরা চিনি—যে ঘরে বসে বাদশা তসবীমালা জপ করেন। মোগল আমলে কিন্তু ঐ ঘর ছিল অতিশয় গোপন ( top secret ) মন্ত্রণালয়।

কেউ যদি লেখেন 'অতঃপর সম্রাট ঔরঙ্গজেব সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্ত রাত কুরান শরীফ ঘেঁটেও কোনো হদীস পেলেন না', তবে বাঙালী পাঠক এ-বাক্যে কোনো দোষ পাবেন না। কারণ হদীস বা হদিশ বলতে বাঙ্গালা পাঠক প্রিসিডেন্স বা পূর্ব উদাহরণ বোঝে। কিন্তু কুরানে হদীস খোঁজা আর বেদে মনুসংহিতা খোঁজা একই রকমের ভুল। কুরানে আছে পয়গম্বরের কাছে প্রেরিত ঐশী বাণী—আপ্তবাক্য। আর হদীসে আছে পয়গম্বর কি ভাবে জীবন যাপন করতেন, কাকে কখন কি করতে আদেশ বা উপদেশ দিয়েছিলেন ইত্যাদি ( এগুলোও অতিশয় মূল্যবান—কিন্তু আপ্তবাক্য নয় )। কাজেই এগুলোর ( হদীসের ) সন্ধান কুরানে পাওয়া যাবে কি করে? বস্তুত কোনো অর্বাচীন সমস্যা ও তার সমাধান কুরানে না পেলে আমরা হদীসে ( শাস্ত্রে 'স্মৃতি'র সঙ্গে তুলনীয় ) যাই। সেখানে না পেলে ইজমাতে এবং সর্বশেষে কিয়াসে। কিন্তু শেষের দুটো স্মৃতিশাস্ত্রের গভীরে—ঐতিহাসিক উপন্যাসে প্রতিবিম্বিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যল্প। তা সে যাই হোক, মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যে কিছুটা জ্ঞান বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিন্তু তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেটা প্রধানত বিস্ময়বোধক বাক্যে। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, ফরাসী উপন্যাসের ইংরিজী অনুবাদে 'মঁ দিয়ো' 'পার ব্লা' 'ভাত্র ব্লা'-গুলো ইংরেজ ফরাসীতেই রেখে দেয়; জর্মন উপন্যাসের অনুবাদে 'মাইন গট্' 'হ্যার গট্' 'ডনার ভেটার' মূলের মত রেখে দেয়। এগুলোর অনুবাদ সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। অবশ্য স্মরণ রাখা উচিত, মঁ দিয়ো, মাইন গট্ এবং মাই গড একই জিনিস, একই বাক্য হলেও ইংরেজের পক্ষে 'মাই গড' বলা নিন্দনীয়; নিতান্ত বিপাকে না পড়লে ইংরেজ 'মাই গড' বলে না। পক্ষান্তরে ফরাসী জর্মন কথায় কথায় 'মঁ দিয়ো' 'মাইন গট্' বলে থাকে। তাই ইংরিজী অনুবাদের সময় মূলের আবহাওয়া রাখবার জন্য অনুবাদক এগুলো অনুবাদ করেন না।

অলহমদুলিল্লা, মাশাল্লা, ইয়া আল্লা, তওবা তওবা, বিসমিল্লা এগুলো অবস্থা-

অর্থাৎ তসবীমালা জপ করে এক সাধু অন্য সাধুর হাতে তুলে দেন, কিন্তু কেউই দয়া করে মালার সুতোটি কেটে মুক্তোগুলোকে মুক্তি দেন না।

ভেদে ব্যবহৃত হয়। 'আপনার ছেলে এম-এ পাস করেছে? তওবা তওবা!' (বা তোবা তোবা।) বললে যে ভুল হয় সেটা সাধারণ জনও বোঝে। তাই এসব বাক্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে অনেকটা কারো প্রথম বংশধর জন্মালে আপনি যদি উচ্চকণ্ঠে 'বল হরি, হরিবোল বলে ওঠেন' তা হলে যেরকম হয়। এসব ভুল সাধারণ সামাজিক উপন্যাসে থাকলে পাঠক শুধু একটুখানি মুচকি হাসে, কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁর কাছ থেকে পাঠক একটু বেশী প্রত্যাশা করে।

'শার্ঙ্গদেবে'র মত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গভীরে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরাই জানেন, পাঠান-মোগল যুগের সঙ্গীত তথা এদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল; এ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কতখানি ফার্সী ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের অতখানি ফার্সী জানার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যদি রানী রিজিয়ার দরবারে সেতার বাজাতে আরম্ভ করেন তবে বোধ হয় সঙ্গীতজ্ঞদের অনেকেই আপত্তি জানাবেন। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তাই পণ্ডিতেরা যখন কিছু বলেন তখন সেটা মনে রাখবার চেষ্টা করি। মৌলানা আজাদ আমাকে বলেন, 'সেতার তৈরি করেন আমীর খুসরো। এটা বীণার অনুকরণে তৈরি, কিন্তু বীণার চেয়ে সহজ।'

আমি উত্তরে বললুম, 'আমি আরেক পণ্ডিতের কাছে শুনেছি, বাদ্যযন্ত্র-নির্মাতার পক্ষে সেতার-নির্মাণ বীণার চেয়ে কঠিনতর। কিন্তু বাজানেওলার পক্ষে সেতার বাজানো সহজতর। ঐ পণ্ডিত আমাকে বলেন, "অনেক সময় যে জটিল বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করা হয় সেটা বাজানেওলার পক্ষে বাজানো সহজ করে দেবার জন্য"।' (শার্ঙ্গদেব হয়তো খাঁটি খবর রাখেন।)

এসব ঝামেলার মাঝখানে পাঠান বা মোগল দরবারের গানের মজলিস বর্ণনা করা যে বিপদসঙ্কুল, সে কথা পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন।

ঠিক তেমনি মোগল আমলের ফিষ্টির বর্ণনা। কোরমা, কালিয়া, কোফ্‌তা কবাব (শিক্‌-কবাব প্রাক-মুসলিম যুগেও ছিল—শূল্যপক্ক মাংস—কিন্তু সেটা আঁকাবাঁকা শিকের ভিতর ঢুকিয়ে করা হত, না শূলের ডগায় ঝুলিয়ে ঝলসানো হত, তা জানি নে,) যে সব কটাই যাবনিক খাদ্য তা জানি, কিন্তু মোগল ফিষ্টিতে বাঁধাকপির পাতার ভিতর কিমা দিয়ে যে দোলমা তৈরি হয়, সেটা কি চলবে? কপি জাতীয় জিনিস এদেশে এল কবে? এমন কি যে সিম জিনিসটা ঘরোয়া বলে মনে হয় সে সম্বন্ধেও একখানি চিরকুটে দেখি ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, 'সংস্কৃতে আপনি সিম জিনিসটার

উল্লেখ পেয়েছেন কি ?'

মোগল ছবিতে তাদের জামাকাপড় গয়নাগাঁটি পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু সব কটার নাম তো জানি নে। মা-দুর্গার নাকের নথ দেখে দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রকারকে শুধান, 'নথ কি মুসলমান আগমনের পূর্বে ছিল ?'

কিন্তু আপত্তি কি ? গদাযুদ্ধে নামার সময় ভীমের পকেটে যদি ফাউন্টেনপেন দেখা যায়, তবে কী আপত্তি ! জেরুজালেমের এক মেরী মূর্তির বাঁ-কব্জিতে দেখি, ছোট্ট দামী একটি রিস্টওয়াচ। ভক্তের চোখে মা-মেরীর বাঁ-হাতখানা বড্ড ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাচ্ছিল, তাই। জানি নে, বারোয়ারি দুর্গাপূজোয় মা-দুর্গা নাইলন পরতে আরম্ভ করেছেন কি না !

## অনুবাদ সাহিত্য

কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, অনুবাদ যে অনুবাদ সেটা স্বীকার করতে প্রকাশক, সম্পাদক, স্বয়ং লেখকেরও কেমন যেন একটা অনিচ্ছা। কেন, এ প্রশ্ন শুধাতে একজন প্রকাশক সোজাসুজি বললেন, 'বাঙালী অনুবাদ পড়তে ভালবাসে না, তাই অসাধু না হয়ে যতক্ষণ পারি ততক্ষণ তথ্যটা চেপে রাখি।' কিছুকাল পূর্বে আমিও একটি বড়-গল্প অনুবাদ করি ও তার প্রথম বিজ্ঞাপনে সেটি যে অনুবাদ সে কথা প্রকাশিত হয় নি। আমি সেই সম্পাদককে বেনিফিট অব্ ডাউট দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই বুঝিয়ে যে, দ্বিতীয় বিজ্ঞাপনে এই গাফিলতি মেরামত করা হবে। ঐ সময়ে আমারই সহকর্মী ( কারণ দু'জনাই 'দেশ'-সেবক, এবং তিনি অন্যার্থেও ) শ্রীযুত বিদুর ঐ নিয়ে কড়া মন্তব্য করে যা বলেন তার নির্যাস, যত বড় লেখকই হোন না কেন, তিনি যদি অনুবাদ-কর্ম করেন তবে সেটা যেন পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়। অতিশয় হক্ কথা। তবে এটা আমি গায়ে মাখছি নে, কারণ আমি 'যত বড়' কেন অ্যাটটুন বড় লেখকও নই। আমি বরঞ্চ গোড়াতেই চেয়েছিলুম যে ফলাও করে যেন বলা হয়, এটি অনুবাদ। এবং সেই মূল প্রখ্যাত লেখকের অনুবাদ প্রসাদাৎ তাঁর সঙ্গ পেয়ে আমিও কিছুটা খ্যাত হয়ে যাবো—'রাজেন্দ্র সংগমে, দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে।'[১] কিংবা কালিদাস রঘুবংশের অবতরণিকায় যে কথা বলেছেন—বজ্র কর্তৃক মণি সছিদ্র

১ এই সুবাদে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো। গুরুদেব আমাকে কয়েক পাতা প্রুফ মেরামত করতে দেন। সেটা তৈরী হলে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে

হওয়ার পর আমি সুতো সুরুৎ করে বেতকুলিফ উৎরে যাবো।

এবং এস্থলে এটাও স্মরণ রাখা উচিত, কালিদাস বা মধুসূদন কেউই বাল্মীকির আক্ষরিক কেন, কোনো প্রকারেরই অনুবাদ করেন নি। সম্পূর্ণ নিজস্ব, মৌলিক কৃতিত্ব দেখিয়েও এঁরা অতখানি বিনয় দেখিয়েছেন। মডার্ন কবিতা যে আমার পিত্তি চটিয়ে দেয়, তার অন্যতম কারণ এঁদের অনেকেরই অভ্রংলিহ দম্ভ। 'আধুনিক' গাওয়াইদের কণ্ঠেও সেই সুর শুনতে পাই। আর মডার্ন পেন্টাররা কি করেন—অন্তত তাঁদের দু'জনার ব্যবহার সম্বন্ধে তো অনেক কথাই বেরিয়েছে।

কিন্তু সেকথা থাক। আমাব প্রশ্ন, অনুবাদ পড়তে বাঙালী ভালবাসে না কেন?

আমার কিন্তু কথাটা কেন জানি বিশ্বাস কবতেই ইচ্ছে যায় না।

বাংলা ভাষার কচিকাঁচা যুগে কালীপসন্ন সিংহ মহাভারতের অতি বিশুদ্ধ আক্ষরিক অনুবাদ করেন। আজ পর্যন্ত যে তার কত পুনর্মুদ্রণ হল তার হিসেব হয়তো আজ বসুমতীই দিতে পারবেন না। পাঠকদের শতকরা ক'জন নিছক পুণ্য-সঞ্চয়ার্থে এ অনুবাদ পড়েছে? এমন কি রাজশেখর বসুর অনুবাদও—যদিও একটি বারো বছরের ছেলেকে বলতে শুনেছি, 'ঐ বসুমতীরটাই ভালো। বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা—ধীরেসুস্থে পড়া যায়। রাজশেখর বাবুরটায় বড্ড ঠাসাঠাসি।' 'বেতালপঞ্চবিংশতি' 'বত্রিশ সিংহাসন' এ যুগের ছেলেমেয়েরাও তো গোগ্রাসে গেলে। (বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্রে'র আরবী অনুবাদ ইরাক থেকে মরক্কো পর্যন্ত আজও 'আরব্য রজনী'র সঙ্গে পাল্লা দেয়।) ঈশান ঘোষের জাতক জনপ্রিয় হওয়ার পূর্বেই বাজার থেকে উধাও হয়ে গেল—(পরম পরিতাপের বিষয় যে এখনো তার পুনর্মুদ্রণ হল না) অথচ তার থেকে নেওয়া বাচ্চাদের জাতক তাদের ভিতর খুব চলে। জ্যোতিঠাকুরের সংস্কৃত নাটক ও ফরাসী কথা-সাহিত্যের অনুবাদ এককালে বিদগ্ধ বাঙালীই পড়তো। ওদিকে এসলের বহু পূর্বে আলাওল অনুবাদ করলেন—যদিও আক্ষরিক নয়—জয়সীর 'পদুমাবৎ'। এবং তার পর,

---

গিয়ে দেখি তিনি ৺ক্ষিতিমোহন ও ৺বিধুশেখরের সঙ্গে গল্প করছেন। আমি থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে শুনি, তিনি বলছেন, 'বনমালী (কিংবা সাধুও হতে পারে, কিন্তু সে গুরুদেবের সঙ্গে ছিল অল্প দিন) তো গেল আমার সঙ্গে এলাহাবাদ। আমি বললুম, "ওরে বনমালী, প্রয়াগে এসেছিস; স্নান করে নিস্।" কিন্তু মশাই কি বলবো, সে ও-পাশই মাড়ালো না। বোধ হয়, আমার সঙ্গে থেকে থেকে দেবদ্বিজে ওর আর ভক্তি নেই। কিংবা ঐ ধরনেরই।' মাইকেলের কথা তা হলে সব সময়ে ফলে না।

পর পর বেরুলো 'ইউসুফ-জোলেখা', 'লায়লা-মজনু' ইত্যাদি। মোল্লার বাড়িতে এবং পূব-বাঙলার খেয়াঘাটে, বটতলায় এখনো তাদের রাজত্বের অবসান হয় নি। ওদিকে কাশীরাম, কৃত্তিবাস। 'আরব্যোপন্যাস', 'হাতিমতাই', 'চহারদরবেশ' উনবিংশ শতাব্দীতেই বাঙলা দেশে নাম করেছে। তারপর 'রবিনসন ক্রুসো', 'গালিভার্স ট্রেভল' এবং ফরাসী থেকে 'লে মিজেরাবল' এদেশে কী তোলপাড়ই না সৃষ্টি করলো।

আমি অতি সংক্ষেপে সারছি। কিন্তু আমার বয়েসী কোন্ পাঠক 'তীর্থসলিল' 'তীর্থরেণু'র কথা ভুলতে পারবেন? সত্যেন দত্ত অনুবাদের যাদুকর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্তের শোকসভাতে বলেছিলেন, 'যে-দিন দেখলুম সত্যেন আমার চেয়ে ঢের ভালো অনুবাদ করতে পারেন ও ছন্দের উপর তাঁর দখল আমার চেয়ে অনেক বেশী, সেই দিনই অনুবাদ-কর্ম থেকে অবসর নিলুম। তারপর ভাল কবিতা চোখে পড়লেই সত্যেনকে অনুবাদ করতে বলতুম।' (এস্থলে যদিও অবান্তর তবু স্মরণে আনি, রবীন্দ্রনাথ নিজের মৌলিক রচনা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে সত্যেন দত্তের 'চম্পা' কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেন।)

আর বর্তমান যুগের হীরেন দত্ত মশায়ের 'তিন সঙ্গী' যাঁরাই পড়েছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন, এরকম অনবদ্য অনুবাদ হয় না।

এর একটু তথাকথিত 'নিম্নপর্যায়ে' নামলেই দীনেন্দ্রকুমারের 'রহস্যলহরী'। বাংলাদেশের হাজার হাজার নারী-নরকে এঁর অনুবাদ আনন্দ দিয়েছে। দীনেন্দ্রকুমার লিখতেন অতি সরল, ছলছল-গতির বাংলা—পাঠককে কোনো জায়গায় হোঁচট খেতে হত না। তাঁর মৌলিক গ্রন্থ 'পল্লীচিত্র'—নামটি আমার ঠিক মনে নেই—পড়লে তাঁর বাংলা-শৈলী ও ভাষার সরলতা ও আপন বৈশিষ্ট্য পাঠককে আরাম ও চমক দুই-ই দেয়। (অরবিন্দ ঘোষ যখন বরোদায় চাকরি নিয়ে বাংলা শেখার জন্য গুরুর সন্ধান করেন, তখন দীনেন্দ্রকুমারকে সেখানে পাঠানো হয়। পরবর্তী যুগে যখন তিনি তাঁর অতুলনীয় মধুর বাংলায় পাঠকের কৌতূহল সদাজাগ্রত রেখে তাঁর জীবনস্মৃতি— বিশেষ করে বরোদার ইতিহাস ও শ্রীঅরবিন্দের সাহচর্য সম্বন্ধে লেখেন, তখন তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে দু'একটি বিতর্কমূলক তথ্য বলে ফেলেন। আমার ব্যক্তিগত মতে তিনি সম্পূর্ণ সত্যভাষণই করেছিলেন। ও আমার অগ্রজ, কাঙাল হরিনাথ, দীনেন্দ্রকুমার, মীর মুশর্‌রফ হুসেন সম্বন্ধে কুষ্টিয়ায় সরজমিনে গবেষণা করে ঐ সিদ্ধান্তেই পৌঁছন। ফলে তখনকার দিনের মাসিক-সাহিত্য মহলের এক বলবান ক্লিক্ দীনেন্দ্রকুমারকে, জাস্ট হাউণ্ডেড্ হিম আউট অব বেঙ্গলী লিটারেচার। সেই অনুপম জীবনস্মৃতি শেষ করার সুযোগও তখন

তিনি পাননি। অথচ আমি যখন তাঁর লিখিত শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী খাসেরাও যাদব অংশ বরোদার যাদব গোষ্ঠী ও অন্যান্য মারাঠাদের অনুবাদ করে শোনাই তখন তাঁরা অশ্রুবিসর্জন করে বলেন, 'বাংলাদেশই শুধু সে যুগের মারাঠী বিপ্লবীদের স্মরণে রেখেছে। বাঙালী প্রাদেশিক, এ কুসংস্কার আমাদের ভাঙলো।' এর পর হঠাৎ যখন দীনেন্দ্রকুমারের ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে গেল, তখনো তাঁরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতে চাইলেন পরের পর্বের কথা। আমি কোন্ লজ্জায় স্বীকার করি কেন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেল।)

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! কিন্তু এই বিষয় নিয়ে আমার বহুদিনের মনস্তাপ—আজ বেমোকায় বেরিয়ে গেল, পাঠক ক্ষমা করবেন।

আমার মনে একটা সন্দেহ জাগে। প্রাচীন যুগের সব অনুবাদই যে উত্তম ছিল, একথা ঠিক নয়। কিন্তু এঁদের বেশীর ভাগই উত্তম সংস্কৃত ও তৎকালীন প্রচলিত বাঙলা ভাষার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। এবং পণ্ডিতজন যত বাঁকা বাংলাতেই অনুবাদ করুন না কেন, তাঁদের শব্দভাণ্ডারে দৈন্য ছিল না বলে অনুবাদ মূল থেকে দূরে চলে যেত না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত পিয়ের লোতির 'ইংরেজবর্জিত ভারত-' এর অনুবাদ পড়লেই পাঠক আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন। লোতির শব্দভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত (উত্তর-মেরু-সমুদ্রের আলো-বাতাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি পর পর তিনটি শব্দ দিয়েছেন, ডায়াফনাস, এফিমেরাল, কাইমেরিক—এর অনুবাদ তো দীন শব্দভাণ্ডার নিয়ে হয় না!)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জানতেন অত্যুত্তম সংস্কৃত—ভাসের নাটক তখনো ছাপায় প্রকাশিত হয় নি বা তাঁর হাতে পৌছয় নি—ভাসকে বাদ দিলে তিনি সংস্কৃতের প্রায় সব নাট্য-লেখকের অনুবাদ করেছেন—তাই সে ভাষা থেকে তিনি অনায়াসে শব্দচয়ন করে মূলের বৈচিত্র্যের মর্যাদা রক্ষা করতে পারতেন। অক্ষম অনুবাদকের হস্তে সে-স্থলে অনুবাদ হয়ে যায় একেঘেয়ে—পড়তে গিয়ে পাঠকের ক্লান্তি এসে যায়।

অধুনা একাধিক যোগ্য ব্যক্তি অনুবাদ-কর্মে লিপ্ত হয়েছেন। এঁদের কেউ কেউ ইংরিজী ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। এঁরা আমার চেয়ে অনেক বেশী যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে পারেন, ইংরিজী সাহিত্য বহু ভাষা থেকে বহু বস্তু অনুবাদ করে কি ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে, নব নব অনুপ্রেরণা পেয়েছে, নব নব অভিযানে বেরিয়েছে—সেই আদিযুগের শুভক্ষণ থেকে।

আমি অনুবাদ করতে গিয়ে পদে পদে নিজের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছি। এই লেখাটি তারই অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

এদেশে তিন রকমের ইংরেজ এসেছিল। বড় দলের কাজ ছিল পৃথিবীর সামনে আমাদের হেয় প্রমাণ করে এদেশে শ্বেত ( আমি বলি ধবল কুষ্ঠ ) রাজত্ব যুক্তি ও নীতির উপর খাড়া করা। এক কথায় যাকে বলে, 'হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন' যে কী ভীষণ ভারী এবং ইংরেজ স্বদেশের বেকন-আণ্ডা ঘোড়দৌড়ের জুয়োখেলা, খেঁকশেয়ালি শিকার করা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই 'নচ্ছার' দেশে এসে পৃথিবীর ইতিহাসে যে কী অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে, সেটা সপ্রমাণ করা। অতি দৈবে-সৈবে দু'একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন সহৃদয় মহাজন এ ভণ্ডামি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁরই একজন প্রখ্যাত হাস্যরসিক জেরম কে জেরম। তিনি মারাত্মক ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—পড়ে মনে হয়, তিনি যেন সিকনি ঝাড়ছেন—'বার্ডেন যদি হেভিই হয় তবে ওটা বইছিস কেন, মাইরি? আমি তো খবর পেয়েছি, ইণ্ডিয়ানরা সেই সেবা, সেই হোলি ক্রুসেডের জন্য থ্যাঙ্ক্যু-টি পর্যন্ত বলে না। তবে ফেলে আয় না ঐ লক্ষ্মীছাড়া বোঝাটা ঐ হতভাগাদেরই ঘাড়ে।'

কিন্তু প্রাগুক্ত ঐ বড় দলের ইংরেজদের একটি 'আপ্তবাক্য' নিয়ে আজ আমার আলোচনা। এরা মোকা বেমোকায় বলতো, 'পাঠান-মোগল আদৌ ইতিহাস লিখতে জানতো না—শুধু লড়াই আর লড়াই।'

অন্য দল সংখ্যায় নগণ্য। এঁরা এসব কথায় কান না দিয়ে সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী শিখতেন, বাঙলায় বাইবেল অনুবাদ করতেন, এবং প্রাচ্যভাষায় লিখিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বই ইংরিজীতে অনুবাদ করতেন। ফার্সী ইতিহাস যে শুধু 'লড়াই আর লড়াই' নয় ( আহা। তাই যদি হত আর আমরা তাই পড়ে ক্ষেপে গিয়ে সেই আমলেই ইংরেজকে ঠ্যাঙাতে আরম্ভ করতুম!) সেটার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ তাঁরা জানিয়েছেন ফার্সী ইতিহাস অনুবাদ করে।

এক তৃতীয় শ্রেণীর পিচেশও এদেশে এসেছিল। এরা প্রথম শ্রেণীর মত অশিক্ষিত বর্বর নয়, আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর মত নিরপেক্ষ সাধুজনও নয়। এরা অল্পবিস্তর সংস্কৃত আরবী ফার্সী চর্চা করে, অল্প বিদ্যা যে ভয়ঙ্করী সেইটে আপন অজানতে প্রমাণ করে দিত এই বলে, 'ওসব তাবৎ মাল আমাদের পড়া আছে; সব রাবিশ।'

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের ইংরিজী 'শিক্ষিতেরা' এদেরই বিশ্বাস করে বসলেন।

আমার বক্তব্য, নিজের মুখেই ঝাল চেখে নিলে পারেন। বিশেষত যখন কিছু দিন ধরে 'শেষ মোগলদের' সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপন্যাস বেশ কিছুটা জনপ্রিয়

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে আমি ভারী খুশী হয়েছি, কারণ অনেক স্থলে সাধারণ পাঠক এই করেই উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হয়। আমারই ন্যাওটা একটি ম্যাট্রিক-ফেল ছোকরা—কিন্তু ব্যাপিড রীডিঙের ফলে সে দিব্য শিলিং-শকার, পেনি-থ্রিলার পড়তে পারতো—আমার কাছ থেকে রোম সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আই ক্লাউডিউস' পড়ে এমনই 'ক্ষেপে যায়' যে, সে তারপর দুনিয়ার যত রোমান ইতিহাস পড়তে আরম্ভ করে, এ্যেস্তক জুলিয়াস সীজারের 'ব্রিটন বিজয়' পর্যন্ত।

হালে বাবুর বাদশার আত্মজীবনী বেরিয়েছে—বাঙলা অনুবাদে। অবশ্য সে অনুবাদ এসেছে তিন ঘাটের জল খেয়ে। বাবুরের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী—চগতাই-তুর্কী অর্থাৎ তুর্কোমানিস্তানের তুর্কী, টার্কির (যার রাজধানী আঙ্কারা) ভাষা ওসমানলি তুর্কী। আমার যতদূর জানা আছে, মোগল আমলে যদিও দরবারী ভাষা ছিল ফার্সী, তবু শেষ বাদশা বাহাদুর শাহ পর্যন্ত অন্তঃপুরে তুর্কীতেই কথা-বার্তা বলেছেন, উর্দুতে কবিতা লিখেছেন[১]—দিল্লীর বিখ্যাত বিখ্যাত মুশায়েরায় (কবি-সম্মেলনে) দত্ত মারফৎ আপন কবিতা পাঠিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন (সে আমলের প্রখ্যাত কবি ছিলেন উর্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গালিব)—এবং রাজকার্য করেছেন ফার্সীতে।

বাবুরের সেই আত্মজীবনী অনূদিত হয় ফার্সীতে, ফার্সী থেকে ইংরেজীতে ও বিবেচনা করি, এই বাঙলা অনুবাদ সেই ইংরিজী থেকে। তাতে করে যে খুব মারাত্মক ক্ষতি হবে সে ভয় আমার নেই, কারণ অনুবাদে সবচেয়ে বেশী জখম হয় গীতিরস, এবং বাবুরের সাহিত্যসৃষ্টি গীতিরসপ্রধান নয়। এবং লড়াইয়ের কথা যদিও এটাতে আছে, তবু সেইটেই প্রধান কথা নয়। আসল কথা বাবুরের পর্যবেক্ষণশক্তি। ভারতবর্ষ—প্রধানতঃ দিল্লী-আগ্রা অঞ্চল—তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এবং অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আমি যখন কাবুলে ছিলুম তখন বাবুর বর্ণিত, কাবুল পাঞ্জশীর (পাঞ্জশীর অর্থ পঞ্চ-ক্ষীর, সংস্কৃত 'ক্ষীর' শব্দ ফার্সীতে 'শীর', কিন্তু অর্থ দুধ, আর পাঞ্জ অর্থ পঞ্চ—ঐ জায়গায় পাঁচটি নদী

---

১ 'শুনেছ, রাজা কবিতা লেখে, এ আবার কেমন রাজা!' এই বলে তখনকার দিনের ইংরেজ বাদশা-হাসালামৎকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতো। পরবর্তী যুগের এক জহুরী ইংরেজ এই নিয়ে মন্তব্য করে লেখেন, 'ঐসব বর্বর ইংরেজ জানতো না যে, ওয়ারেন হেস্টিংসও কবিতা লিখতেন, এবং বাহাদুর শা'র তুলনায় অতিশয় নিরেস।'

বয় ; আমাদের পায়েসকে কাবুলীরা বলে শীর-বিরঞ্জ্—বিরঞ্জ্ অর্থ চাল ) ইত্যাদি আমি আপন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। বস্তুত বাবুর বর্ণিত কাবুল ও আমার দেখা কাবুলে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। হালে যাঁরা কাবুল দেখে ফিরেছেন তাঁরা বলেন, গত দশ বৎসরে নাকি কাবুলের চেহারা একদম পালটে গিয়েছে।

কাবুলীরা বাবুরকে ঘৃণা করে। কারণ ইব্রাহিম লোদী ছিলেন আফগানিস্থানের পাঠান। তাঁকে পরাজিত করে হিন্দুস্থানের তখৎ ছিনিয়ে নেন তুর্কমানিস্থানের মোগল বাবুর। আমাকে এক সম্ভ্রান্ত, সুশিক্ষিত বিশ্বপর্যটক পাঠান কূটনৈতিক বেদনাবিকৃত কণ্ঠে বলেন, 'আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ডক্টর, এই বর্বর বাবুর কি করেছিল ? কল্পনা করতে পারেন, সেই নরদানব ইব্রাহিম লোদীর অন্তঃপুরের পুণ্যশীলা অসূর্যম্পশ্যাদের খোলা বাজারে ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রয় করেছিল ! এ শুধু বর্বর যাযাবর তুর্কীদের পক্ষেই সম্ভব।'

কাজেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত বাবুরের কবরের উপর না ছিল আচ্ছাদন ( একদা নাকি ছিল, কিন্তু সেটা লুট হয়ে, কিংবা ভেঙে পড়ে যাওয়ার পর আফগানরা স্বভাবতই সেটা মেরামত করে দেবার কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি ), না ছিল কোনো অলঙ্কার-আভরণ ; কয়েক ফালি পাথর দিয়ে তৈরী অতিশয় সাদামাটা একটি কবর। হালে নাকি আফগান সরকার বাবুরের ঐতিহাসিক মর্যাদা অনুভব করতে পেরেছেন—জাত্যভিমান কিঞ্চিৎ সংযত করার ফলে—এবং কবরের সুব্যবস্থা করেছেন।

আজকের দিনের বাঙালী ইনফ্লেশন কারে কয়, সেটা চোখের জলে নাকের জলে শিখেছে। রোক্কা একটি টাকার ক্রয়মূল্য আজ কতখানি, সে তা বিলক্ষণ জানে। বাঙালী তাই বাবুরের ইনফ্লেশন-জ্ঞান দেখে আনন্দিত হবেন। দিল্লী-জয়ের পর বাবুরের আমীর-ওমরাহ্ বিস্তর ধনদৌলত লুট করে বললেন, 'এ বারে চলো কাবুল ফিরে গিয়ে নবাবী করা যাক।' বাবুর তখন তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তাদের সিন্দুকে কাঁড়া কাঁড়া টাকা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাবুল উপত্যকার শরাব-কবাবের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। যেখানে আণ্ডার দাম আগে এক পয়সা ছিল সেখানে ওদের এখন দিতে হবে আষ্ট গণ্ডা ( কিংবা ঐ ধরনের কিছু-একটা —বইখানা আমার হাতের কাছে নেই )। কারণ সেপাই-পেয়াদারাও কিছু কম মাল লুট করে নি, তারাও এখন নিত্যি নিত্যি আণ্ডা খেতে চাইবে।

এর পর যে বইখানা পড়ে বাঙালী পাঠক আনন্দ পাবেন সেটি ফার্সীতে লেখা বাঙলার ( খুব সম্ভব প্রথম পূর্ণাঙ্গ ) ইতিহাস। 'বাহারিস্তানে গায়েবী'[২] —

২ বাঙলা আজগুবী অর্থ—'আজ' মানে 'হতে' 'from' ; 'গায়েবী' মানে

অজানা বসন্তভূমি। লেখক দিল্লী-আগ্রা-বিহারের শুকনো দেশ দেখে দেখে বাঙলার দেহলিপ্রান্তে এসে পেলেন, চতুর্দিকে শ্যামলে শ্যামল আর নীলিমায় নীল। তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেল।

এর কথা আরেক দিন হবে।

## ফের্ডিনাণ্ট্ জাওয়ারব্রুখ

বৈদ্যরাজ জাওয়ারব্রুখকে নিয়ে আবার সুইস জর্মন কাগজে বাদ-প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছে। প্রথম দলের বক্তব্য, সত্যই বৃদ্ধ বয়েসে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল ; অন্য দলের বক্তব্য তিনি পূর্ব-বার্লিনের সোভিয়েৎ কূটনীতির বলির পাঁঠা হয়েছেন। বার্লিনের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল 'শারিতে' ( charite—চ্যারিটি—খয়রাতি ) প্রতিষ্ঠানের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বার্লিন ভাগাভাগির পর শারিতে পড়েছিল পূর্ব-বার্লিনে, রাশান আওতায়।

এই কলকাতা শহরের অন্তত একজন খ্যাতনামা চিকিৎসককে আমি চিনি, যিনি জাওয়ারব্রুখের শিষ্য। তিনি ম্যুনিকে তাঁর কাছে বুকের যক্ষ্মার অপারেশন শেখেন—জাওয়ারব্রুখ বহু বৎসর ম্যুনিক হাসপাতালেরও বড় কর্তা ছিলেন। এছাড়া তাঁর অন্যান্য শিষ্যও হয়তো কলকাতায় আছেন। অবশ্য বুকের, মাথার ও ক্যানসারের সার্জারি নিয়েই যাঁদের কারবার তাঁরাই জাওয়ারব্রুখের গবেষণার সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত

জর্মন সার্জন-সমাজ মনে করেন, পৃথিবীর তিনজন সার্জনের নাম করতে হলে জাওয়ারব্রুখের নাম কালানুক্রমে তৃতীয়। অন্য দুজন বোধ হয় হিপপোক্রাতেস ও নেপোলিওনের সার্জন—কিন্তু আমি কি চিকিৎসা-শাস্ত্র, কি সে শাস্ত্রের ইতিহাস কোনোটারই বিন্দুবিসর্গ মাত্র জানি নে বলে হলফ খেয়ে কিছুই বলতে পারবো না। তদুপরি এ ধরনের নির্ঘণ্ট নির্ণয় সব সময়ই কিঞ্চিৎ উদ্দাম হয়ে থাকে—যেরকম পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্য নির্ণয়ে ভিন্ন লোক ভিন্ন নির্ঘণ্ট দেয়।

অতএব অতিশয় সারবান আপত্তি উঠতে পারে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের কিছুই যখন আমি জানি নে, তখন হাতের নাগালের বাইরে যে শল্যরাজ জাওয়ারব্রুখ বিরাজ করছেন, তাঁর প্রতি আমি উদ্বাহু হয়েছি কেন? উত্তর অতি সরল। এই শল্যরাজ মৃত্যুর পূর্বে একখানি নাতিবৃহৎ আত্মজীবনী লেখেন—বস্তুত পুস্তকখানি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর এবং সেটি আদৌ শল্যরাজ বা বৈদ্য-সম্প্রদায়ের 'অজানা' 'লুপ্ত' 'অদৃশ্য' 'বিধিকৃৎ'। অর্থাৎ অজানা থেকে আগত বলে অদ্ভুত।

উদ্দেশে রচা হয় নি; রচনা হয়েছে আপনার আমার মত মামুলী জনের জন্য। এমন কি সে পুস্তকে ক্যানসার সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘ জীবনব্যাপী গবেষণার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ যে প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটিও সাধারণ জনের উদ্দেশে লিখিত, কারণ তিনি সেটি সর্বসাধারণের উপকারার্থে জর্মন রেডিও থেকে বেতারিত করেন। অতি সরল জর্মনে, সর্বপ্রকারের চিকিৎসা সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সযত্নে বর্জন করে তিনি এই বেতার-ভাষণটি নির্মাণ করেছিলেন বলে সেটি জর্মন-বালকেও বুঝতে পারে—বাঙলায় অনুবাদ করলে বঙ্গবালকও বুঝতে পারবে।[১]

কিন্তু এইটেই সর্বপ্রধান বা সর্বশেষ তত্ত্ব নয়। তাঁর আত্মজীবনীর সাহিত্যিক মূল্য আছে, এবং তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে তাঁর হাস্যকৌতুকোজ্জ্বল নীল চোখ দুটি প্রকাশ পায়। তার সামান্য একটি উদাহরণ দি।

ব্যঙ্গরস অতিশয় প্রাচীন রস—করুণ ও বীর রসের সমবয়সী সে। প্রাচীনতম গ্রীক সাহিত্যে তার ভূরি ভূরি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু অন্যথা সে-রসের উৎস বলে আমাদের রসপ্রিয় মনও সেটা সব সময় গ্রহণ করতে পারে না। বিশুদ্ধ হাস্যরস—যেটা সৃষ্টি করার জন্য কাউকে পীড়া দিতে হয় না, নট অ্যাট দি কস্ট্ অব এনি ওয়ান—আপন আনন্দে উচ্ছল এবং সেটা ব্যঙ্গরসের বহু পরবর্তী যুগের রস। এবং আমার ব্যক্তিগত শাবাসী সেই হাস্যরসের, সেই ব্যঙ্গরসের উদ্দেশে যেখানে রসস্রষ্টা নিজেকে নিয়ে নিজে হাসেন, নিজেকে ব্যঙ্গ করেন, লাফস অ্যাট হিজ ওন কস্ট। তারই একটি উদাহরণ দি:

জাওয়ারব্রুখ বলছেন, তাঁর সময়কার এক বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক

---

১ এবং এর অনুবাদ করার বাসনা আমার ছিলও—অবশ্য সাবধানের মার নেই বলে ক্যানসার-রোগ-বিশেষজ্ঞ আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দিয়ে সেটি সেনসর করিয়ে নিতুম। এ বেতারভাষণটি এখনো আদৌ গাজীমিয়ার বস্তানীতে আশ্রয় নেয় নি, অর্থাৎ আউট-অব-ডেট হয়ে যায় নি। ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রীর আদেশে আমি সর্বাধুনা প্রকাশিত জর্মন-বিশ্বকোষে সবিস্তর লিখিত ক্যানসার প্রবন্ধটি পড়ি। এবং যদিও সব জিনিস বুঝতে পারি নি (বিশেষ করে কুআণ্টুম্ থিয়োরি দিয়ে ক্যানসার রোগের কারণ নির্ণয়ের আধুনিক প্রচেষ্টা!) তবু এটা লক্ষ্য করলুম যে ক্যানসারের পূর্বাভাস সম্বন্ধে জাওয়ারব্রুখ অজ্ঞজনকে যে সব দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছেন, সর্বাধুনিক জর্মন-বিশ্বকোষও তাই বলেছেন।...উল্লেখযোগ্য যে, ক্যানসার গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বে জাওয়ারব্রুখ বার্লিনের ইণ্ডলজি ডিপার্টমেণ্টে গিয়ে খবর নেন, প্রাচীন ভারতীয় বৈদ্যেরা ক্যানসার সম্বন্ধে কি বলে গিয়েছেন।

ছাত্রদের মৌখিক ( ভাইভা ) পরীক্ষা নেওয়ার পর প্রতিবারেই অতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে বলতেন, 'এই পৃথিবীতে বিস্তর গর্দভ নিজেদের ডাক্তার রূপে পরিচয় দিয়ে নির্ভয়ে অগুনতি লোক মেরে বেড়াচ্ছে ; তার উপর যদি আরো একটা গর্দভ বাড়ে তাতে করে কণামাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। তুমি পরীক্ষা পাস করলে।' জাওয়ারব্রুখও তাই তাঁর যুগের শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। কিন্তু অন্তত একবার তাঁরও শিক্ষা হয়ে যায় এ বাবদে। জাওয়ারব্রুখ লিখছেন, 'সকাল দশটায় তিনটি ছেলে আসবে আমার কাছে ভাইভা দিতে। আমি নার্সকে বললুম, ক্যাণ্ডিডেটরা এলে অমুক রোগীকে পাঠিয়ে দিয়ো—তার পেটে ছিল টিউমার। ওরা এলে আমি কাগজপত্র দস্তখৎ করতে করতে একজনকে বললুম, রুগীকে পরীক্ষা করে বলতে তার কি হয়েছে। আমি কাজে ডুব মারলুম। দশ মিনিট পরে শুধালুম, "কি হল ?" ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বললে, "কিছুই তো পেলুম না, স্যর।" আমি হুঙ্কার দিয়ে বললুম, "গেট আউট"—আর নামে দিলুম ঢ্যাবা কেটে। তারপর একই আদেশ দিলুম দু নম্বর ক্যাণ্ডিডেটকে। একেও যখন শুধালুম, কি পেল সে—সে প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে একই উত্তর দিল। ছাড়লুম আরেক হুঙ্কার, কাটলুম আরেক ঢ্যাবা। এবারে তিন নম্বরের পালা। সে-ও যখন ফেল মারলে তখন আমি ছাড়লুম শেষ হুঙ্কার। এ ছেলেটি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া না হয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে, "তা হলে আপনি দেখান না, স্যর, কি হয়েছে।" কী! এত বড় আস্পদ্দা! দেখাচ্ছি! লম্ফ দিয়ে গেলুম রুগীর কাছে, পেটে দিলুম হাত। ও হরি! কোথায় টিউমার! ভুলে অন্য লোক পাঠিয়েছে নার্স! তখন শুরু হয় আমার আর্তরব। "আরে, আরে, কোথায় গেল সেই দুই ক্যাণ্ডিডেট। নিয়ে এসো ওদের।" এস্থলে যে-ক্যাণ্ডিডেট বিশ্ববিখ্যাত জাওয়ারব্রুখকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাকে বোধ হয় আর কোনো পরীক্ষাতে না ফেলে সঙ্গে সঙ্গে পয়লা নম্বরী ডিগ্রী দেওয়া উচিত।

এ রকম আরো বহু মজার মজার কথা আছে এই অসাধারণ পুস্তকে ; বস্তুত পুরো বইখানাই হাস্যরসের কুমকুমে কুমকুমে ভর্তি। পাঠকের চটুলহৃদয়ে একটুখানি চাপ পড়লেই আবীরে আবীরে ছয়লাপ। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে আবার ট্র্যাজেডির করুণ রসও আসে বলে সে রস যেন জল এনে দেয় চোখের পাতায়, বুক ভরে দেয় নিবিড়তর ব্যথায়—আরো বেশী।

একবার একটি মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেন, তাঁর নিশ্চয়ই ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তার তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ভিন্ন ভিন্ন ল্যাবরেটরিতে যেখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগের জাতগোত্রের বিচার হয়। নানাবিধ

পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তাঁরা সবাই এক বাক্যে সমস্বরে বললেন, 'ক্যানসার নয়'।

সব শুনে মহিলাটি মাথা নেড়ে বললেন, 'না, হের প্রফেসর, এটা ক্যানসারই বটে।'

মহিলাটি কয়েক দিন পর আবার এসে ক্যানসারের ফরিয়াদ করলেন। আবার গোড়ার থেকে তাবৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হল, আবার নির্দ্বন্দ্ব নেতিবাচক উত্তর এল। এই করে করে ছ'মাস ধরে মহিলাটি আসেন—তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই, তাঁর উদরবেদনা ক্যানসারজনিত।

শেষটায় জাওয়ারব্রুখ স্থির করলেন, কাটাই যাক পেট। মাদামকে তখন বলতে পারবেন, স্বচক্ষে দেখেছি পেটে কোনো ক্যানসার নেই। কিংবা হয়তো তিনি ভেবেছিলেন, অনেক বর্ষীয়সী মহিলার এই অপারেশন-মেনিয়া থাকে; হয়তো তাঁরা আপন জানা-অজানায় সেণ্টার অব অ্যাট্রাকশন বা কৌতূহলের কেন্দ্র হতে চান। তাকে অস্ত্রোপচারের জন্য তৈরি করা হল।

তারপর কবিরাজ জাওয়ারব্রুখ যা বলেছেন, তার মোদ্দা কথা: 'আমরা তো নিশ্চিন্ত মনে পেট খুললুম। সর্বনাশ! এ কি দেখি! পেট ভর্তি ক্যানসার! এবং এখন যে চরমে পৌঁচেছে সে অবস্থায় অপারেশনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সন্তপ্ত চিত্তে আমরা পেট সেলাই করে দিলুম। মহিলা সম্বিতে ফিরলে আমি তাঁকে বললুম, 'হ্যাঁ, ক্যানসারই ছিল, আমরা সেটা কেটে সরিয়ে দিয়েছি।'

জাওয়ারব্রুখ তার পর বলেছেন, 'মহিলাটি প্রথম যেদিন আমার কাছে এসেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে যদি অপারেশন করতুম, তবে হয়তো তাঁকে বাঁচাতে পারতুম। কিন্তু প্রশ্ন, আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি যখন নঙর্থক উত্তর দেয়, তখন শুধুমাত্র রোগীর অনুমানের উপর নির্ভর করে পেট কাটা যায় কি প্রকারে?'

জাওয়ারব্রুখ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আপনাদের কাছে আরো নিবেদন-করার বাসনা রইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, কোনো বাঙলাভাষী সার্জন সেটা করলেই ভালো হয়; আমার মত আনাড়ী তা হলে অনধিকার-প্রবেশ থেকে নিষ্কৃতি পায়।

কলকাতা ও বোম্বাইয়ে যে সব ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান আছে, তাঁরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে বিবৃতি প্রকাশ করে সাধারণ জনকে সাবধান করে দেন, শরীরে কোন্ কোন্ আকস্মিক বা মন্দগতিতে বর্ধমান পরিবর্তন দেখলে ক্যানসারের সন্দেহ করতে হয়। এগুলি আমি সর্বদাই শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পড়ি।

ঠিক ঐ একই সুবাদে প্রফেসর ডক্টর গেহাইম্‌রাট জাওয়ারব্রুখ অবতরণিকা হিসাবে কয়েকটি কথা বলেছেন এবং আপন বক্তব্য বোঝাতে গিয়ে এমন একটি

অত্যুৎকৃষ্ট বিরল তুলনা দিয়েছেন, যেটি ব্যবহার করতে পারলে যে কোন যশস্বী সাহিত্যিকও শ্লাঘা অনুভব করবেন। বৈদ্যরাজ যা বলেছেন, তার নির্যাস : অধিকাংশ রোগই কোনো না কোনো সাবধান-বাণী, ইঙ্গিত, ওয়ার্নিং দিয়ে আসে। যেমন, সামান্য মাথা ধরলো—সেইটে ওয়ার্নিং—পরের দিন জ্বর হল। কিন্তু ক্যানসার কোনো ওয়ার্নিং তো দেয়ই না, বরঞ্চ সে নিতান্ত নিরপরাধীর মত দেখা দেয়। যেমন, আপনার জিভে একটি দানা দেখা দিল। সেটাতে কোনো বেদনা নেই, আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না, আপনি ভাবলেন, এরকম তো কত দানা এখানে সেখানে দেখা দেয় আবার মিলিয়ে যায়, এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বা চিকিৎসকের কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারপর সেটা অতি ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো, কিন্তু কোনো বেদনা বা অস্বস্তি নেই বলে আপনি তখনো কোনো প্রতিকার করলেন না। তারপর একদিন ঢোক গিলতে, খাবার গিলতে আপনার অসুবিধা হতে লাগলো। আপনি তখন গেলেন ডাক্তারের কাছে, কিন্তু হায়, ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে, তখন আর অপারেশন করা যায় না। আপনি যদি, দানা যখন ছোট ছিল, তখন আসতেন, তবে সার্জন আপনাকে অনায়াসে ক্যানসারমুক্ত করতে পারতেন—অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর। তাই জাওয়ারক্রুখ বলছেন, 'দানাটি আদৌ অপরিচিত শত্রুরূপে বেদনা যন্ত্রণা সঙ্গে নিয়ে এল না। ক্যানসার এল যেন আপনার কোনো বন্ধুজনের চেহারার সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে একটি মুখোশ তৈরি করে সেটা পরে। তার পর কাছে এসে হঠাৎ মুখোশ সরিয়ে ফেলে আপনার বুকে মারলো ছোরা!'

এর পরই অধ্যাপক কতকগুলো চিহ্নের উল্লেখ করেছেন—এগুলোকে তিনি ওয়ার্নিং বলেন নি বটে, কিন্তু সেগুলো দেখলেই তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। জিভেতে বা অন্য কোথাও দানা বা ঐ জাতীয় বস্তু বা পরিবর্তন, কণ্ঠস্বর অকারণে কর্কশ হয়ে যাওয়া, আপনার পেটের অসুখ ছিল না—হঠাৎ আরম্ভ হল দিনের পর দিন পেট খারাপ হতে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এটা আমার অনধিকারপ্রবেশ। আপনার উচিত, আমাদের যে কোনো ক্যানসার-প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের সুলিখিত প্রামাণিক বিবৃতি সংগ্রহ করা। বিবৃতিতে সব ক'টা চিহ্নের পরিপূর্ণ ( exhaustive ) লিস্ট থাকে। আমি এযাবৎ যা লিখেছি, সেটা ভুলে গিয়ে ঐ বিবৃতি মন দিয়ে পড়বেন। কারণ, এগুলো আমাদের জন্যই লেখা —ডাক্তারদের জন্য নয়[২] ॥

২ এ-প্রবন্ধ "দেশে" প্রকাশিত হওয়ার পর আমি চিকিৎসক অচিকিৎসক

# হিডজিভাই পি মরিস্

একদা 'স্ট্র্যান্ড্' পত্রিকা একটি নূতন ধরনের অনুসন্ধানের সূত্রপাত করে সাহিত্যের মহা মহা মহারথীদের শুধোয়, তাঁরা সর্বজন-সম্মানিত, সর্বশিক্ষিতজনের অবশ্যপাঠ্য কোন্ কোন্ পুস্তক, যে কোনো কারণেই হোক, পড়ে উঠতে পারেন নি। উত্তরে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হল যাকে 'মোহনে'র ভাষায় লোমহর্ষক বলা যেতে পারে: যেমন, কথার কথা কইছি— বার্নার্ড শ পড়েন নি অলিভার টুইস্ট, কিংবা মনে করুন—রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি 'একেই কি বলে সভ্যতা'?

কাজেই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই অখ্যাত সাহিত্য-সেবক যে তাঁরা যেন তড়িঘড়ি শ্রীযুত বিশী মহাশয়ের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বই-খানা পড়ে নেন।

এই পুস্তকে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' জাতীয় দু'চারটি চরিত্রের উল্লেখ করে বিশী মহাশয় বহু প্রাক্তন শান্তিনিকেতনবাসীদের সাধুবাদ পেয়েছেন। তাঁদেরই একজন হিডজিভাই মরিস।

তাঁর পুরো নাম হিডজিভাই পেস্তনজি মরিসওয়ালা। গুজরাতীদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক নাম থাকে; যেমন গাঁধী, জিন্না (আসলে ঝিঁড়া ভাই), হটিসিং ইত্যাদি। পার্সীদের অনেকেরই ছিল না বলে কেউ কেউ তাঁদের ব্যবসার নাম পারিবারিক নাম রূপে গ্রহণ করতেন। যেমন ইঞ্জিনীয়ার, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি। এই নিয়ে পার্সীরা ঠাট্টা করে একটি চরম দৃষ্টান্ত দেন—সোডাওয়াটার-বটল্ওপ্নারওয়ালা!

বোম্বাইয়ের পতীত্ পরিবার বিখ্যাত। এঁরা ফরাসী 'পতা' (Petit) ফার্মে কাজ করতেন বলে প্রথমে পতীত্ওয়ালা ও পরে পতীত্ নামে পরিচিত হন। ঠিক সেইরকম মরিস কোম্পানিতে কাজ করে আমাদের অধ্যাপক মরিসওয়ালা পরে শুধু মরিস নামে বোম্বাই অঞ্চলে নাম করেন।

অত্যুত্তম ফরাসী ও লাতিন শেখার পর না জানি কোন্ যোগাযোগে তিনি

---

একাধিক সজ্জন পাঠকের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়েছি, ক্যানসার সম্বন্ধে জাওয়ারব্রুখের প্রাগুক্ত প্রবন্ধটি যেন আমিই অনুবাদ করি। আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, কারণ অসুস্থতাবশত আমার দেহে শক্তি মনে উৎসাহ বড়ই হ্রাস পেয়েছে। তবে এটাও নিবেদন, আমৃত্যু দুটি প্রবন্ধ অনুবাদ করতে পারার দুরাশা আমি কখনো সম্পূর্ণ ত্যাগ করবো না; ক্যানসার সম্বন্ধে প্রবন্ধটি ও অধ্যাপক ভিন্টারনিত্স্ রচিত ক্ষুদ্রাকার রবীন্দ্র-জীবনী।

শান্তিনিকেতন পৌঁছে সেখানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

দুটো বিষয়ে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী—সেন্টিমেন্টাল এবং আদর্শবাদী। আমার আশ্চর্য লাগতো, কারণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেসব গুজরাতী ছেলেরা—এবং পাঠিকারা অপরাধ নেবেন না, মেয়েরাও—শান্তিনিকেতন আসে, তারা পর্যন্ত টাকা আনা পাই হিসেব করতো; শুনেছি, ছাত্রেরা আকছারই আদর্শবাদী হয়। ( নইলে অত নিঃস্বার্থ ট্রাম-বাস পোড়ানোর সৎকর্মটা করে কে ? কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কথা না। হক্ কথা কইলে পুলিসে ধরবে। ) তাই গুজরাতী মরিস সাহেবের আদর্শবাদ আমাকে বিস্মিত করেছিল।

সামান্য বাঙলা শেখার পরই মরিস সাহেবের প্রেম উপচে পড়ল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি এবং তিনি সম্মোহিত হলেন

"তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার" শুনে।

অন্যত্র আলোচনা করেছি, ভারতের বাইরে কোনো ভাষাই 'ত' এবং 'ট'-র উচ্চারণে পার্থক্য করে না; এমন কি ভারতীয়দের ভিতর যাঁদের গায়ে প্রচুর বিদেশী রক্ত তাঁরাও এ-দুটোতে গুবলেট করেন। উদাহরণ স্থলে, গুজরাতের বোরা সম্প্রদায়—এখানকার রাধাবাজারে এঁদের ব্যবসা আছে—ব্রহ্ম উপত্যকার আসাম-বাসী ও পার্সী সম্প্রদায়।

তাই মরিস সাহেবের উচ্চারণে ছত্র দু'টি বেরুতো :

"টাহাটে এ জগটে ক্ষটি কার
নামাটে পারি যডি মনোভার।"

আমরা আর কি করে ওঁকে বোঝাই যে 'ত' 'দ'-এর অনুপ্রাস ছাড়াও গুরুদেবের গান আছে।

মরিস সাহেব নূতন বাঙলা শেখার সময় যে না বুঝে বিশীদাকে 'বেটা ভূত' বলেছিলেন তার চেয়েও আরো মারাত্মকতম উদাহরণ আমি শুনেছি। তিনি আমাদের ফরাসী শেখাতেন, এবং শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন এবং আরো কিছু অধ্যাপকও তাঁর ক্লাসে যেতেন। আমার হাসি পেত যখন গুরু মরিস ছাত্র বিধুশেখরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন ও ছাত্র বিধুশেখর তাঁকে 'তুমি' বলে। একদিন হয়েছে কি, ফরাসী ব্যাকরণের কি একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর। মরিস সাহেব বললেন, 'চমৎকার। শাস্ত্রী মশায়। সত্যি, আপনি একটি আস্টো ঘুঘু।'

শাস্ত্রী মশাইয়ের তো চক্ষুস্থির। একটু চুপ করে থাকার পর গুরু, গুরু—

যদ্যপি ছাত্র, তথাপি গুরু-কণ্ঠে শুধালেন, 'মরিস, এটা তোমাকে শেখালে কে ?'

নিরীহ মরিস বোধ হয় কণ্ঠনিনাদ থেকে বিষয়টার গুরুত্ব খানিকটে আমেজ করতে পেরে বললেন, 'ডিন্‌ডা ( দিনদা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর )। উনি বলেছেন ওটার অর্থ "অসাভারণ বুড্‌ডিমান"। টবে কি ওটা ভুল ?'

শাস্ত্রী মশাই শুধু ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দিনেন্দ্রনাথকে বোঝাবো।'

দিনুবাবু নাকি বিদেশীকে ভাষা শেখাবার সময় কর্তব্যবোধহীন চপলতার জন্য বেশ কিছুটা ভালোমন্দ শুনেছিলেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে।

ঐ সময় প্যারিস থেকে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। উভয়েই একাধিকবার বলেন, মরিস সাহেব উল্লেখ না করা পর্যন্ত তাঁরা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি, ফ্রান্স না গিয়ে মানুষ কি করে এরকম বিশুদ্ধ ফরাসী শিখতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে রলাঁর 'যীশুজীবনী' পড়ান। এ বই আমার মহদুপকার করেছে এবং করছে।

বলা বাহুল্য এই সরল সজ্জন যুবা পণ্ডিতটি সকলেরই হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন। গুরুদেবের তো কথাই নেই, মরিস সাহেব ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথেরও অশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন। বড়বাবু বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাক্যালাপ কালক্ষয় বলে মনে করতেন ; বলতেন, 'এরা সব তো জানে কোন্ শতাব্দীতে প্রজ্ঞাপারমিতা কিংব একাক্ষরপারমিতা প্রথম লেখা হয়, প্রথম ছাপা হয়। ওসব জেনে আমার কি হবে ? তার চেয়ে নিয়ে আসো না ওদের কোনো একজন, যে কাণ্টের দর্শন সমর্থন করতে পারে, আর আমি নেব বিরুদ্ধ মতবাদ, কিংবা সে নেবে বিরুদ্ধ মতবাদ, আমি নেব কাণ্টপক্ষ—তার যেটা খুশী।' মরিস সাহেব তাঁকে তখন অনুনয়-বিনয় করে সম্মত করাতেন বিদেশী পণ্ডিতকে দর্শন দিতে। অবশ্য দু' মিনিট যেতে না যেতেই বড়বাবু সব ভুলে গিয়ে কোনো কিছু অন্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় তন্ময় হয়ে যেতেন। আমাদের মতন ছেলে-ছোকরাদের কিন্তু তাঁর কাছে ছিল অবাধ গমন। আমার মনে পড়ে তো খৃস্টের কথা ; তিনি যেহোভার মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিস্তর তথাকথিত কুলাঙ্গার ভি আই পি-কে, এবং আদেশ দিতেন 'লেট দি চিলড্রেন কাম্ আনটু মী'।

মরিস সাহেব প্রথমটায় সম্মত ছিলেন না ; আর সকলের চাপাচাপিতে তিনি প্যারিসের সরবনে গিয়ে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হতে রাজী হলেন।

প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা।

আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করাতে আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ ; জর্মনিতে ডক্টরেট করবে। আমিও এখানে তাই করছি। আমরা এখন এক-বয়েসি।' আমার বয়েস তখন চব্বিশ, তাঁর বত্রিশ। তারপর আমাকে রেস্তোরাঁয় উত্তমরূপে খানদানী ডিনার খাওয়ালেন। বিনয় এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পরের দিন বললেন, 'তোমাকে ভালো করে এণ্টারটেন করতে পারলুম না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার এ মাসের টাকাটা এখনো দেশ থেকে আসে নি।' আমি তারস্বরে প্রতিবাদ জানালুম। বহু বৎসর পরে ঐ সময়কার এক প্যারিসবাসী ভারতীয়ের কাছে শুনতে পাই, মরিস সাহেব অন্যান্য দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্রদের টাকা 'ধার' দিয়ে দিয়ে মাসের বেশীর ভাগ দেউলে হওয়ার গহ্বর-প্রান্তে পড়ি পড়ি করে বেঁচে থাকতেন। আসলে তাঁর পরিবার বিত্তশালী ছিল।...তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। কিন্তু এখনো তাঁর সেই শান্ত সংযত প্রসন্ন বদনটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু তার পূর্বের একটি ঘটনা চিরকাল ধরে আমার ও আমার সতীর্থদের চিত্তে কৌতুক রস এনে দেবে, প্রতিবার সেটার স্মরণে।

গুরুদেব শারদোৎসবের মোহড়া নিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং, দিনুবাবু—এমন কি জগদানন্দবাবুর মত রাশভারী লোক—অজিন ঠাকুর এঁরা সব অভিনয় করবেন। এক প্রান্তে বসে আছেন শুষ্কাস্য বিষণ্ণবদন মরিস সাহেব। আমি হোম্‌টাস্‌ক্‌ না করলে তাঁর মুখে যে বিষণ্ণতা আসতো তিনি যেন তারই গোটাদশেক 'হেলপিং' নিয়েছেন। মোহড়ার শেষে দিনুবাবু কাচুমাচু হয়ে গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন, মরিস সাহেবকে ড্রামাতে একটা পার্ট দিতে।

গুরুদেবের ওষ্ঠাধর প্রান্তের মৃদুহাস্য সব সময় ঠাহর করা যেত না। এবারে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সব পার্টেরই বিলিব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গুরুদেব বললেন, 'ঠিক আছে। একে শ্রেষ্ঠীর পার্ট দিচ্ছি।' হয় মূল নাটকে শ্রেষ্ঠীর পার্ট আদৌ ছিল না, ঐটে মরিস সাহেবের জন্য 'ইস্‌পিসিলি' তৈরি হয় কিংবা হয়তো তখন মাত্র বড় বড় পার্টগুলোর বণ্টনব্যবস্থা আছে।

তা সে যা-ই হোক, শ্রেষ্ঠীর অভিনয় করবেন 'নটরাজ' মরিস—শাস্ত্রী মশাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন মরীচি ( ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা ও তিনি সূর্যকিরণও বটেন )—মরিসও সগর্বে কাঁচা-হাতে সেই নামই সই করতেন। এবারে শুনুন, পার্টটি কি ?

রাজা : ওগো শ্রেষ্ঠী !

শ্রেষ্ঠী : আদেশ করুন, মহারাজ !

রাজা : এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুনে দাও।

শ্রেষ্ঠী : যে আদেশ।

ব্যস্! ঐটুকু! আমার শব্দগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে মরিসকে ঐ পাঁচটি শব্দ বলতে হবে ; গুরুদেব সায়েবের বাঙলা উচ্চারণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকীব-হাল ছিলেন বলে। কিন্তু মরিস সাহেব বেজায় খুশ, জান্ তর্‌র্‌র্—ড্যাম্‌ম্যাড—হোক না পার্ট ছোট, তাতেই বা কি? বলেন নি স্বয়ং গুরুদেব, 'The rose which is single need not envy the thorns which are many?'

কিন্তু এইবারে শুরু হল ট্রবল। গুরুদেবের ভাষাতেই বলি, মরিসকে শুতে হল কণ্টকশয্যায়, গোলাপ-পাপড়ির আচ্ছাদিত পুষ্পশয্যায় নয়—যদিও থর্ন মাত্র একটি। গুরুদেব যতই বলেন 'আদেশ করুন, মহারাজ' মরিস বলেন, 'আডেশ করুন, মহারাজ।' মহা মুশকিল। মরিস আপন মরীচি-তাপে ঘর্মাক্তবদন। শেষটায় গুরুদেব বরাত দিলেন দিনুবাবুকে, তিনি যেন সাহেবের 'ত' 'ট'র জট ছাড়িয়ে দেন। আফটার অল—তিনিই তো খাল কেটে ঘরে কুমির এনেছেন; বিপদ, এক্‌স্‌কিউজ মি—বিপডটা টো টাঁরই টৈরি।

মরিস সাহেব ছন্নের মত হয়ে গেলেন। সেই প্রফেট জরথুস্ত্রের আমল থেকে কোন্ পার্সী-সন্তান এই 'ত' 'ট'য়ের গর্দিশ মোকাবেলা করেছে—এই আড়াই হাজার বছর ধরে—যে আজ এই নিরীহ, হাড্ডিসার মরিস বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা একা এই 'ত'য়ের তাবৎ 'দ'য়ের দানব—আই মীন ডানব, টাবড ডানবের সঙ্গে লড়াই দেবে?

মরিস ছন্নের মত আশ্রমময় ঘুরে বেড়ান—দৃষ্টি কখনো হেথায় কখনো হোথায়, আর ঠোঁট দুটি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। আমি বললুম, 'নমস্কার, স্যার।' সম্বিতে এসে বললেন, 'আ! সায়েড (সৈয়দ)—' ও হরি! এখনো 'সায়েড'! তবে তো আডেশ এখনো মোকামে কায়েম আছে, রাজাদেশেরই মত —'শোনো টো ঠিক হচ্ছে কি না "আডেশ করুন, মহারাজ"।' আমি সন্তপ্ত চিত্তে চুপ করে রইলুম। বার দশেক আডেশ আডেশ করে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে এগিয়ে গেলেন।

একটা ডরমিটরি-ঘরের কোণ ঘুরতেই হঠাৎ সমুখে মরিস—বিড়বিড় করছেন 'আডেশ আডে—।' রেললাইনের কাছে নির্জনে 'আডেশ—।' দূর অতি দূর খোয়াইয়ের নালা থেকে মাথা উঠছে সায়েবের, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রালোকে, খেলার মাঠে মরিস, আসন্ন উষার প্রদোষে শ্মশানপ্রান্তে কার ঐ

ছায়ামূর্তি ? মরিস। হিন্দী কবি সত্যি বলেছেন, গুরু তো লাখে লাখে, উত্তম চেলা কই। আশ্রমের ছেলেবুড়ো এখন সবাই সায়েবের গুরু। এস্তেক শিশু-বিভাগের কানাই, সাগর কেউ বাদ পড়ে নি। পড়ে থাকলে তাদের দোষ। সবাইকে টেস্ট করতে অনুরোধ করেন তাঁর আডেশ আডেশানুযায়ী হচ্ছে কি না। ইতিমধ্যে এক সন্ধ্যায় মোহড়া শেষে দিনুবাবু গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে অনুরোধ জানালেন 'আদেশে'র বদলে অন্য কোনো শব্দ দিতে, যেটাতে "ত" "দ" নেই। গুরুদেব বললেন, 'না ; মরিসকে "ত" "দ" শিখতেই হবে।'

এর পর দ্বিতীয় পর্ব। হঠাৎ সকলের সামনে এক দিন বেরিয়ে গেল 'আদেশ' অত্যুত্তম 'দ' সহ। আমি 'ইয়াল্লা' বলে লম্ফ দিলুম। কেউ 'সাধু সাধু', কেউ বা 'কনগ্রাচুলেশনস্' বললেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমরা বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে ফেলেছি! সায়েব পরক্ষণে আডেশ-এ ল্যাপস্ করেছেন। তারপর তাঁর ক্ষণে আসে 'দ' ক্ষণে 'ড'। কলকাতার বাজারে মাছ ওঠা-না-ওঠার মত বেটিঙের ব্যাপার! এই করে করে চললো দিন সাতেক। সমুখে আশার আলো।

এর পর তৃতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের মত এটাও অপ্রত্যাশিত। সায়েব এখন চাঁচাছোলা, ভোরবেলার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশিরবিন্দুর ন্যায় 'দ' বলতে পারেন। পয়গম্বর জরথুস্ত্র এবং তাঁর প্রভু আহুর মজদাকে অশেষ ধন্যবাদ!

আমরাও আমাদের সঙ্কটটা ভুলে গেলুম। মোহড়ায় প্রতিবার ঋষি মরীচি বৈদিক পদ্ধতিতে 'দ' উচ্চারণ করেন।

মরিস সাহেব স্টেজে নামলেন পার্সী দস্তুর বা যাজকের বেশ পরে। সব-কিছু ধবধবে সাদা। শুধু মাথার টুপিটি দাদাভাই নোরজী স্টাইলের লেটার-বক্স্ প্যাটার্নের কালোর উপর সফেদ বুট্টাদার। গুরুদেব এই বেশই চেয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা পার্সীরা বাপু এ দেশের শ্রেষ্ঠী। তোমরা যা পরবে তাই হবে শ্রেষ্ঠীর বেশ।'

নাট্যশালা গম গম করছে। ওঃ, সে কী অভিনয়! গুরুদেবকে দেখাচ্ছে দেবদূতের মত। অজিনের চেহারা এমনিতেই খাপসুরত, এখন দেখাচ্ছে রাজ-পুত্রের মত। গুরুমশাই জগদানন্দ রায়ের কী বেত্রাস্ফালন! আশ্রমে বেতের বেসাতি বিলকুল বে-আইনি। এ মোকায় জগদানন্দবাবু যেন হৃতোপবীত-দ্বিজ লুণ্ঠিত যজ্ঞোপবীত ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কঠিনদর্শন মুখচ্ছবি ঈষৎ স্নিগ্ধতা ধরেছে।

মরিস সাহেব প্রবেশ করলেন রঙ্গমঞ্চে।

রাজা দিলেন ডাক।

মরিস সাহেব—হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র কেন তৎপূর্বেই অবতীর্ণ হল না?

উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় মরিস বলে ফেলেছেন, 'আ ডে শ।'

অট্টহাস্যে ছাদ যেন ভেঙে পড়ে। তিনি কিন্তু ঐ একই উত্তেজনার নাগপাশে বদ্ধ বলে সে অট্টহাস্য শুনতে পান নি।

সে সন্ধ্যার অভিনয়ের জন্য অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসই পেয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। আমাদের বিবেকবুদ্ধি সেই আদেশই দিয়েছিল—খুব সম্ভব আডেশই।[১]

## 'আধুনিক' কবিতা

'সুশীল পাঠক—'

ছেলেবেলায় এ ধরনের সম্বোধন পড়ে হৃদয়ে বড় আনন্দ হত। মনে হত, কত মহান লেখক এই কালীপ্রসন্ন সিঙি, যিনি কিনা মহাভারতের মত বিরাট গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন, তিনি আমাকেই সম্বোধন করে কথা বলেছেন! এটা যে নিছক সাহিত্যিক ঢং, বলার একটা আড়, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না। বিশেষ করে যখন আমার ধারণা হল—সেটা হয়তো ভুল—যে দরদ-ভরা কথা কয়ে যখন তিনি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে চান, তখনই 'পাঠক' বলে সম্বোধন করেন। এবং আরো বেশী করে 'সহৃদয় পাঠক' বলে সম্বোধন করতেন সিঙি মশাইয়ের মত দরদী লেখককুল যখন তাঁরা এমন কোনো অভিজ্ঞতার বর্ণনা করতে যেতেন, যেটার মোক্ষম মার বেশীর ভাগ পাঠকই খেয়েছে। এ অধম প্রাচীনপন্থী। সে এখনো পাঁচকড়ি দে পেলে গোপনে পড়ে। এবং বটতলাতে কিছুক্ষণ হল একখানা 'সচিত্র প্রেমপত্র' কিনে সে বড় ভরসা পেয়েছে। যৌবনে ভাষার উপর দখল ছিল না—এখনই বা হল কই?—মরমিয়া প্রেমপত্র লিখতে পারতো না বলে রায়ের ভাষায়, "উনিশটি বার প্রেমেতে সে ঘায়েল করে থামলো শেষে।" আর ভয় নেই! এখন এই অমূল্য গ্রন্থ থেকে নকল করে ফিলিমস্টার থেকে মেয়ে-পুলিস সকলেরই 'সজল নয়নে হৃদয়-দুয়ারে ঘা' দেওয়া যাবে।

১ মরিস সর্বদাই ঈষৎ বিষণ্ণ বদন ধারণ করতেন—খুব সম্ভব এটাকেই বলে 'মেলানকলিয়া'। প্যারিস থেকে ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে অন্তর্ধান করেন। আমার মত আর পাঁচজন তার কারণ জানে না। শুনেছি, তিনি উইল করে তাঁর সর্বস্ব বিশ্বভারতীকে দিয়ে যান।

বইখানার প্রথম চার লাইন পড়লেই বুঝতে পারবেন, মাইকেল রবীন্দ্রনাথ এর থেকে কতখানি পিছিয়ে আছেন :—

'প্রিয়তমা চারুশীলা পিতৃগৃহে গিয়ে
আছ তো সুখেতে তুমি গোষ্ঠিজন নিয়ে ?
তুমি মোর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ধন।
তুমি মোর হৃদয়ের শান্তিনিকেতন।'

জানি, জানি - বাধা দেবেন না, জানি আপনারা বলবেন, এই মডার্ন যুগে এসব পণ্য অচল। কিন্তু আপনারা কি এ তত্ত্বটাও জানেন না যে, ফ্যাশান হর-হামেশা বদলায় এবং আকছারই প্রাচীন যুগে ফিরে যায় ? পিকাস্সো ফিরে গেছেন প্রাগৈতিহাসিক গুহাবাসীর দেয়াল-ছবিতে, অবনঠাকুর মোগলযুগে, নন্দলাল অজন্তায়, যামিনী রায় কালীঘাটের পটে। কাব্যে দেখুন, দুর্বোধ্য মালার্মে র‍্যাঁবো যখন অনুবাদের মারফৎ ইংলণ্ডও জয় করে বসে আছেন, তখন হাউসম্যান লিখলেন সরল প্রাঞ্জল 'শ্রপশার ল্যাড'। বলা হয়, ইংলণ্ডে কবির জীবিতাবস্থায় তাঁর একখানা বইয়ের এত বিক্রির অন্য উদাহরণ নেই। কোনো ভয় নেই। বাঙলা দেশের মডার্ন কবিতাও একদিন 'পাখি সব করে রবে'র অনবদ্য শাশ্বত ভঙ্গিতে লেখা হবে।

আমি মডার্ন কবিতা পছন্দ করি নে, তাই বলে মডার্ন কবিতার কোনো 'রোজোঁ দেত্রর্' রীজন ফর এগজিস্টেনস্ অর্থাৎ পুচ্ছটি তার উচ্ছে তুলে নাচাবার 'রোজোঁ' রাজন, ন্যায্যহক্ক নেই এ কথা কে বলবে।

প্রথমেই নিন মিলের অত্যাচার। এবং এই মিলটা আমাদের খাটি দিশী জিনিস নয়। সংস্কৃতের উত্তম উত্তম মহাকাব্যে, কাব্যে মিল নেই। যদিস্যাৎ থাকে, তবে সেটা আকস্মিক দুর্ঘটনা, প্রায় কবির অনিচ্ছায় ঘটেছে। সংস্কৃতে প্রথমে মিল পাই—আমার জানা মতে—মোহমুদ্গরে। এবং তিনিও সেটা বহিরাগত ভাষা থেকে নিয়েছিলেন, এমত সন্দেহ আছে। সংস্কৃতে সহোদরা ভাষা গ্রীক লাতিনে কি মিল আছে ? এ দেশেই দেখুন, উর্দু তার জননী সংস্কৃত ভাষা থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছে, জোব্বা-জাব্বা পরে প্রায় মুসলমান হয়েছে ( প্রায় বললুম কারণ এখনো বহু হিন্দুর মাতৃভাষা উর্দু ; উর্দু কবি-সম্মেলনে তাঁরা সম্মানিত সক্রিয় অংশীদার। কিন্তু, পণ্ডিত নেহরু, তেজবাহাদুর সপ্রু ইত্যাদির মাতৃভাষা ছিল উর্দু ), তথাপি আজও উর্দুতে বিনা মিলে দোঁহা রচনা করা হয়, সংস্কৃত সুভাষিতের অনুকরণে। 'মিল' শব্দটা কি শুদ্ধ সংস্কৃত ? সংস্কৃতে একে বলে 'অন্ত্যানুপ্রাস্'—স্পষ্ট বোঝা যায়, বিপদে পড়ে মাথায় গামছা বেঁধে ম্যানু-

ফেকচার্ড এরজাৎস্ মাল। অতএব যদি মডার্ন কবিরা সে-বস্তু এড়িয়ে চলেন তবে পাঠক তুমি গোস্‌সা করো ক্যান্? ওঁরা তো মাইকেলেরই মত আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য পুনর্জীবিত করছেন। এই যাবনিক ম্লেচ্ছাচারের যুগে সেটি কি চাট্টিখানি কথা!

তারপর ছন্দ? ছন্দহীন কবিতা হয় না, আপনাকে বলেছেন কোন্ অলঙ্কার-শাস্ত্রের গোসাঁই? উপনিষদ পড়েছেন? তার ছন্দটি কান পেতে শুনেছেন? ছন্দে বাঁধা কবিতা আসতে পারে তার কাছে? বস্তুত বেদমন্ত্রে ছন্দ মেনে মেনে হায়রান হয়ে ঋষিকবি উপনিষদে পৌঁছে কি যুগপৎ তাঁর আধ্যাত্মিক ও কাব্যিক মোক্ষ লাভ করলেন না? এ অধম অশিক্ষিত—তথাপি গুণীজনের কাছে শোনা উপনিষদের একটি সামান্য সাদামাটা প্রশ্ন নিন :—

'সূর্য অস্ত গেছে, চন্দ্রও অস্ত গেছে, অগ্নি নির্বাপিত (অর্থাৎ আগুন জ্বালিয়ে যে একে অন্যকে দেখবো তার উপায় নেই), কথাও বন্ধ (অর্থাৎ চিৎকার করে ডাকবারও উপায় নেই)। তখন কোন্ জ্যোতি নিয়ে মানুষ (বেঁচে) থাকে, বলুন তো যাজ্ঞবল্ক্য?'

এবার সংস্কৃতটা শুনুন :—

'অস্তমিতে আদিত্যে, যাজ্ঞবল্ক্য, চন্দ্রমস্যস্তমিতে, শান্তেঽগ্নৌ, শান্তায়াং বাচি, কিংজ্যোতিরেবায়ং পুরুষঃ?'

প্রচলিত মন্দাক্রান্তা বা শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এই অতুলনীয় সঙ্গীতমন্দ্রিত-স্পন্দিত ছত্র বেঁধে দিলে কি প্রভু যীশুর ভাষায় লিলিফুলের উপর তুলি নিয়ে রঙ বোলানো হত না?

এতেও যদি আপনাদের মন না ভরে তবে পড়ুন ইংরিজী অনুবাদে বাইবেল—রাজা দায়ুদের গান, সুলেমান বাদশার গীতি (সং অব্ সংজ, সং অব্ সলোমন)। সে তো গদ্যে, এবং স্বয়ং বার্নার্ড শ বলেছেন, ঐ সলোমনের গীতিটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা।

আবার আপনি যদি মুসলমান হন তা হলে তো কথাই নেই। আপনি জানেন প্রাক-পয়গম্বর যুগেও আরবদের ছিল বহু বিচিত্র ছন্দে, মিলের কঠোরতম আইনে বাঁধা অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টি। গদ্য ছিল না, কিংবা প্রায় না থাকারই মত। তথাপি আল্লা-তালা পয়গম্বরকে যে কুরানের বাণী পাঠালেন সে তো গদ্যে। অথচ আরবী-ভাষা নিয়ে যাঁরা সামান্যতম চর্চা করেছেন তাঁরাই শপথ করে বলবেন, এঁর ছন্দোময় গদ্য যে কোনো বাঁধা কাব্যকে হার মানায়। পয়গম্বরকে যখনই তাঁর বিরুদ্ধপক্ষ কোনো প্রকারের মিরাকল্ (অলৌকিক কীর্তি) দেখাতে আহ্বান

করতো তখনই তিনি সবিনয় বলতেন, 'আমি নিরক্ষর আরব। তৎসত্ত্বেও আল্লা-তালা আমার কণ্ঠ দিয়ে যে কুরান পাঠালেন তার কাছে কি আসতে পারে তোমাদের শ্রেষ্ঠতম কাব্য? এইটেই হল সবচেয়ে বড় মিরাক্‌ল্।'

অতএব মর্ডান কবিরা যদি ছন্দ অস্বীকার করেন তবে আপনি চটেন ক্যান্?

তৎসত্ত্বেও মর্ডান কবিতার দুশ্‌মনরা হয়তো বলবেন, তারা সুন্দর সুন্দর জিনিসের সঙ্গে বিৎকুটে সব জিনিসের তুলনা দেয়—যেমন তালগাছের ডগায় চাঁদ দেখে লিখলে, এ যেন আকাশের সুচিক্কণ সুমসৃণ তাল। কিংবা প্রিয়ার বিনুনি দেখে কবির মনে এল পানউলীর দোকানে ঝোলানো অগ্নিমুখ নারকোলের পাকানো দড়ি—যার ডগায় লাগিয়ে আমি আকছারই বিড়ি ধরাই। সেই দড়ি হাওয়ায় দুলে কবির কুর্তা পুড়িয়ে দিয়ে পিঠে ছ্যাঁকা দিয়েছে, ঠিক তেমনি প্রিয়ার বিনুনি দেখা মাত্রই তাঁর বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

এটা পড়ে তাজ্জব মানছেন কেন?

রাজা শূদ্রকের 'মৃৎ-শকটিকা' পড়েন নি? জর্মনরা সংস্কৃতের সমজদার এস্তেক গ্যোটে হাইনে সংস্কৃত না জেনেও ভারতীয় নাট্যের স্মরণে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করতেন। শূদ্রকের এই নাটকটি জর্মন ভাষাতে ক'বার যে ভিন্ন ভিন্ন রসিকজন দ্বারা অনূদিত হয়েছে বলা কঠিন, ক'বার যে জর্মনিতে মঞ্চস্থ হয়েছে সেটা বলা তার চেয়েও কঠিন। সেই নাট্যে আছে, ক্ষুধিত সূত্রধার বাড়ি ফেরার সময় গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন—বাড়িতে তো চালডাল কিছুই নেই, গৃহিণী কি আদৌ রন্ধন করতে পেরেছেন? বাড়ি ঢুকেই সূত্রধার সানন্দে সবিস্ময়ে দেখেন, সাদা মাটির উপর লম্বা লম্বা কালো কালো আঁজি আঁজি দাগ—কালিমাখা হাঁড়ি মাটিতে ঘষে ঘষে গৃহিণী সাফসুৎরো করেছেন। অতএব ধূম্র দেখলে যে রকম বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়, হাঁড়ি পারষ্কার করা হয়ে থাকলে রান্নাও যে হয়েছে সে বিষয়ে কি সন্দেহ? সূত্রধার তখন সোল্লাসে উপমা দিয়ে বললেন, ওহো! সাদা মাটির উপর এই কালো কালো আঁজি যেন তুষারধবলা গৌরীর ললাটে কৃষ্ণাঞ্জন-তিলক!

কী মারাত্মক গদ্যময় হাঁড়িকুঁড়ি, মাটিতে সেগুলো ঘষার ফলে নো রা কালো আঁজির সঙ্গে শিবানী গৌরীর অসিত তিলকের তুলনা! এ যে রীতিমত হেরেসি, এ হেন তুলনা চার্বাকের বেদ নিন্দার চেয়েও ধর্মঘ্ন কটু-ভাষণ।

এর পরও আপনি আপত্তি করে বলবেন মর্ডান কবিতা ন দেবায় ন ধর্মায়?

বুদ্ধিমান তথা না-ছোড়-বান্দা পাঠক, আমি বিলক্ষণ জানি, আপনার প্রধান আপত্তি কোন্‌খানে—ছোটখাটোগুলো উপস্থিত না হয় বাদই দিলুম। আপনি বলবেন ওদের কবিতা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি নে। আম্মো পারি নে

—ধাপ্পা না মেরে হক্ক কথাই কই। সে তো আপনার দোষ, আমার দোষ। আপনি আমি পয়সাওলার ছেলে হয়ে জন্মালে সত্যকার অপ্‌টুডেট্‌, chic, dernier cri, লেটেস্ট মডেলের হাইয়ার এডুকেশন পেতুম; আপনি, আমি আমরা নিদেন যদি অধ্যাপক হতুম, তারো নিদেন যদি আমরা তাঁদের শিষ্য হবার সুযোগ পেতুম, তবে তো আজ এ প্রশ্ন তুলতুম না। কিন্তু এহ বাহ্য।

'বুঝতে পারি নে' কথাটার অর্থ কি? আপনি ভৈরবী বা পূরবী শুনে যদি রস না পান তবে কি গায়ককে এ প্রশ্ন শুধান, 'ভৈরবীর অর্থ আমায় বুঝিয়ে দাও?' আরো সহজ দৃষ্টান্ত দি। পদ্মাবক্ষে আপনি সূর্যোদয় দেখে মুগ্ধ হলেন, মাঝি হলো না। সে যদি আপনার তন্ময় ভাব দেখে শুধোয়, 'কত্তা', সূর্যযি তো উঠলেন, কিন্তু আপনি এমন বে-এক্তেয়ার হলেন কেন? এ সূর্যযি ওঠাতে কি আছে আমাকে বুঝিয়ে দেন', তাহলে আপনি কি বোঝাবেন? তাজমহল দেখে হাক্‌স্‌লি মুগ্ধ হন নি, কিন্তু তিনি তো গাইডকে এ প্রশ্ন শুধোন নি, 'তাজমহলের অর্থ আমায় বুঝিয়ে বলো'। কিংবা ভরতনাট্যম দেখে আপনি যদি 'অর্থ' বুঝতে চান, তবে হয়তো অভিনয়াংশের অর্থ আপনাকে বোঝানো যাবে কিন্তু বিশুদ্ধ নাট্যরসের (যেমন যন্ত্রসঙ্গীতের) 'অর্থ'-ই বা কি, আর বোঝাবেই বা কে? চিত্রে একদা লোকে কোনো বস্তুর সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখে কিছুটা অর্থ পেত কিন্তু এখন ক্যুবিজম্‌, দাদাইজমে কেউ সাদৃশ্য খোঁজে না, অর্থও খোঁজে না। কাঠের একটা গুঁড়ি নিয়ে বিখ্যাত ভাস্কর ছ'মাস ধরে প্রাণপণ খাটলেন; প্রদর্শনীর মধ্যকক্ষে সেটি স্থাপিত করে তলায় নাম লিখলেন, কাঠের একটা গুঁড়ি। কাঠের গুঁড়ি, কাঠের গুঁড়ি; ভৈরবী, ভৈরবী। তার আবার অর্থ কি?

মনে হচ্ছে আপনি তন্ত্রের কিছুই জানেন না। তন্ত্রের নিগূঢ়তম মন্ত্রের অর্থ শোধান না গুরুকে? যদি তিনি প্রকৃত গুরু হন তবে আপনার হাড় ক'খানা আর আস্ত থাকবে না। আর অত গভীরে যাবার কি প্রয়োজন? এই যে পৃথিবীর কোটি কোটি নর-নারী উপাসনা করে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়, তার ক'টা ভাষা লোকে বোঝে? আপনি উত্তরে হয়তো বলবেন, আমরা রস নিয়ে বিচার করছি। তা হলে স্মরণে আনুন, সেই বুড়ি—দাড়িওয়ালা কথকঠাকুরের কথকতা শুনে হাউ-হাউ করে কেঁদেছিল—কথকতার এক বর্ণ না বুঝেও। তার স্মরণে কি এসেছিল সেটা অবান্তর। তার কান্নাটা সত্য। তার রসবোধটা সত্য।

অলঙ্কার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে তলিয়ে দেখুন, অর্থ বোঝা মাত্রই রসোৎপন্ন হয় না—অর্থ পেরিয়ে যে ব্যঞ্জনা যে ধ্বনি যে অনির্বচনীয়তার সৃষ্টি হয়, রস সেই গভীর গুহায়। উপনিষদে আছে সত্য (এবং সত্যই অনুভূতির ক্ষেত্রে রস—

কারণ সৎ আনন্দ এবং চিৎ নিয়ে সচ্চিদানন্দ ) আছেন সোনার পাত্রে লুকানো। সাধারণ জন সোনার পাত্র দেখেই মুগ্ধ, ভিতরে তাকিয়ে দেখে না। কাব্যে, সঙ্গীতে সর্বত্রই অর্থ জিনিসটা সুবর্ণপাত্র, তাই দেখে লোক মুগ্ধ। রস কিন্তু ভিতরে। তার সঙ্গে পাত্রের কি সম্পর্ক? পাত্রস্থিত অমৃতরসের সঙ্গে যে ধাতু ( অর্থ ) দিয়ে পাত্র নির্মিত হয়েছে তার কি সম্পর্ক? কিছুই না। তাই, এ সব বুঝেই কবি দ্বিজেন্দ্রলাল গেয়েছিলেন,

'জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না **অর্থ**।'

## মূর্খের উপাসনা অপেক্ষা পণ্ডিতের নিদ্রা শ্রেয়ঃ

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন শুধান, হিন্দু, ধর্ম, হিন্দু শাস্ত্র নিয়ে যে অফুরন্ত কাহিনী কিংবদন্তী আছে—যেরকম যমদূত একবার ভুল করে মৃত্যুর নির্ধারিত দিবসের পূর্বে এক নায়েবকে নরকে নিয়ে যাওয়ার ফলে কি রকম তুমুলকাণ্ড ঘটেছিল—মুসলমানদের ভিতরও তেমনি আছে কি না। আছে, কিন্তু সেগুলো প্রধানত লোকশিক্ষার জন্য এবং অনেকগুলোতেই প্রচুর হাস্যরসও আছে। এসব গল্পের প্রাচুর্য ইরানেই বেশী, এবং তুর্কীতে খুবই কম। তুর্কীরা নাকি বড্ড বেশী সিরিয়াস। অতএব গোড়া। অতএব রসকষহীন।

আমার একটি গল্প মনে পড়ল এবং সেটা সকলেরই কৌতূহল জাগাবে। কারণ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ইহুদি, কি খৃষ্টান—সকলেই জানতে চায় মহাপ্রলয় ( আরবীতে কিয়ামৎ ) কবে আসবে? সর্ব ধর্মের শাস্ত্র-গ্রন্থেই তার কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, কিন্তু পাকাপাকি কোনো-কিছু জানার উপায় নেই। একদা নাকি খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিল, খৃষ্টজন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয় আসবে শুনতে পাই, অনেক লোকেই নাকি তার কিছুদিন পূর্বে সর্বস্ব বিক্রয় করে দান-খয়রাতে উড়িয়ে দেয়।

১০০০ খৃষ্টাব্দ পূর্ণ হওয়ার দিনে শেষটায় যখন মহাপ্রলয় হল না তখন এরা পস্তিয়ে ছিলেন কি না জানি নে, তবে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়া ভালো। এখন ১৯৬৬। যদি রটে যে, ২০০০-এ মহাপ্রলয়, তবে এখন যারা যুবা এবং বালক তারা যেন ঐ সময়টায় একটু ভেবেচিন্তে দান-খয়রাৎ করেন।

মহাপ্রলয় কবে আসবে, সে সম্বন্ধে আরবদের ভিতর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

আল্লা-পাক নাকি একদিন প্রধান ফিরিশ্‌তা ( বাঙলায় ফেরেস্তা লেখা হয়; অর্থ এঞ্জেল, দেবদূত ) জিব্রাইলকে ( ইংরিজিতে গেব্রিয়েল ) ডেকে আদেশ দেবেন, যাও তো, মানুষের ছদ্মবেশ ধরে পৃথিবীতে। যে কোনো একজন মানুষকে শুধোও, জিব্রাইল এই মুহূর্তে কোথায় আছেন? জিব্রাইল পৃথিবীতে নেমে একজন মর্ত্যবাসীকে সেই প্রশ্ন শুধোলেন। লোকটা কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললো 'এরকম বেফায়দা প্রশ্ন করে লাভটা তোমার কি? আমার এসব জিনিসে কোনো কৌতূহল নেই, তবে যখন নিতান্তই শুধোলে তবে—দাঁড়াও, বলছি।' লোকটি দুই লহমা চিন্তা করে বলল, 'হুঁ, ঠিক বলতে পারবো না—তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সে ( আরবীতে ইংরিজীর মত he-র সম্মানার্থে কোনো 'তিনি' শব্দ নেই এখন পৃথিবীতে। বেহেশ্‌তে নয়।' জিব্রাইল স্বর্গে ফিরে আল্লাকে উত্তরটা জানালে তিনি বলবেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো বহু সহস্র বৎসর। তার পর আবার আল্লা-পাক ঐ একই প্রশ্ন একই ভাবে শুধোবার জন্য জিব্রাইলকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। এবারে যে মর্ত্যবাসীকে শুধোনো হল, সে বিরক্ত হল আরো বেশী। বললে, 'কি আশ্চর্য! এখনো মানুষ এরকম সম্পূর্ণ বাজে বেকার প্রশ্ন করে! হিসেব কষলে যে এরকম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না তা নয়, তবে দেখো, এসব ব্যাপারে আমার কোন উৎসাহ নেই। আচ্ছা…' এক সেকেণ্ড চিন্তা করে লোকটা বললে, 'স্বর্গে তো নয়, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে…', ফের দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'পৃথিবীতেই যখন, দাঁড়াও, হাঁ, কাছেপিঠেই কোথাও—আমি চললুম।' জিব্রাইল বেহেশ্‌তে ফিরে এসে আল্লাকে সব কিছু বয়ান করলেন। আল্লা বললেন, 'ঠিক আছে।' তার পর কেটে যাবে আরো কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লক্ষ বৎসর। আবার জিব্রাইল সেই হুকুম নিয়ে ধরাভূমিতে আসবেন। এবার যাকে শুধালেন সে তো রীতিমত চটে গেল—'এসব বাজে বাজে প্রশ্ন…ইত্যাদি।' জিব্রাইল বেশ কিছুটা কাকুতি-মিনতি করাতে সে নরম হয়ে বললো, 'তাহলে দেখি! হুঁঃ, স্বর্গ নয়, পৃথিবীতে।' তারপর আরেক সেকেণ্ড চিন্তা করে বললে, 'কাছে-পিঠে কোথাও।' তারপর আরো দু'সেকেণ্ড চিন্তা করে তাজ্জব মেনে বলবে, 'কী আশ্চর্য, যে এরকম মস্করা করো। তুমিই তো জিব্রাইল—তবে শুধাচ্ছো কেন?' এবারে জিব্রাইল সব খবর দিলে আল্লা-পাক হুকুম দেবেন মহাপ্রলয়ের শিঙা বাজাতে।

কথিকাটির তাৎপর্য কি?

প্রথমত, মানুষ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে করে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যে স্বর্গের খবর পর্যন্ত তার কাছে আর অজানা থাকবে না।

দ্বিতীয়ত, কিন্তু, তার তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিদ্যাচর্চার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সাংসারিক, বৈষয়িক, প্র্যাকটিকাল জিনিস নিয়ে।[১] ইহলোক ভিন্ন পরলোক, পাপপুণ্যের বিচার, সে স্বর্গে যাবে না নরকে জলে পুড়ে খাক হবে—এ সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল থাকবে না, কারণ স্বয়ং জিব্রাইলকে হাতের কাছে পেয়েও সে এসবের কোনো অনুসন্ধান করলো না। এমন কি সৃষ্টিকর্তা আল্লা— দীন দুনিয়ার মালিক—যাঁকে পাবার জন্য কোটি কোটি বৎসর ধরে শত শত কোটি মর্ত্যের মানুষ স্বর্গের দেবদূত আমৃত্যু দেবদুর্লভ সাধনা করেছে, তাঁর প্রতিও সে উদাসীন।

তৃতীয়ত, যেহেতু সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন অতএব কল্পনা করা কঠিন নয় যে, সে তখন বিশ্বভুবন তার খেয়াল-খুশী মর্জি মাফিক নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টায় লেগে যাবে। তারই ফলে হয়তো বেরুবে শত শত আইষমান কোটি কোটি ঈশ্বরসৃষ্ট জীবকে বিনাশ করতে।

* * *

ভরসা হচ্ছে, বিশ্ববিবর্তনে যদ্যপি সেই চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, অর্থাৎ মানুষ ক্রমেই সত্যসুন্দরের অল্-হক্ অল্-জমীল ) সাধনার পথ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তবু এখনে বোধ হয় পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌছতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। পক্ষান্তরে ইসলাম একথাও বলেন, কিয়ামৎ যে-কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। তার অর্থ, মানুষ হয়তো হঠাৎ এক লম্ফে পরিপূর্ণ জড়বাদে পৌছে যেতে পারে।

পয়গম্বর বলেছেন, "আল্লার থেকে মানুষকে দূরে নিয়ে যায় শয়তান।" সেই শয়তান জড়বাদের প্রতিভূ এবং প্রতীক। অতএব প্রত্যেক সত্য-জ্ঞানান্বেষীর প্রধান কর্তব্য জড়বাদ অর্থাৎ শয়তানের কীর্তিকলাপ কি প্রকারে বাহ্যজগতে স্বপ্রকাশ হয় সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা—তথা শয়তান প্রলোভন নিয়ে উপস্থিত হলে আত্মহারা না হয়ে জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা তার স্বরূপ চিনতে পারা। শুদ্ধমাত্র আচার-

---

১ ইমাম গজ্জালী মুসলিম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ—কেউ কেউ বলেন সর্বশ্রেষ্ঠ —মনীষী। তিনি একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রী ও সুফী ( রহস্যবাদী ভক্ত ) ছিলেন। আরব্যোপন্যাস যুগের বিখ্যাত বাগদাদ নগরীর বিশ্ববিদ্যালয় সে যুগের মধ্যপ্রাচ্যের সর্বোত্তম জ্ঞানকেন্দ্র ছিল। ইমাম গজ্জালী তার রেক্টর ( শেখ ) ছিলেন। অধুনা তাঁর একখানা বইয়ে দেখি, তিনি মনস্তাপ করছেন যে, তাঁর কালের ( মৃত্যু ১১১১ খৃষ্টাব্দে ) লোক শুধু প্র্যাকটিক্যাল বিদ্যা শেখে। আমি ভরসা পেলুম।

অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সরল জীবন যাপনই যথেষ্ট নয়; জ্ঞানানুসন্ধান নিত্য-প্রয়োজনীয় অবশ্যকর্তব্য। এই মর্মে আরেকটি কাহিনী আছে :—

একদা শয়তানের রাজা, ধাড়ি শয়তান এক বাচ্চা শয়তানকে তালিম দিচ্ছিল, সৎপথগামীদের কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে বিপথগামী করা যায়। ধাড়ি শয়তান অতিশয় ধুরন্ধর গুরু এবং বিশ্বপর্যটক (জাহানদীদা) রূপে অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সম্যক অবগত আছে, কোন্ প্রকারের মানুষ কোন্ পদ্ধতিতে চলে, কাকে সমঝে চলতে হয়, আর কেই বা অগা আহাম্মুখ। ঐ অনুচ্ছেদে এসে ধাড়ি বললে, 'কিন্তু বৎস, হুঁশিয়ার। আচারনিষ্ঠ সাধুজনকে বরঞ্চ আমাদের পথে (মানবীয় ভাষায় কুপথে) নিয়ে যাবার চেষ্টা করো কিন্তু জ্ঞানী পণ্ডিতকে সমঝে-বুঝে চলো। ওরা বড়ই ভীষণ প্রাণী। সৃষ্টির আদিম কাল থেকে ওরাই আমাদের আদিম দুশমন।'

শাগরেদ ক্ষুদে শয়তান আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে কি কথা! আচারনিষ্ঠ জন তো সদাই জপতপ নিয়ে ব্যস্ত থাকে; আমার কথা ভাববার তার ফুরসৎ কই? আর পণ্ডিতদের কথা যখন বললেনই, প্রভু, তবে নিবেদন করি, আজকের দিনে তাদের অবস্থাটা একটু পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। খেতে পায় না, পরতে পায় না আর আকাট-মুর্খ নিষ্কর্মারা বড় বড় চাকরির পদবী নিয়ে ওদের মাথায় ডাণ্ডা বোলায়। নিজে মেস্টার, ওদিকে ছেলেটাকে কলেজে পাঠাতে পারে না। এসব হাভাতেদের লোভ দেখিয়ে পথ ভোলাতে কতক্ষণ?'

ধেড়ে হেসে বললে, 'খুব তো মুখে মুখে হাই-জাম্প লঙ-জাম্প দেখালি। কাজের বেলা কি হয় সেটা বোঝা যাবে পরশু দিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে।'

পরশু দিনের দিন প্র্যাকটিক্যাল। সে বড় কঠিন তালিম। তাবৎ হপ্তার এলেম হাতেনাতে বাৎলাতে হয়। আমাদের ইস্টুডেন্টরা টুকলি-নকল করলে আমরা যে রকম সেটাকে 'শয়তানী' নাম দিয়ে চোটপাট করি, এখানে তেমনি সাধু সরল পন্থায় কম উদ্ধার করতে গেলে সেটাকে 'সাধুমী' বলে গুরু কান মলে দেয় শিষ্যের।'

ধেড়ে আদেশ দিলেন, 'ঐ যে হোথা একটি সরল সাধু জপ করছে ওকে আমাদের পথে নিয়ে আসার ডিমন্স্ট্রেশনটি করো তো, বৎস।'

বাচ্চা শয়তান প্রমাদ গুনলো। এই সৌম্যদর্শন, কৃচ্ছ্রসাধনজনিতপাণ্ডুর তথাপি মধুরবদন সাধুকে ধর্মপথ থেকে বিচলিত করা কি তার মত চ্যাংড়া শাগরেদের কর্ম! না জানি, আজ কপালে কি আছে!

ক্লাসে যে নোট দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো সে দফে দফে স্মরণে আনলো। তার

পরে বিএলজব্‌ব, ইব্‌লিস, ডিয়াবলুস, শয়তান-উস্‌শয়াতীন সবাইকে মনে মনে হাজার হাজার আদাব-বন্দেগী জানিয়ে গেল বেশ ধারণ করতে।

আহা! সে কী চিত্তহারিণী ভূষা! ধেড়ে, আণ্ডা, সব শয়তানকে লড়তে হয় ফিরিশ্‌তা অর্থাৎ দেবদূতদের সঙ্গে—তাই ওঁদের চালচলন বেশভূষা তারা খুব ভালো করেই চেনে। এ যুগে হিটলার পোলাণ্ড আক্রমণ করার পূর্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কিছু জর্মনদের পরিয়ে দেন পোলিশ সৈন্যের উর্দী। সেই উর্দী পরে তারা 'আক্রমণ' করে একটি জর্মন বেতারকেন্দ্র—পোলিশ-জর্মন সীমান্তে। সেই 'আক্রমণে'র ও 'আক্রমণে নিহত পোলিশ সৈন্যে'র ছবি হিটলার বিশ্বময় প্রকাশ করে সপ্রমাণ করেন যে, পোলরাই প্রথম জর্মনি আক্রমণ করে!

হিটলার, হিমলার, আইখমান, হোস এঁরা তো খাস শয়তানের তুলনায় শিশু।[২] ছদ্মবেশ ধারণে এনারা এমন আর কি 'কৈশল' দেখাবেন!

বাচ্চা শয়তান ধারণ করলো দেবদূত—ফিরিশ্‌তার বেশ।

অঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে দিব্যজ্যোতি এবং নন্দনকাননমন্দারসৌরভ; তার প্রতি পদক্ষেপে ঝংকৃত হচ্ছে অপ্সরাবিনিন্দিত সঙ্গীত-নিক্কণ—সঙ্গে এসেছে বসন্তপবনের মৃদু হিল্লোল মলয়ানিল বিলোলানন্দোল্লাস!

বাচ্চা শয়তান সম্মুখীন হল সাধুর। বললে, 'তোমার তপশ্চর্যায় পরিতুষ্ট হয়ে আল্লা-তালা আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ করো।'

বলা মাত্রই সে বুরাকের বেশ ধারণ করলো।

বুরাক্‌ অনেকটা পক্ষীরাজের মত। সর্বাঙ্গ অত্যুত্তম অশ্বন্যায় এবং উভয় স্কন্ধে দুটি পক্ষ।[৩]

২ অনেকে মনে করেন এ-অধম নাৎসি দলের নির্ভেজাল দুশমন। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, যুদ্ধের গোড়ার দিকে হিটলার যে ইংরেজকে বেধড়ক চড় কষায় সেটা এ অধমের চিত্তে সাতিশয় বিমলানন্দ দিয়েছিল। আমার মতে হিটলারের সব চেয়ে মারাত্মক ভুল হয়, তিনি ফ্রান্সের পতনের পর যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করলেন না। না হয় তিনি নিলক্ষকাম হতেন। তাতেই বা কি! মহৎ কর্ম করতে গিয়ে নিষ্ফল হওয়া অপকর্মে (রুশ আক্রমণ) সফল হওয়ার চেয়ে শ্রেয়ঃ!

৩ মুসলমানী ও পার্সী রেস্তোরাঁতে নাত্যুন্নাসিক হিন্দু পাঠকও এই ছবি দেখে থাকবেন। পয়গম্বর হজরৎ মুহম্মদ সাহেব এই বুরাকে চড়েই সৃষ্টিকর্তা সন্নিধানে যান। বিরুদ্ধ পক্ষ বলেন, তিনি সশরীরে যান নি; তাঁর রূহ, অর্থাৎ আত্মা

কিন্তু বাচ্চা শয়তান ক্লাসের থিয়োরেটিকাল সর্ব আদেশ মেনে চলতে চলতে ভয়ে বেপথু-কম্প্রমান, এই সামান্য ফাঁদটা সাধু না ধরে ফেলেন!

কিন্তু ধেড়ে শয়তান দূর থেকে নিশ্চিন্ত মনে সব-কিছু দেখছে। সে বিলক্ষণ জানে, এসব আচারনিষ্ঠ জন বড় দম্ভী হয়। এরা ভাবে, সংসারের সর্বভোগ যখন ত্যাগ করেছি, তখন আর স্বর্গের সর্বসুখ আমি পাবো না কেন?

এই দম্ভই তাঁদের সর্বনাশ আনে, সে তত্ত্ব শয়তান দেখেছে, যুগ যুগ ধরে।[৪]

তপস্বী সাধু ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে চেপে বসলেন সেই ভেজাল বুরাকের স্কন্ধে।

তারপর কি হল, সেটা বর্ণনা করতে আমার বাধে। কারণ সেটাতে আছে বীভৎস রস। সংক্ষেপে বলি, সাধুর যখন জ্ঞান হল তখন তিনি বিষ্ঠাকুণ্ডে। বাচ্চা শয়তান একবার তাঁকে কাঁধে পেয়ে পেয়েছে বাগে। ক্লাসের নোট-মাফিক তাঁকে সর্বযন্ত্রণা দিয়ে অজ্ঞানাবস্থায় ফেলে দিয়ে গেল পুরীষ-গহ্বরে।

সুশীল পাঠক! তুমি বলবে, আচারনিষ্ঠ সজ্জনের এই অসদ্‌গতি হল কেন? আমিও গল্পের এই পর্যায়ে কাহিনী কীর্তনিয়া মৌলানাকে ঐ একই প্রশ্ন শুধোই।

তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, 'পুচ্ছাংশ দেখিয়াই সর্বাঙ্গ বিচার করা যায় না। অবহিত চিত্তে সর্বাঙ্গসুন্দর কাহিনীটি প্রণিধান করহ।'

এবারে ধেড়ে শয়তান বাচ্চাকে বললে, 'ঐ যে দেখা যাচ্ছে দূরে এক আলিম। এবারে বাবাজী, সাবধান!

বাচ্চা কিন্তু ভয় পাওয়ার মত কিছুই দেখলো না। পণ্ডিত বটে লোকটি, কিন্তু নামাজ রোজায় যে তাঁর মাঝে মাঝে ত্রুটি হয়ে যায়, সে তো জানা কথা। বইয়ের নেশায় তাঁর কাটে অষ্টপ্রহর। এটাকে বাগে আনতে আর কতক্ষণ?!

গিয়েছিল। অর্থাৎ বুরাক ইত্যাদি রূপকার্থে নিতে হবে।

৪ কবি রবীন্দ্রনাথ কৃচ্ছ্রসাধনে দম্ভ দেখে সর্বত্যাগী ভৈরব-শঙ্করকে উদ্দেশ করে বলছেন—

'আমাকে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।'

সর্বত্যাগী শঙ্কর হিন্দুর উপাস্য। কিন্তু তাঁর সর্বস্ব ত্যাগের অন্ধানুকরণ ও তৎসহ তাই নিয়ে দম্ভ, সেই ত্যাগের luxury, যেমন মূর্খ চেলারা করেন, কবি সেইটে এই কবিতায় বুঝিয়েছেন।

পূর্ববৎ দেবদূত-বেশ ধারণ করে বাচ্চা শয়তান পণ্ডিতের সামনে এসে দাঁড়ালো। পূর্ববৎ তাঁকে স্বর্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব জানালো।

পণ্ডিত তখন রকে বসে বদনা থেকে জল ঢেলে মুখ ধুচ্ছিলেন।

ভুললে চলবে না, ইনি পণ্ডিত। সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার প্রস্তাব শুনেই তাঁর চড়াকসে মনে পড়ে গেল ইতিপূর্বে কে কে আল্লার সমীপবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মুসা ( Moses ), ঈসা ( যীশু ), হজরৎ পয়গম্বর—ব্যস্।

তাই পণ্ডিত উত্তমরূপেই জানতেন, তিনি এমন কিছু পুণ্যশীল মহাপুরুষ 'প্যাকম্বর' নন যে আল্লা তাঁকে স্বর্গে যাবার জন্য ডেকে পাঠাবেন।

'বটে রে, ব্যাটা!' মনে মনে বললেন পণ্ডিত। 'মস্করা করার জায়গা পাও না! আজ তোমারই একদিন, আর আমারই একদিন।'

সুহাস্য-আস্যে মৌলবী বললেন, 'কী আনন্দ, কী আনন্দ! স্বর্গে যাবার জন্য তো আমি হামেহাল তৈরি। কিন্তু, ভদ্র, এ যুগে বড় ভেজাল চলছে। কি করে জানবো, তুমি সত্যই দেবদূত। শুনেছি দেবদূতেরা মুআজিজা কেরামৎ (miracle) দেখাতে পারেন। তুমি কিছু একটা দেখাতে পারলেই আমি তোমার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত।'

বাচ্চা শয়তান বলল, 'আপনি কি মিরাকল্ দেখতে চান, বলুন।' তার মনে বড় আনন্দ, অর্ধেক কেল্লা ফতেহ্ করে ফেলেছে!

পণ্ডিত বললেন, 'শুনেছি, দেবদূত অনায়াসে ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সব আকার গ্রহণ করতে পারেন। তুমি পারো?'

'নিশ্চয়!'

'তাহলে তুমি ক্ষীণ কলেবর গ্রহণ করে আমার এই বদনার নালি দিয়ে ভিতরে ঢুকতে পারো?'

বাচ্চা শয়তান উল্লাসে মনে মনে নৃত্য করছে, পণ্ডিত এর চেয়ে অন্য কঠিন কর্ম করতে ইচ্ছা জানান নি বলে। তাকে তো অনায়াসে তিনি আরবীস্তানের বিরাট মরুভূমি, কিংবা ইউফ্রাতেস নদী, কিংবা আকাশের সূর্য বা দিবাভাগে পূর্ণচন্দ্র হতে বলতে পারতেন।

পাছে তিনি মত পরিবর্তন করে ফেলেন, তাই সে তন্মুহূর্তেই পণ্ডিতের বদনার নালির ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়লো।

যেই না ঢোকা, পণ্ডিতের আর কোনো সন্দেহ রইল না ব্যাটা বদমাশ। তিনি ভালো করেই জানেন, আল্লার আপন দূত একটা বদনাতে ঢুকতে যান না। তিনি বহুবিধ শাস্ত্র পড়েছেন, তাতে এমন মিরাকল্, কেরামতের উল্লেখ নেই।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাশের পিঁড়িটা বদনার উপর চেপে তার উপর আরো ভালো করে চেপে নিজে বসে পড়লেন এবং বদনার নালিতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন একটা খেজুর। বেশ মোলায়েম ফল; টায়ে টায়ে বদনায় সেঁটে যায়।

এবং চিৎকার :—

'গিন্নী, গিন্নী! নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি উনুনটা। ব্যাটাকে আজ সেদ্ধ করে হালুয়া বানাবো। ব্যাটা আমার সঙ্গে মস্করা করতে এসেছে! শা—, হা—জা—, বা—,[৫]

হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড! বুড়ো শয়তান দূর থেকেই বুঝেছে বেপারটা সঙ্গীন।

সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত-মৌলবীর পায়ে এসে পড়লো।

বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য সন্ধি-আপোস করতে চায়।

সন্ধির শর্ত হল, শয়তান এবং তস্য গোষ্ঠী ঐ মৌলবী-পণ্ডিত গোষ্ঠীর কাউকে প্রলোভিত করতে পারবে না।

* *

প্রথম গল্পের সঙ্গে এ গল্পের কি সম্পর্ক?

যতক্ষণ অবধি পণ্ডিত-মৌলবী-মৌলানা-রাব্বী-ফাদার-দস্তুর শুদ্ধমাত্র প্র্যাকটিকাল বিষয়ে মত্ত হবেন না, ততদিন মহাপ্রলয় আসবে না।

* *

কিন্তু পাঠক, তোমার মস্তিষ্কে, হৃদয়ে যে প্রশ্ন আমারো তাই। কী দরকার সেই মহা-মহাপ্রলয় ঠেকিয়ে? যেখানে পৌঁচেছি, চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই—

২।১০।৬৫

৫ পণ্ডিত মাত্রই কি ভারত, কি আরব সর্বত্র আমাদের আজকের দিনের বিচারে বড় অশ্লীল গালাগাল দেন। 'তোমার সঙ্গে আলোচনা বন্ধ্যাগমন' আমাকে একাধিক পণ্ডিত বলেছেন। আমি তখন শান্তিপুরে নব্যন্যায় শিক্ষার 'বন্ধ্যাগমন' করছি। দোষ আমারই, তাঁদের নয়। কাইরোতেও একই অবস্থা।

## আলবের্ট শ্বোয়াইৎসার্

"আজিকে একেলা বসি শোকের প্রদোষ-অন্ধকারে,
মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা-মুখরিত ভাঙনের ধারে
তোমারে শুধাই,—আজি বাধা কি গো ঘুচিল চোখের
সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দনলোকের
আলোকে সম্মুখে তব,—উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নবছন্দে, নূতন আনন্দগানে ?"

এই কবিতাটি রচিত হবার পর প্রায় চল্লিশ বৎসর কেটে গিয়েছে। আমার চেনা-অচেনা অনেক প্রখ্যাত পুণ্যশ্লোক জন ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্নটি তাঁদের উদ্দেশে শুধাই নি। হয়তো ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর এ প্রশ্ন না শুধিয়ে থাকা গেল না।

কারণ এই মহাপুরুষ জীবনে সত্য সুন্দর শিবের যে সাধনা করেছিলেন সেটা সর্বযুগেই বিরল। এবং তার চেয়েও আশ্চর্য, তিনি একই পথে আজীবন সাধনা করেন নি।

আল্‌সেসের কাইজারবের্ক অঞ্চলে ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এঁর জন্ম।[১] সে অঞ্চল তখন জর্মন ছিল বলে তিনি জর্মন। ধর্মতত্ত্ব (প্রটেস্টান্ট বা এভানজেলিক) পড়ে তিনি চব্বিশ বছর সহপাদ্ররূপে ঈশ্বর-মানুষ-গির্জার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কিন্তু বছর তিন যেতে না যেতেই খৃষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে তাঁর মনে যে-সব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলো নিয়ে চিন্তা, গবেষণা ও সাধনা গির্জার সেবায় নিযুক্ত থেকে হয় না। তাই তিনি বিখ্যাত স্ট্রাসবুর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে কাজে যোগ দেন। এই অল্প বয়সেই তিনি যে গবেষণা করেন সেটা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং সে গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য পাণ্ডিত্য সঞ্চয় বা পাণ্ডিত্য প্রকাশ আদৌ নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কি প্রকারে খৃষ্টের বাণী ও তৎপরবর্তী খৃষ্টধর্মের প্রথম উৎপত্তিযুগের এমন একটি অর্থপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি পাওয়া যায় যেটা আজও এবং আবার নূতন করে খৃষ্টসমাজে নূতন প্রাণ, নূতন ভক্তি, চরিত্রসংগঠন ও সমাজবাস করার জন্য নূতন নীতি নির্মাণ করে দেবে।

এদেশে রামমোহন তাই করেছিলেন। অর্থাৎ উপনিষদের স্বর্ণযুগ পুনরায়

আলোকিত করতে চেয়েছিলেন।

সউদী আরবের রাজা ইব্‌ন্ সউদ যে-সম্প্রদায়ভুক্ত তার প্রতিষ্ঠাতা ওয়াহ্‌-হাবও তাই করেছিলেন।

শ্বোয়াইৎসার্ এই সব তত্ত্বচিন্তায় ধ্যানধারণায় নিযুক্তকালীন প্রচুর সময় ব্যয় করেন সঙ্গীতস্রষ্টা য়োহান্ সেবাস্টিয়ান্ বাখ্-এর উপর। এখানেও সেই নবাবিষ্কারের কথা। এটা সত্য যে, বহু বৎসর দু-চারিটি কেন্দ্র ভিন্ন অন্য সর্বত্র বাখ্ অনাদরে থাকার পর সঙ্গীতস্রষ্টা মেণ্ডেলজোন্ পুনরায় রসিকজনের দৃষ্টি বাখ-এর দিকে আকৃষ্ট করেন। এর পরেই বাখ-এর অন্যতম প্রধান ভাষ্যকার শ্বোয়াইৎসার্। গির্জার অর্গেনসঙ্গীত তাঁরই প্রচেষ্টা ও প্রচারের ফলে পুনরায় নবজীবন লাভ করে। ( অর্গেন ও অর্গেল এদেশের সঙ্গীতকে উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর প্রভাবান্বিত করে। এই নিয়েই কিঞ্চিৎ গবেষণা কিছুদিন পূর্বে এদেশে হয়। তার অন্যতম প্রশ্ন তখন ছিল, অর্গেনকে কেটে হারমোনিয়ামরূপে প্রবর্তিত করে কে জনপ্রিয় হন কি করে, এর প্রতি আকাশবাণীর এত রাগ কেন, যদিও খান আবদুল করীম খানের মত মহাপুরুষ যখন এরই সঙ্গতে গেয়েছেন? এ নিয়ে আরো আলোচনা হলে ভাল হয়। আবার কৃতজ্ঞচিত্তে শার্ঙ্গদেবের শরণ নিচ্ছি। এবং এর সঙ্গে আরেকটি নিবেদন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়কামী নবীন ভারতীয় শাগরেদকে একাধিক ইয়োরোপীয় বাখ্ নিয়ে আরম্ভ করতে বলেন। বাখ-এর রস পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজতর। এ বিষয় নিয়েও তুলনাত্মক সঙ্গীত-মহলে আলোচনা হওয়া উচিত। ) এমন কি বলা হয় শ্বোয়াইৎসার্ স্বহস্তে উত্তম অর্গেনও নির্মাণ করতে শেখেন।

উপরের দুটি সাধনা—খৃষ্টের জীবনানুসন্ধান ও বাখ্—ভিন্ন তাঁর প্রধান অনুসন্ধান ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, রাষ্ট্রচালনায়, ধর্মনীতিকে পুনরায় দৃঢ় ভূমিতে স্থাপন করা।

* *

সাধনা, অধ্যয়ন, ধ্যানধারণা, বাখ-এর ভগবদ্‌সঙ্গীত এ সমস্ত নিয়ে যখন শ্বোয়াইৎসার্ তন্ময়, যখন তাঁর খ্যাতি জর্মনির বাইরে বহুদূরে চলে গিয়েছে, তখন এই মহাত্মা হঠাৎ একদিন ত্রিশ বৎসর বয়সে, অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। কারণটি সরল অথচ সুদূরে নিহিত।

ফরাসী-কঙ্গ অঞ্চলে যে-সব অনাচার হয়ে গিয়েছে তার খেসারতি মেরামতি করতে হবে। কঙ্গর গভীরতম জঙ্গলে যে শত শত আফ্রিকাবাসী কুষ্ঠরোগে দিন দিন ক্ষয় হচ্ছে তাদের সেবা করতে হবে।

তার পূর্বে কিন্তু তা হলে তো চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয়। ঠিক সেই জিনিসটিই সমাধান করে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিশনারি ডাক্তাররূপে তিনি ফরাসী-কঙ্গর দুর্গম অরণ্যের লাঁবারেনে-অঞ্চলে গিয়ে কুষ্ঠরোগীদের জন্য হাসপাতাল খুললেন। তাঁর স্ত্রী দেশে নার্সের ট্রেনিং নিয়ে সেখানে সেবিকার কাজ গ্রহণ করলেন।

কিন্তু এই কঙ্গবাসী কুষ্ঠরোগীদের অর্থসামর্থ্য কোথায়? শ্বোয়াইৎসার্ আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ওষধি, সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি, সর্বোত্তম সহকর্মী নিয়ে চিকিৎসা করতে যান! তার জন্য অর্থ কোথায়?

এর পরের ইতিহাস দীর্ঘ। তাতে আছে আদর্শবাদ, নৈরাশ্য, অকস্মাৎ অযাচিত দান এবং সর্বোপরি শ্বোয়াইৎসারের অকুণ্ঠ বিশ্বাস: "মানুষের জীবন বিধিদত্ত রহস্যাবৃত—এর প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের ভক্তি বিস্ময় ভয় থাকা উচিত।" এই অটল বিশ্বাস নিয়ে তিনি কিছুদিন পর পর সেই দুর্গম জঙ্গল অতিক্রম করে, ইয়োরোপে এসে অত্যুৎকৃষ্ট স্বরচিত আপন অভিজ্ঞতাপূর্ণ (বিশেষ করে অন্ধকার-কঙ্গর) পুস্তক প্রকাশ করে. প্রাচীন দিনের বাখ-এর সঙ্গীত বাজিয়ে অর্থোপার্জন করতেন। প্রথম যুদ্ধের সময় তাঁর কাজে বাধা পড়ে; কারণ তিনি জাতে জর্মন হয়েও বাস করছেন ফরাসী কলনিতে—কিন্তু সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি এতই ভুবনবিখ্যাত যে দুই যুযুধান সৈন্যদলই তাঁর হাসপাতালকে এড়িয়ে বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে।

কিন্তু ১৯১৩ থেকে ১৯১৫—এই দীর্ঘ বাহান্ন বৎসরের একনিষ্ঠ সাধনা তো ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে শেষ করা যায় না। যদি কখনো সে সাধনার সিকি পরিমাণ খবরাখবর সংগ্রহ করতে পারি তবে পুনরায় চেষ্টা নেব।[২]

## মরহুম ওস্তাদ ফৈয়াজ খান

বিসমিল্লাতেই অতিশয় সবিনয় নিবেদন—আর্জ্ করে রাখি, এ অধম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মারপ্যাঁচ বিলকুল বোঝে না, ভরত থেকে আরম্ভ করে ধুর্জটিপ্রসাদ ভক্

২ শ্বোয়াইৎসার্ ভারতীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে ১৯৩৫ সালে Die Weltanschauung der indischen Denker নামক একখানা বই লেখেন। এ বই সম্বন্ধেও অনেক-কিছু বলার আছে। আমি বহু বৎসর পূর্বে পড়েছি। সেখানি ফের পেলে কিছু লেখার দুরাশা আছে।

যে সব গুণীজ্ঞানী সঙ্গীতশাস্ত্র নির্মাণ করে গেছেন তাঁদের প্রতি আমার অগাধ ভক্তি, কিন্তু তাঁদের বর্ণিত রাগরাগিণীর পুত্রকন্যা গোষ্ঠীকুটুম কে যে কোন্ মেলে পড়েন, কিছুতেই মনে রাখতে পারি নে। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে মারাত্মক তত্ত্ব, আমি পূর্ণ একটি বছর রেওয়াজ করেও তবলার গভীরে কেন—কানি পর্যন্ত পৌঁছতে না পেরে নিরাশ হয়ে সাধনাটি ছেড়ে দি, অতি দুঃখে অতি অনিচ্ছায়। অবশ্য নিতান্ত সত্যের অপলাপ হবে—তাই এটাও ক্ষীণ কণ্ঠে বলে রাখি, দ্রুতের রেওয়াজ করতে গিয়ে আমার হাতের কড়াতে আর্তরাইটিস হয়।

দ্বিতীয়ত, এ ক্ষুদ্র রচনাটি মজলিস্-রৌশন সমঝদারদের জন্য নয়, নয়, নয়। আমি খান সাহেবকে পেয়েছিলুম মানুষ হিসাবে, বন্ধু হিসাবে। তিনি আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন, সম্মোহিত করেছিলেন তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে—যদিও তিনি খুব ভালো করেই জানতেন, আমি তাঁর জয়-জয়ন্তীতে যত না রস পাই, তার চেয়ে বেশী পাই তাঁর কাফি হোলিতে।

তাই দয়া করে মেনে নিন, এ লেখাটি সাধারণ পাঁচজনের জন্য, যারা যুগর্ষি স্রষ্টাদের দৈনন্দিন জীবন, তাঁদের সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান সম্বন্ধে জানতে চায় মাত্র —কারণ তারা আমারই মত সুরকানা, তালকানা হওয়া সত্ত্বেও গান শুনতে ভালোবাসে এবং যেহেতু সঙ্গীতের গভীরে পৌঁছতে পারে না, তাই স্রষ্টাদের জীবনটা, তাঁদের চালচলন, ওঠনবৈঠন নিয়েই সন্তুষ্ট। অশ্বত্থামার সঙ্গে আমাদের তুলনা করুন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই।

১৯৩৫ সালে, এই সময়ে, আজ হতে ঠিক ত্রিশ বৎসর আগে এ-অধম বরদা শহরে চাকরি নিয়ে পৌঁছয় এবং স্টেট্ গেস্ট্ হাউসে অতিথিরূপে স্থান পায়। মহারাজা স্বর্গত সয়াজীরাওয়ের সঙ্গে দেখা শেষ হওয়া মাত্রই আমার মনে যে অদম্য বাসনা জাগলো সেটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

ওস্তাদের ওস্তাদ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রীযুত ফৈয়াজ খান বাস করেন এই বরদা শহরেই। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শুনতে না পেলে এই দুনিয়াতে জন্মালুমই বা কেন, আর এই বরদা শহরে এলুমই বা কেন? তার চেয়ে বাঁ-হাতের তেলোতে জল নিয়ে সেটাতে ডুবে আত্মহত্যা করলেই হয়!

খবর নিয়ে শুনতে পেলুম, তাঁর বাড়িতে রোজ সন্ধ্যায় মহ্‌ফিল-জলসা বসে, আর প্রায় প্রতি সকালে শাগরেদান সহ রেওয়াজ।

ইতিমধ্যে একটি অতিশয় অজানা-অচেনা বঙ্গসন্তানের সঙ্গে আলাপ হল। তার নাম বলবো না, কারণ ছেলেটি এখনো বড় লাজুক। তবে সে যদি চিঠি লিখে আপত্তি না জানায় তবে অন্য সুবাদে তার নাম প্রকাশ করে দেব। উপস্থিত

ধরে নিন, তার নাম পরিতোষ চৌধুরী। ওস্তাদের শিষ্য—অবশ্য ন'সিকে পাকা কথা বলতে হলে, ওস্তাদের বড় ভাইয়ের কাছেই সে রেওয়াজ করে বেশী। কারণ একাধিক সমঝদার আমাকে বলেছেন—আমার টুটি চেপে ধরবেন না! —যে যদিও দাদাটি নিজে সভাস্থলে গাইতেন না, তবু সঙ্গীতশাস্ত্র তিনি জানতেন ওস্তাদ ফৈয়াজের চেয়ে বেশী। তাঁরাই বলেছেন, ওস্তাদ তাই শাগরেদদের কণ্ঠ স্বর সুললিত গম্ভীর মধুর করার ভার নিতেন নিজে—অন্য 'কাজে'র জন্য ভিড়িয়ে দিতেন দাদার কাছে, বিশেষ করে অচলিত, প্রায়-লুপ্ত রাগরাগিণীতে যাদের দিল্‌চসপী- শখ্‌ অত্যধিক।

চৌধুরী তার গুরু খান সাহেবকে কি বলেছিল জানি নে, এক রবিবার সকালে তিনি সশরীরে আমার ডেরায় এসে উপস্থিত! আমি হতভম্ব। কোথায় তাঁকে বসাবো, কী আপ্যায়ন করবো, আমার মাথায় কিছুই খেলছে না। মহারাজ সয়াজীরাও এলেও আমি এতখানি গর্ব এবং নিজেকে এত অসহায় অনুভব করতুম না।

আর ওস্তাদ—বিশ্বাস করবেন না—বার বার শুধু আমার হাত দু'খানা ধরে নিজের বুকে চেপে ধরেন। তিনি আমার চেয়েও বে-এক্তেয়ার! আর বার বার দরবারী ( কানাড়া নয়! ) কায়দায় আমাকে কুর্নিশ করেন।

বহুদিন ধরে সে বেইমান পাষণ্ডকে খুঁজেছি যে আমায় দুশমনী করে তাঁকে বলেছিল, আমি গুরুঘরের ছেলে এবং মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান কেন্দ্রভূমি কাইরোতে এ্যাসন্‌ মুসলিমশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি যে স্বয়ং মহারাজা আমাকে সেখান থেকে বরদা রাজ্যে নিয়ে এসেছেন!

আমি আদৌ অস্বীকার করছি নে আমি গুরুবংশের ছেলে, এ ভারতে সে রকম শতলক্ষ আছে। কিন্তু তার চেয়ে আমার গুরুতর আপত্তি, আমার ক' পুরুষ পূর্বে কে যে শেষ-গুরু হয়ে গেছেন, সেটাও প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। এবং আমার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক আপত্তি: কাইরোতে আমি যেটুকু আরবী শিখেছি সেটি আমি আপনাকে ছ' মাসে শিখিয়ে দিতে পারি।

এ বিষয়টা আমি উল্লেখ করলুম কেন? এই যে গানের রাজার রাজা, এই ফৈয়াজ খান কী অদ্ভুত সরল ছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য। পরে আমি চিন্তা করে বুঝেছি, তিনি সঙ্গীতের সর্বোচ্চ শিখরে উঠে গিয়েছিলেন বলে সরল বিশ্বাসে ভাবতেন, সয়াজীরাও যখন আমাকে খাতির করেন তখন আমিও নিশ্চয়ই আমার শাস্ত্রের সর্বোচ্চ শিখরে। তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের জন্য তিনি যখন রাজবল্লভ হয়েছেন, তখন আমিও তাই। একই লজিক।

এর পর কতবার আমাদের দেখাশোনা হয়েছে—গানের মজলিস-মহ্‌ফিলের তো কথাই নেই। আমি প্রতিবার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি, 'দেখুন ওস্তাদ! কত রাজা আসবে যাবে, কত শম্‌স্‌ উল্‌-উলিমা ( মহামহোপাধ্যায় ) কত পাণ্ডিত্য দেখিয়ে যাবেন—এমন কি এই যে আমাদের বরদার দেওয়ান সাহেব, যাঁর হাম্বাই-তাম্বাইয়ের অন্ত নেই—তিনিও চলে যাবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেক দেওয়ান এসে উপস্থিত হবেন, কিন্তু আপনার মত লোক আবার কবে আসবে কে জানে? আমি বেঁচে থাকলে আরো রাজা দেখব, আরো দেওয়ান দেখব, কিন্তু আপনার মত কাকে পাবো?'

আর কী সুদর্শন পুরুষ ছিলেন তিনি! চেহারা রং গোঁপ সব মিলিয়ে তিনি যেন তাঁরই গানের '( বন্দে ) নন্দকুমারম্‌'—শুধু নন্দকুমার ছিলেন শ্যাম, আর ইনি গোরাচাঁদ।

আমাকে শুধোলেন, 'কবে এসে একটু গান—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'তওবা, তওবা! আপনি আসবেন এখানে! আমি যাবো যে কোনো সন্ধ্যায়, আপনার ইজাজৎ পেলেই।'

তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না।

কতবার তিনি সন্ধ্যে সাতটায় এসে ভোর পাঁচটায় উঠেছেন। আমাকে কতবার তিনি বেহেশৎ দেখিয়েছেন। তাঁর ওফাতের ( মৃত্যুর ) পর আর কেউ দেখায় নি।

বিশ্বাস করবেন না, আমি নন্দকুমার গানটি ভালোবাসি জেনে একদিন তিনি আমাকে—আবার বলছি আমার মত অতি-সাধারণ শ্রোতাকে—পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে ঐ গানটি শুনিয়েছিলেন।

কিন্তু কত লিখব! আমার স্মৃতির কত বড় অংশ জুড়ে এখনো তিনি বিরাজ করছেন!

তাই একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করে শেষ করি।

একটি বরদাগত বাঙালী মহিলার অনুরোধে আমার বাড়িতে মহ্‌ফিল বসেছে। ওস্তাদ সেদিন বড় মৌজে।

দুপুরে বরদায় ১১৪ ডিগ্রী গরম পড়েছিল। রাতদুপুরেও অসহ্য গরম, বর্ষা নামতে তখনো দু'মাস বাকি। ওস্তাদ অনেক-কিছু গাওয়ার পর শুধোলেন, 'আদেশ করুন, কি গাইব।' সেই মহিলাটি অনেক চাপাচাপির পর ক্ষীণ কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন, 'মেঘমল্লার।'

ওস্তাদ সঙ্গে সঙ্গে গান ধরলেন।

যেন তিনি তাঁর সমস্ত সাধনা, সমস্ত ঘরানা ( হয়তো ভুল হল, কারণ 'রঙিলা' ঘরানা মেঘমল্লারের প্রতি কোনো বিশেষ দিল্‌চস্‌পী ধরেন কিনা আমার জানা নেই ), সমস্ত সৃজনীশক্তি, বিধিদত্ত গুরুদত্ত সর্বকলাকৌশল সেই সঙ্গীত সম্মোহন ইন্দ্রজালে ঢেলে দিলেন। আমরা নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে যেন সর্ব লোমকূপ দিয়ে সে মাধুরী শোষণ করছি।

এমন সময় বাইরে নামল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি!

মহ্‌ফিলে হুলস্থুল পড়ে গেল। কে কি ভাবে ওস্তাদকে অভিনন্দন জানিয়েছিল, কে সুদ্ধমাত্র কুমড়ো-গড়াগড়ি দিয়েছিল, কে ওস্তাদের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মাত্র—এ সবের বর্ণনা দেওয়ার শক্তি আমার নেই। অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা তো শুধু তিনিই দিতে পারেন যাঁর লেখনীতে অলৌকিক শক্তি আছে।

অন্য দিন ওস্তাদ আমাদের অভিনন্দন, প্রশংসাবাদ, মরহাবা যতখানি ঝুঁকে ঝুঁকে সেলাম জানিয়ে গ্রহণ করতেন, আজ তিনি সেরকম করলেন না। দু-একবার সেলাম জানিয়ে গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। আমার একটু আশ্চর্য লাগলো।

অবশ্য তার পরও তিনি গেয়েছিলেন ভোর অবধি।

শেষ ভৈরবী গেয়ে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন। আমি বললুম, 'ওস্তাদ, বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ; একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বসুন।'

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর যে কী বিষণ্ণতা মুখে মেখে আমার দিকে তাকালেন তার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, সৈয়দ সাহেব, লোকে আমাকে এরকম লজ্জা দেয় কেন বলুন তো? আমি কি গান গেয়ে বৃষ্টি নামাতে পারি?'

আমি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে বললুম, 'সে জানেন আল্লা। আমি শুধু জানি, অন্তত আজ রাত্রে তিনি আপনার সম্মান রাখতে চেয়েছিলেন।'

৯।১০।৬৫

## 'পঞ্চাশ বছর ধরে করেছি সাধনা।'
## 'কটা ভাষা?' 'হা কপাল! বাঙলাই হল না।'

প্রথমেই নিবেদন জানাই, আকাশবাণীর বিরুদ্ধে আমার ব্যক্তিগত কোনো ফরিয়াদ নেই। কেন নেই, যখন চৌদ্দআনা পরিমাণ লোকের আছে এ-সব তর্কের ভিতর

আমি ঢুকতে নারাজ। বিশেষত যখন খুব ভালো করেই জানি, এই বিশ্ব-সংসারটা রিফর্ম করার গুরুভার আল্লা-তালা আমার স্কন্ধে চাপান নি। আমি শুধু আজ আকাশবাণী বাবদে একটি কাহিনী নিবেদন করবো। শোনা গল্প। সত্য না-ও হতে পারে। তবে ক্যারেকটিরিস্টিক—অর্থাৎ গল্পটি শুনেই চট করে চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশবাণীর একটি বিশেষ স্থূলাঙ্গের ছবি।

'সুনন্দ' রাগে বিতৃষ্ণায় বিকৃত কণ্ঠে তাঁর জর্নালে ইন্টারভ্যু নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যঙ্গ করেছেন। হায় রে কপাল! তিনি কখনো ইন্টারভ্যুর রাজার রাজা 'অডিশনিং' নামক খাটাশ্‌টির দাঁত ভ্যাংচানি দেখেছেন—ঈভন ফ্রম এ ভেরি লঙ সেফ ডিসটেন্স? তা হলে বুঝতেন ঠ্যালা কারে কয়। আমি স্বয়ং একাধিক 'অডিশনিং' বোর্ডের বড়কর্তা ছিলুম বেশ কিছুকাল ধরে। আমার জানার কথা! কিন্তু আমি এ সুবাদে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের একটি কাহিনী কীর্তন করবো।

একদা 'গ্রামে গ্রামে এই বার্তা রটি গেল' যবে যে, কী বড় কী ছোট তাবৎ সঙ্গীতকাররা পরীক্ষা (এরই 'ভদ্র' নাম অডিশনিং) দিয়ে তবে গান গাইবার প্রোগ্রাম পাবেন, তখন পরীক্ষকদেরই একজন আপত্তি তুলে বললেন, 'বাজারে যাঁদের গ্রামোফোন রেকর্ড রয়েছে, এবং/কিংবা স্টুডিয়ো-রেকর্ড রয়েছে তাঁদের আবার অডিশনিং-এর কি প্রয়োজন? যাঁদের নেই তাঁদের কথা আলাদা।' কিন্তু তখনকার দিনের আকাশবাণী রাজাধিরাজ স্বাধিকারমত্ত। মোকা যখন পেয়েছেন তখন ছাড়বেন কেন?

তখন ধরুন, এই লখ্‌নৌ শহরে ছোট বড় তাবৎ গাওয়াইয়া বাজানেওলারা একজোটে স্থির করলেন, তাঁরা পরীক্ষা দেবেন না। তাঁদের আপত্তি, যারা পরীক্ষা নেবে তারাই বা সঙ্গীত-জগতের কী এমন বাঘ-সিঙ্গি?

আবার বলছি, এটা গল্প।

অবস্থা যখন চরমে, তখন দুনিয়ার হালচাল বাবদে সম্পূর্ণ বেখেয়াল, লখ্‌নৌয়ের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ একদিন ভোরবেলা শিষ্য-সমাবৃত হয়ে রেওয়াজ করতে করতে হঠাৎ শুধোলেন, 'হ্যাঁ মিয়া, "আডিশনিং আডিশনিং" চারো তরফ লোগ শোরগোল মচা রহে হৈঁ, সো ক্যা ব্‌লা?' (পাঠক, আমার উর্দুজ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে কলকাতার পানওয়ালাদের দোকান থেকে—অপরাধ নিয়ো না, বরায়ে মেহেরবানী!) মোদ্দা কথা তিনি জানতে চাইলেন, চতুর্দিকে যে এই অডিশনিং অডিশনিং রব উঠেছে, সেটা আবার কি বালাই (আপদ, গেরো)।

শিষ্যেরা প্রাঞ্জল ভাষায় সে 'বালাইয়ের' জন্ম, বয়োবৃদ্ধি ও বর্তমান পরিস্থিতি

গুরুকে বুঝিয়ে দিলেন, এবং তাঁদের কেউই যে এই অপমানকর প্রতিষ্ঠানের সম্মুখীন হবেন না সেটাও জানিয়ে দিলেন।

গুরু তাজ্জব মেনে বললেন, 'সে কি? ইম্‌তিহান্‌-পরীক্ষা দিতে তোমাদের কি আপত্তি? ভেবে দেখো আমি যখন বিরাট জলসায় গান ধরি তখন কি শেষ কাতারের পানওয়ালাটা পর্যন্ত আমার পরীক্ষা আরম্ভ করে দিয়ে ভাবে না, আমি রসসৃষ্টি করতে পারবো কি না, তার দিল ভিজিয়ে নরম করতে পারবো কি না? সোজা কথায় বলতে গেলে, মহ্‌ফিলের সবাই প্রতিবারেরই আমার পরীক্ষা নেয়। হাঁ, আল্‌বত্তা, তারা না বলে পরীক্ষা নেয়, এরা বলে কয়ে নিচ্ছে। তাতে কীই বা এমন ফারাক?'

শিষ্যেরা অচল অটল।

ওস্তাদ হেসে বললেন, 'মৈঁ তো জাউংগা জরুর।'

শিষ্যরা বজ্রাহত। আর্তরব ছেড়ে পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশী, বাঙালী, হিন্দু, মুসলমান তাবৎ শাগরেদ আর্‌জ্‌ করলে, 'আমরা যাচ্ছি নে ঐ সব পাঁ—দের সামনে পরীক্ষা দিতে, আর আপনি যাবেন হুজুর?'

হুজুর বললেন, 'য়েকীনান্‌— নিশ্চয়ই।'

শিষ্যেরা তখন 'ফারাম' (form)-এর ভয় দেখালে। তাতে মেলা অভদ্র প্রশ্ন আছে। ওস্তাদ বললেন, 'সে তো আদমশুমারীর সময়ও আমার বুড়টী বাবাকে শুধিয়েছিল, তিনি অন্য কোনো পন্থায় কিছু আমদানি করেন কি না? ওসব বাদ দাও। ফারাম ভর দো।'

* *

অডিশনিং-এর দিন টাঙা চড়ে গুরু চললেন, স্টুডিয়োর দিকে। সঙ্গে মাত্র একটি চেলা। বাকি চেলারা চালাকি করে আকাশবাণীকে জানায় নি যে তাঁদের ওস্তাদ অডিশনিঙে আসছেন—ওদের শেষ ভরসা এপয়েন্টমেন্ট নেই বলে শেষ-মেষ যদি সবকুছ বরবাদ-ভণ্ডুল হয়ে যায়। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, ওস্তাদ ওদের পরীক্ষা দেবার জন্য হুকুম দেন নি। নইলে ওরা নিশ্চয়ই অমান্য করতো না।

লখ্‌নৌয়ের—কথার কথা বলছি—আকাশবাণী সেদিন কারবালার ময়দানের মত খাঁ-খাঁ করছে। এমন সময় নামলেন গুরু টাঙা থেকে।

আকাশবাণীর 'চ্যাংড়াদের' যত দোষ দিন, দিন—প্রাণভরে দিন, কিন্তু একথা কখনো বলবেন না, এরা ওস্তাদদের সম্মান করে না। আমার চোখের সামনে কত বার দেখেছি, প্রোগ্রাম-এসিসটেন্ট কুলীনস্য কুলীন ব্রাহ্মণসন্তান কী রকম মুসলমান গুরুর পায়ের কাছে কুমড়ো-গড়াগড়ি দিচ্ছে, মুসলমান পীরের ছেলে হিন্দু

গুরুর পায়ে ধরে বসে আছে। এঁদের অসম্মান করে—অবশ্য সেটা ওদেরই রুচির অভাব—ওপরওলারা যারা সঙ্গীত বাবতে দীর্ঘকর্ণ।১

ছোকরা কর্মচারীরা তো তন্মুহূর্তেই ওস্তাদকে তাদের চোখের পাতার উপর তুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো অডিশনিং রুমে—যেখানে 'পরীক্ষকরা' বেকার উকীলদের মত অনুপস্থিত মাছি মারছিলেন আর নিষ্ফল আক্রোশে আর্টিফিশেল দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় খাচ্ছিলেন।

ওস্তাদকে দেখে তাঁরা স্তম্ভিত। এ কী কাণ্ড! যে-সব আনাড়ী ছোকরা গাওয়াইয়ারা দিনকে দিন বেতারকেন্দ্রের ছারপোকা-ভর্তি বেঞ্চিতে বসে দশ রুপেয়ার প্রোগ্রামের জন্য ধন্না দেয় তারা পর্যন্ত আসে নি অডিশনিঙে—আর এই ওস্তাদের ওস্তাদ লখ্‌নৌয়ের কুৎব্‌ মিনার, তানসেনের দশমাবতার তিনি এসে গেছেন—এ যে অবিশ্বাস্য, বিলকুল গয়ের মুম্‌কিন্‌ তিলিস্‌মাৎ!

একথা অনস্বীকার্য তাঁরা ওস্তাদকে প্রচুরাধিক ইজ্জৎ দেখিয়ে ইস্‌তিক্‌বাল (অভ্যর্থনা) জানালেন, সর্বোত্তম তাকিয়াটি তাঁর পিছনে চালান দিলেন। ওস্তাদের মুখ যথারীতি পানে ভর্তি ছিল। একটি ছোকরা ছুটে গিয়ে ওগল্‌দান্‌

১ প্যারিসে একবার একটি উৎকৃষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠান কর্তাদেব নেকনজর পায় নি শুনে ভলতেয়ার সেই সঙ্গীতস্রষ্টাকে একটি চৌপদী লিখে সান্ত্বনা জানান, 'হায়, বড়লোকদের যে কানও বড় হয়' (অর্থাৎ গাধা)। আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি উদাহরণ জানি। গুণী, ওস্তাদ রবিশঙ্কর তখন দিল্লি-আকাশবাণীর সঙ্গীতাধিনায়ক। গাঁধীর জন্মদিনে সেক্রেটারি তাঁকে ডেকে হুকুম দেন, ঐ উপলক্ষে তিনি গাঁধীর তাবৎ জীবনী—দক্ষিণ-আফ্রিকা, ববদলৈ, উপবাস, সল্‌ট্‌-মার্চ—প্রতিফলিত করে যেন নূতন কিছু 'কম্পোজ' করেন। বিহ্বল, প্রায়ান্ধ উদ্ভ্রান্তদৃষ্টি রবিশঙ্কর চলেছেন করিডর দিয়ে—আমার সঙ্গে আচমকা কলিশন। সম্বিতে এসে আমাকে দেখে করুণ হাসি হেসে তাবৎ বাৎ বয়ান করে শুধোলেন, 'এ কখনো হয়?' আমি বললুম, 'আপনি যখন বাজান তখন আমার মত সঙ্গীতে আনাড়ীরও মনে হয়, আপনার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তবে কি না—হেঁ, হেঁ—সেক্রেটারি বোধ হয় বিলিতী সিমফনি, পাস্তোরাল-টাস্তোরাল বই পড়ে (শুনে নয়) আমেজ করছেন, এ দেশেই বা হবে না কেন?' রবি শুধোলেন, 'করি কি?' আমি সবিনয়ে বললুম, 'একটা বাবদে আমার মত আকাটও একটা সজেশন দিতে পারে।' 'কি কি?' 'ঐ সল্‌ট্‌-মার্চের জায়গায় এসে আপনি যন্ত্রের তারগুলোতে করকচ-নুন মাখিয়ে নেবেন।'

( পিকদান ) নিয়ে এসে সামনে ধরলো।

কেউ কিছু বলার পূর্বেই ওস্তাদ বললেন, 'সব যব্ জম্‌গয়ে তব কুছ হো জায়—' অর্থাৎ সঙ্গীতামোদীরা যখন একজোট হয়ে গিয়েছি তখন হোক কিঞ্চিৎ গাওনা-বাজনা। সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নইলে কে তাঁকে সাহস করে পরীক্ষা দিতে বলতো? ওস্তাদ সবিনয় শুধোলেন, 'কি গাইবো?' তারস্বরে চিৎকার উঠলো, 'সে কি, সে কি? গজব কী বাৎ! আপনার যা খুশী।' ( সাধারণ পরীক্ষার্থী জানে, এদের মামুলী পেশা বিৎকুটে, অচেনা রাগ বৎখৎ তালে গাইবার আদেশ দেওয়া। )

ইতিমধ্যে বেতারকেন্দ্রের যে পয়লা-নম্বরী সারেঙ্গীওয়ালা ও ওস্তাদ তবলচী অডিশনিং বয়কট করে কেন্টিনে চা খাচ্ছিল তারা টাট্টু ঘোড়ার মত ছুটে এসেছে সঙ্গত দিতে—কর্তারা এদের অভাবে যে দুটি আকাট যোগাড় করেছিলেন, তারা বহু পূর্বেই গা-ঢাকা দিয়েছে।

ওস্তাদ ধরলেন তোড়ি। আলাপের সময় প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বকুলগাছ থেকে এক একটি ফুল হয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়তে লাগলো। যখন তালে এলেন তখন যেন ফুল নিয়ে সাতলহরা মালা গাঁথতে লাগলেন, প্রিয়ার কুন্তলদামে পরাবেন বলে।

আর সমস্তক্ষণ মুখে কী খুশীর ছটা! জান্‌টা যেন ফুর্তিতে ভরপুর! ক্ষণে সারেঙ্গীওলার দিকে মুখ বাড়িয়ে তার বাজনার তারিফ করে বলেন, 'ক্যা বাৎ, ক্যা বাৎ!' ক্ষণে তবলচীর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত করে হুঙ্কার দেন, 'শাবাশ, শাবাশ, আফরীন, আফরীন!' যেন ওরাই সব জমিয়ে চলছে! ওঁর কোন কৃতিত্ব নেই!

গান থামলো। আনন্দে বিস্ময়ে সবাই এমনই স্তম্ভিত যে পুরো এক মিনিট পরে হর্ষধ্বনি ও সাধুবাদ রব উঠলো।

ইতিমধ্যে 'পরীক্ষক'দের একজন ওস্তাদের সঙ্গী ছোকরা শাকরেদের কাছ থেকে অন্য সকলের অজানতে সেই 'ফারাম্'খানা চেয়ে নিয়েছে। ঐটেতে পাস না ফেল, কোন্ হারে দক্ষিণা বেঁধে দিতে হবে সে-সব লিখে দিতে হয়।

হঠাৎ তার চোখে পড়লো, যেখানে প্রশ্ন, 'আপনি কোন্ কোন্ রাগ-রাগিণী জানেন?' তার উত্তরে লেখা মাত্র একটি শব্দ: 'তোড়ি'।

বিস্ময়! বিস্ময়!! এ কখনো হয়!!! পরশু দিনের কাঁচা গাওয়াইয়াও তো লিখতো ডজন দুই। ওস্তাদ জানেন কত শত, এ তো রসজ্ঞদেরও কল্পনার বাইরে।

অতিশয় বতরিবৎ এবং প্রচুর মাফ চেয়ে সেই 'পরীক্ষক'টি বৃদ্ধ ওস্তাদকে শুধোলেন—অল্প অবিশ্বাসের স্মিতহাসি হেসে, 'ওস্তাদ, এ কখনো হয় যে, আপনি একমাত্র তোড়ি ছাড়া আর কিছুই জানেন না ?'

সকলের মুখেই প্রসন্ন মৃদু হাস্য। সারেঙ্গী-তবলা মাথা নিচু করে জাজিমের দিকে তাকিয়ে।

যে কোনো বিদ্যাতেই তোমার যদি অভিমান থাকে তবে, পণ্ডিত পাঠক, এই বেলা তুমি কান পেতে শোনো,—আমার জীবনে তাঁর উত্তরটি নিবিড়ঘন আঁধারে ধ্রুবতারার মত জ্বলে—তিনি কি উত্তর দিলেন।

ঠণ্ডা সাস লে কর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ওস্তাদ বললেন, 'পচাস সালসে তোড়ি গা রহাহুঁ—অভী ঠিক তর্‌হ্‌সে নহী নিকলতী।'

অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর ধরে তোড়ি গাইছি। এখনও ঠিকমত বেরয় না। অন্য রাগ-রাগিণীর কথা কেন বৃথা শুধোও ॥

১৬।১০।৮৫

## ইণ্টারভ্যু

'ইণ্টারভ্যু' নামক চরম বেইজ্জতীর মস্করা যে কত নব নব রূপে প্রকাশিত হয় তার বর্ণনা আরেক দিন দেব। 'দেশে' এই মর্মে একাধিক চিঠি বেরিয়েছে, এবং আগে-ভাগে কাকে চাকরি দেওয়া হবে সেটা ঠিক করে নিয়ে যে চোট্টামীর ইণ্টারভ্যু-প্রহসন করা হয় তারও বর্ণনা এ-চিঠিগুলোতে ও আমার সতীর্থের মূল প্রবন্ধে আছে। তবে এ বাবদে শেষ কথা বলেছে আমার এক তুখোড় তালেবর ভাগিনা। ডাক্তর নোকরি করে, ঢাউস যা গাড়ি ব্যাঙ্ক দিয়েছে তার ভিতর একপক্ষে মা সহ তার তিন মাসী অন্য পক্ষে তার তিন মামী রীতিমত ব্যূহ নির্মাণ করে কাশ্মীর-শিয়ালকোট-কচ্ছের রণের[১] রণমোহড়া দিতে পারেন (বলা বাহুল্য মামীরাই হারবেন, কারণ তাঁরা এসেছেন তিন ভিন্ন ভিন্ন পরিবার থেকে)। ভাগিনাটিকে প্রায়ই ইণ্টারভ্যু নিতে হয়—অর্থাৎ সিট্‌স্ অন দি রাইট্ সাইড্ অব দি টেব্‌ল্। একদিন বেজায় উত্তেজিত হয়ে সে আমাকে একটি কর্মখালির বিজ্ঞাপন পড়ে শোনালে। তাতে ওমেদারের বয়স কত হবে, কি কি পাস থাকা

১ আমার যদ্দূর জানা, কচ্ছবাসীরা জায়গাটার নাম কচ্ছী বা গুজরাতী বা কাঠিয়াওয়াড়ীতে বানান করে কচ্ছের 'রণ'—'রান' বা 'রাণ' নয়।

চাই, এপেন্‌ডিক্‌সের দৈর্ঘ্য তার কতখানি হবে, তার পরিবারে নিদেন কটা খুন হয়ে থাকা চাই ইত্যাদি বেবাক বাৎ ছিল। ভাগিনা তারপর ভ্রূকুঞ্চিত করে খানিকক্ষণ খুঁত খুঁত করে বললে, 'খাইছে! ফোডোগেরাপ্‌টা দ্যাওনের বাৎ বেবাক ভুল্যা গ্যাছে। হুইডার তলায় লেখা থাগ্‌বো, "None need apply whose appearance does not resemble the above photograph" কি কন, মামু?' আমি আর কি বলবো? এটা করলে তো অত্যন্ত সাধুজনোচিত আচরণ হত। এর চেয়ে ঢের ঢের নাস্টি (ইচ্ছে করে ন্যাস্টি উচ্চারণে করতে, সে উচ্চারণে যেন ঘেন্নাটার খোলতাই হয় বেশী যেমন 'পিশাচ' বা 'পিচাশ' না বলে সর্বোৎকৃষ্ট হয় 'পিচেশ' বললে!) উদাহরণ আমি একটা জানি।

ফার্সীর লেকচারার নেওয়া হবে। আমাকে স্পেশালিস্ট হয়ে যেতে হবে। আমি বে-কসুর না মঞ্জুর করে দিলুম। যদিও চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে মনে হল না, এর ভিতরে কোনো নষ্টামী আছে। তবু, আমি এই 'জামাই ঠকানো'র—সুনন্দের ভাষায়—ফিস্কিরি-মস্করার হিস্সেদার হতে চাই নে। দু'দিন পর মৌলানা আজাদ ফোন করে জানতে চাইলেন, আমি যেতে আপত্তি করছি কেন? তখন বুঝলুম, উনিই আমার নাম স্পেশালিস্ট-রূপে প্রস্তাব করেছিলেন এবং এখন আমি সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হচ্ছি বলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে সেটা জানিয়ে ফরিয়াদ করেছেন—। মৌলানার পাণ্ডিত্যের প্রতি আমার অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল। তাই কাচুমাচু হয়ে এই ইন্টারভ্যু বাবদে পরীক্ষক হিসেবেই, আমার পূর্ব পূর্ব নোংরা (ন্যাস্টি!) তজরুবা-অভিজ্ঞতা জানালুম। দেখি, মৌলানা সমুচাহ্‌ ওয়াকিফ্‌-হাল। কোনো প্রকারের তর্কাতর্কি না করে বললেন, 'আপনি গেলে ওরা সোজা পথে চলবে। যদি অন্যায় আচরণ দেখেন, আমাকে জানাবেন।' ইন্টারভ্যুতে যে-সব অনাচার হয় তার কোনো বিচার নেই বলে, আমি টেবিলের কি এদিকে কি ওদিকে কোনো দিকে বসতে চাই নে (পেত্যয় না পেলে শ্রীযুত কালিদাস ভশ্চাযকে শুধোন!); কিন্তু এক্ষেত্রে মৌলানা আমার কাছ থেকে অনাচার-সংবাদ পেলে যে ওদের কান মলে দেবেন সেই ভরসায় গেলুম।

আমার সঙ্গে আরেকটি স্পেশালিস্ট ছিলেন। বাকীরা পাকা মেম্বার। তাদের একমাত্র কামনা, কাম খতম করে বাড়ি ফেরার। বিশেষত 'লেড়ে'র ব্যাপার—চাকরিটা মিম্বরুল্লা পেল না মৃদম খান পেল সে নিয়ে তাদের 'মাতাব্যাতা' হবে কেন, ছাই!

তবু ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা দু-একটি প্রশ্ন শুধোলেন। সে ভারী মজা। যেমন,

'আপনার মাদ্রাসায় ইংরিজীও পড়ানো হত ?'—কথাবার্তা অবশ্য আংরেজীতেই হচ্ছে। কারণ প্রশ্নকর্তারা ফারসী ও ফরাসীর তফাৎ জানেন না।

'জী, হ্যাঁ।'

'কি পড়েছেন ?'

'জী, রাস্‌কিনের "সিসেম অ্যাণ্ড লিলিজ", মিলটনের "এরিয়োপেজি—",

'শেকস্‌পীয়র ?'

'জী।'

'কি ?'

'হ্যামলেট।'

এবারে প্রশ্নকর্তা দারুণ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'বাব্বা, বাব্বা! বেশ, বেশ। সুপ্রস্তাব!'

তার পর তিনি সোৎসাহে আরম্ভ করলেন, হ্যামলেটের আত্ম-আর্তনাদ—সলিলকি—"To be or not to be—"। তাকিয়ে আছেন কিন্তু আমার দিকে, ওমেদারের দিকে না—আমার অপরাধ ? ইংরিজী খবরের কাগজেও একটা অত্যন্ত বেকার খবর বেরিয়েছে, আমার কি একটা বই কি যেন একটা প্রাইজ পেয়েছে, এবং স্বয়ং রাষ্ট্রপতি নাকি আমাকে প্রাইজটি দেবেন স্বহস্তে। আমাকেই ইমপ্রেস করা এখন তাঁর জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য—বলা তো যায় না, এখন থেকেই যদি রীতিমত আমাকে তোয়াজ করে ইম্‌প্রেস্ করা যায় তবে তো আমি হয়তো প্রাইজ নেবার সময় কানে কানে রাষ্ট্রপতিকে বলে দেবো, 'হুঁজুরের আণ্ডার সেক্রেটারি অনন্তভূত-পরাশরলিঙ্গম্‌কে এখন একটি প্রমোশন দেওয়া উচিতস্য উচিত!' অবশ্য সেটা সেরকম মোকা নয়। কিন্তু বলা তো যায় না—যদি হয়েই যায়। নেপোলিয়ন (আজকালকার 'জ্ঞানীরা' যাঁকে নাপোলেওঁ বলেন, যেন আমাদের মত সে-যুগের রাম-পল্টকরা খাঁটি উচ্চারণ জানতো না বলে বাংলাতে তদনুযায়ী সঠিক বানান লিখতে পারে নি!) বলেছেন, অসম্ভব বলে কিছুই নেই। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন, কখন কি ভাবে কাকে লুব্রিকেট-তেলাতে হয়!

তা সে যাই হোক, আমাকে ন'সিকে ইম্‌প্রেস করে হকচকিয়ে দেবার পর ওমেদারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাকিটা কও কি ? "Or to take arms against a sea of—" বাকিটা বলে যাও তো ?'

কালো চামড়ার তৈরী সর্বোৎকৃষ্ট স্প্রিং-সম্বলিত, পঞ্চাধিক ক্যুশন্‌বিজড়িত গভীর আরাম-কেদারার তলা থেকে তিনি হাস্যরসের তুফানে ওঠা-নাবা করতে

করতে বার বার বলেন, 'তার পর কি, go on! ইউ সেড্ ইউড্ রেড হ্যামলেট, against a sea of troubles—আরো সাহায্য করলুম তোমাকে। বাকিটা বলে যাও!' আবার তিনি সোফাতে বৃন্দাবনের রসরাজসুলভ হিন্দোল-দোলে দুলতে লাগলেন।

আমি তাজ্জব! বেচারী ওমেদার এসেছে ফার্সী ভাষার মেস্টারির চেষ্টায়। আঁ পাসাঁ, বেচারী একটুখানি ইংরিজী শিখেছিল বটে, কিন্তু সেইটেই তার ফর্, fort, সেইটেই তার pie´ce de re´sistance, সেইটেই তার বলতে গেলে, কিছুই নয়—ইংরিজীর মাধ্যমে ফার্সী পড়াতে গেলে যতখানি ইংরিজী জানবার প্রয়োজন তার চেয়েও সে বেশী জানে, সেটা তো ইতিমধ্যে তার কথাবার্তাতেই প্রমাণ হয়ে গেছে। তা সে যাকগে। ওমেদার বেচারী তো ঘেমে-নেয়ে ঢোল। আমি তখন তার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললুম, 'ওরকম নার্ভাস হবেন না। আপনি কতখানি ইংরিজী জানেন না-জানেন তার গুরুত্ব সামান্যই। ওটা আপনি ভুলে যান। এবারে চলুন ফার্সীতে। সেইটে কিন্তু আসল। ঐ যে আপনার সামনে ফার্সী বই কয়েকখানা রয়েছে তারই যে কোনো একখানা থেকে কয়েক লাইন পড়ুন—প্রথম আপন মনে চুপে চুপে, পরে আমাদের শুনিয়ে। অনুবাদ? না, না, অনুবাদ করতে হবে না। আপনার পড়ার থেকেই তো বুঝে যাবো, আপনি ফার্সী বোঝেন কি না। আর যেটা পড়বেন তার দু-একটা শব্দ আপনার জানা না থাকলে কোনো ক্ষতি নেই। সবাই কি আর সব ফার্সী শব্দ জানে? তা হলে দুনিয়াতে অভিধান লিখত কে, পড়ত কে? তা সে যাক। আমার আর কোনো প্রশ্ন-ট্রশ্ন নেই।'

এবারে ছেলেটার—হ্যাঁ, আমার ছেলের বয়েসি—মুখে শুকনো হাসি ফুটলো; একটুখানি ভর্সা পেয়েছে। সেই হ্যামলেটওলা লোকটিও আসলে কিন্তু মানুষ ভালো। পাঁচটা ক্যাশন্ দুলিয়ে ঠাঠা করে হেসে উঠলেন। বললেন—তাঁরই হ্যামলেটের স্মরণে—'জস্টিস্ ডিলেড হয় নি।. হা হা, হা হা।'

ছেলেটি সুন্দর উচ্চারণে গড় গড় করে ফার্সী পড়ে গেল। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-সন্তান; এবং পরে দেখা গেল, আরো হিন্দু ওমেদার ছিল। ফার্সীর আবহাওয়াতে আপন ঠাকুদ্দার কাছে লেখাপড়া শিখেছে। চেয়ারম্যেন বললেন, 'আপনি এখন যেতে পারেন।' ছেলেটি সবাইকে মুসলমানী কায়দায় সেলাম জানালে, আমার দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার একটু শুকনো হাসি হাসতে গিয়ে থেমে গেল—কি জানি ওটা ঠিক হবে কি না, যদি ওতে করে নম্বর কাটা যায়। আমি মনে মনে বললুম 'মারো ঝাড়ু, স্লা নোকরি ওর উসকী ইন্টারভ্যু পর্।'

উহুঁ! এটা শেষ নয়, এটা আরম্ভ মাত্র। ছেলেটির সেলামপর্ব শেষ হওয়ার পূর্বে আমার সঙ্গের দ্বিতীয় স্পেশালিস্টটি বললেন, 'একটু বসুন'—এবং সঙ্গে সঙ্গে আপন পকেট থেকে একটি চিরকুট বের করে তার হাতে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন।'

হায় বেচারা ক্যাণ্ডিডেট! ভেবেছিল, তার গর্দভযন্ত্রনা শেষ হল। এখন এ আবার কি ফাঁসি! বেচারী পর্চাখানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। স্পেশালিস্ট দশ সেকেণ্ড অন্তর অন্তর গুঁতোচ্ছেন, 'পড়ুন। পড়ছেন না কেন?' ছেলেটি হোঁচট ঠোক্কর খেতে খেতে খানিকটে পড়লো। স্পেশালিস্ট বললেন, 'অনুবাদ করুন।' বাম পাঁঠা! পড়ার কায়দা থেকেই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পাঠ্যবস্তু তার এলেমের বাইরে, তবে স্যাডিস্টের মত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?

ছেলেটা নড়বড় পায়ে বেরিয়ে গেল।

আমি পর্চাটির জন্য স্পেশালিস্টের দিকে হাত বাড়ালুম। তিনি 'কুছ নহী, কুছ নহী' বলে সেটি পকেটে পুরে নিলেন। দুস্‌রা ক্যাণ্ডিডেট এল। এবারে হ্যামলেটের বদলে গ্রে'র কবিতা। সর্বশেষে আবার ঐ অভিনয় সেই পর্চা নিয়ে। আমি স্পেশালিস্টের উদ্দেশে মনে মনে বললুম, 'তুমি ব্যাটা খোট্টা মুসলমান, আম্মো হালা বাঙাল পাঁতি ল্যাড়ে! দেখাচ্ছি তোমাকে।' এবারে ক্যাণ্ডিডেট পর্চাটি যেই ফেরত দিতে যাচ্ছে অমনি, তৈরী ছিলুম বলে, আমি সেটা নিয়ে নিলুম। ওমা! যত পড়ি, আগা-পাস্তালা ঘুরিয়ে দেখি, ততই কোনো মানে ওৎরায় না। ইতিমধ্যে আরেক ওমেদার এসে গেছে এবং চসার না পোণ্ড কি যেন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমার দৃষ্টি ঐ পর্চাটির দিকে নিবদ্ধ।

ইয়াল্লা! অব্ সমঝ্‌লন বা। যে দু'লাইন কবিতা ছিল সেটা অনেকটা আমাদের।

হরির উপরে হরি
হরি বসে তায়
হরিকে দেখিয়া হরি
হরিতে লুকায়!

'হরি' শব্দের কটা মানে হয়, আমি সত্যই জানি নে—কান ছুঁয়ে বলছি। কিন্তু ছিঃ! কারো বাংলা জ্ঞানের পরীক্ষা যদি নিতান্তই নিতে হয় তবে এই ধরনের 'জামাই-ঠকানো' কবিতাই কি ন্যায্যতম, প্রশস্ততম?!

কিন্তু এহ বাহ্য।

পরে, অন্তত আমি বুঝতে পারলুম দই খাচ্ছেন কোন্ রমাকান্ত আর বিকার

হচ্ছে কোন্ গোবদ্দনের ?

দু-একটি পাকা মেম্বরও হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা কি। লেখা-পড়ায় এক-একটি আস্ত বিদ্যেসাগর বলেই ওঁদের নাসিকায় থাকে সারমেয়বিনিন্দিত গন্ধসন্ধানী অন্ধিসন্ধি।

ক্যাণ্ডিডেটের পরে ক্যাণ্ডিডেট—কেউ ভালো, কেউ মন্দ, কেউ মাঝারি, সংসারে যা হয়—ইণ্টারভ্যু স্বয়ংবরে আমাদের মত ইন্দুমতীর সামনে স্বপ্রকাশ হলেন। কিন্তু সবাই মার খেলেন, ঐ পর্চাটুকুর সামনে, ঐ চিরকুটটি সব্বাইকার ওয়াটারলু।

ইতিমধ্যে কী আশ্চর্য, কী তিলিস্মাৎ—একটি ওমেদার পর্চাটি পাওয়া মাত্রই সেটি গড়গড়িয়ে পড়ে গেল, আদ্যন্ত। যেন তার প্রিয়ার আড়াইশ' নম্বরী প্রেমপত্র।

* *

ইণ্টারভ্যু শেষে লাঞ্চ। সরকারী লাঞ্চকে আমি বলি লাঞ্ছনা। অবশ্য সর্বোচ্চ মহলে নয়। সেখানে লাঞ্চের অজুহাতে আপনার জন্য পেলেটে করে রোলস্-রয়েস গাড়ি আসতে পারে তন্বঙ্গী পরী-পয়্করী চালিতা। ড্রাইভারিণীটি ফাউ, থ্রোন্ ইন্ ফর গুড মেজার।

পালাবার চেষ্টা করার সময় ধরা পড়লুম সেই পঞ্চ-ক্যুশন-মর্দন মহাজনের হাতে। বললেন, 'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ, আপনাদের ঐ স্পেশালিস্টটি আপন ওমেদারকে একটু ভালো করে রিহার্সেল করালেন না কেন ? ও যদি সাত বার ঢোঁক গিলতো, এগারো বার হোঁচট খেয়ে খেয়ে চিরকুটটির কবিতা পড়তো, তবে হয় তো, আমাদেরও বিশ্বাস জন্মাতো, সে ঐ কবিতাটি ইতিপূর্বে কখনো দেখে নি।'

## অর্থং অর্থং

একটা 'ফরেন'-ওলার কথাই বলি।

ইণ্টারভ্যুতে আমিও ছিলুম। সেই ছাব্বিশ বছরের 'ফরেন'—বাট্ ড্যাম কালা আদমী ছোকরাটা তার বাপের বয়সী ওমেদার অধ্যাপককে যা বেহায়া প্রশ্ন শুধোতে লাগলো তাতে আমি স্তম্ভিত। কারণ সেই অধ্যাপকের কিছু কিছু লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। এ যুগে আর কটা হিন্দু ফার্সী শিখে ভারতবর্ষের সাতশ,' বছরের ইতিহাস অধ্যয়ন করে ? ইনি তাঁদেরই একজন। অথচ ওই

'ফরেন'-পন্টক ফার্সীর এক বর্ণও জানে না। শুধু ইতিহাসের অধ্যাপক—ঠিক ইতিহাসও নয়, ইণ্ডলজির—বলেই গুণধর বোর্ডে এসেছেন, এবং যে-মোগল ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি নিরেট আকাট, সেই সম্বন্ধে চোখাচোখা প্রশ্নবাণ ঝাড়ছেন। সেগুলো তৈরি করে নিয়ে এসেছেন গতকাল লাইব্রেরি থেকে, দু'তিনখানা মোগল ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে—প্রধান উদ্দেশ্য, বাদবাকী মেম্বরদের তাক্ লাগিয়ে দেওয়া। সে সব মেম্বররা এসেছেন অপরাপর য়ুনি থেকে। ফলে সে সব য়ুনিতে তিনি একস্‌টেন্‌শন লেকচারে নিমন্ত্রিত হবেন, এগ্‌জামিনার হবেন, বহুবিধ কনফারেন্সে নিমন্ত্রিত হবেন, তাঁর প্রিয় ছাত্রের অথাদ্য থীসিসে তাঁরা এক্‌স্‌টারনেল পরীক্ষক হিসেবে ডিটো মারবেন, তিন্নো এ-বাগে তাই করবেন, গয়রহ, ইত্যাদি, এট্‌সেটরা। কি কি প্রশ্ন শুধিয়েছিলেন, আমার ঠিক মনে নেই, তবে রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্ আব্‌স্যুর্ডুমে পরিণত করতে যদি অনুমতি দেন তবে কাল্পনিক দু-একটি পেশ করতে পারি: 'আকবর যখন আহমদাবাদ আক্রমণ করছিলেন তখন সাবরমতী বেয়ে হাওয়া পুব না দক্ষিণ থেকে বইছিল ?' 'সিলেটের শাহজলাল মসজিদে পূর্বে যে জালালী কবুতর ছিল তারা এখন চলে যাচ্ছে কোথায় ?'

এবং এমনই খাজা ইংরিজী উচ্চারণে যে আমি একবার দু'প্রশ্নের ফাঁকে তাঁকে কানে কানে বললুম, 'I am glad, Oxbridge has not been able to damage your original pronunciation."

আমি সবিনয়ে নিবেদন করছি, আমি সে অধ্যাপককে বাঁচাতে পারি নি। সেই প্রাচীন গল্প তা হলে আবার বলি। বার্নার্ড শ'র একটি নাট্য করে থিয়েটার থেকে গম্ গম্ তুলে ধরেছে, দ্রষ্টাদের সপ্রশংস চিৎকার, 'নাট্যলেখককে স্টেজে বেরুতে বলো, আমরা তাঁকে দেখব।' শ' এলেন। মিনিট পাঁচ ধরে চললো তুমুল হর্ষরব, করতালি, যাবতীয়। সবাই যখন শান্ত হলেন, এবং শ' তাঁর ধন্যবাদ জানাবার জন্য মুখ খুলতে যাবেন এমন সময় সর্বশেষ সস্তা গ্যালারি থেকে একটা আওয়াজ এল 'বু বু বু বু!' শ' ওই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্রাদার, ঠিক বলেছ; এ নাট্যটা রদ্দী। কিন্তু তোমাতে-আমাতে, মাত্র দুজনাতে, এই শত শত লোকের পাগলামি ঠেকাই কি করে!'

* *

তার পরই আমি বিদেশে চলে যাই। না, স্যর! Sorry, কোনো সোভিয়েট, মার্কিন, বার্লিন ডেলিগেশনে নয়। তা সে যাক্। ফিরে এসে বোম্বায়ে আমার বন্ধু প্রসাদদাস মানিকলাল শুক্লের বাড়িতে উঠলুম। ওই অক্‌সব্রিজওলার কথা কি

করে উঠলো জানি নে, কারণ লেখাপড়ির ব্যাপারে আমরা charleton-ধাপ্পা-বাজদের নিয়ে কখনো আলোচনা করতুম না।

শুক্র বললে, 'সে বড় মজার ব্যাপার। তোমার ওই ব্রাদার চৌধুরী শনৈঃ শনৈঃ উঠতে লাগলেন খ্যাতির শিখর পানে। আজ এই কলেজে, কাল অন্য য়ুনিভার্সিটিতে—আস্ত একটা হনুমানের মত চড় চড় করে পদোন্নতির অশথগাছের মগ-ডালে, বয়েস পঁইত্রিশ পেরুতে না পেরুতে। ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব উম্‌দা গ্যোবেল্‌সী শানাই তাঁর গুণের রাগ-রাগিণী বাজাতে বাজাতে এটাও জাহির করেছে যে, ওই চৌধুরী স্বচেষ্টায় ফরাসী, জর্মন, রুশ গয়রহ ভাষাও আয়ত্ত করে ফেলেছেন।'

শুক্র ফিক করে একটুখানি হেসে বললে, 'সে বড় মজার। তোমার ওই চৌধুরীর তখন এমনই আস্পদ্দা বেড়ে গেছে যে, সে ছাপিয়ে দিলে বুর্নফের একটি অচলিত ছোট লেখার অনুবাদ ইংরিজীতে—চটি বই, ব্রশ্যুর বলতে পারো। আসলে সে সেটা করেছিলো এক আনাড়ি ছোকরার সাহায্যে, যার ফরাসী জ্ঞান ছিল অত্যন্ত কাঁচা—কিন্তু ছোকরা ধাপ্পা মারতে জানতো চৌধুরীর চেয়েও দুই বাঁও বেশী।

শুক্র বললে, 'ওঃ। সে বই নিয়ে এ দেশে কী তুলকালাম, ফাঁ ফাঁর! অবশ্য তার চোদ্দ আনার উৎপত্তি চৌধুরীর গ্যোবেল্‌সী কলসী থেকে। এবং এখনো এ দেশের লোকের বিশ্বাস এ রকম অনুবাদ হয় না। মাত্র দু'একটি প্রাণী জানে যে, কি করে যেন ওই অনুবাদ প্যারিসে পৌঁছে গেলে তাদের এক পত্রিকায় বেরোয়—"The originality of the translator has come out with extraordinary success in those passages where he has failed to understand the original!" অবশ্য তাতে করে চৌধুরীর রত্তিভর লোকসান হয় নি, কারণ এই ফরাসীতে লেখা সমালোচনা—তাও প্রকাশিত হয়েছে পণ্ডিতীয়া কাগজে—এ দেশে পড়ে কটা লোক! তা সে যাক।

'ইতিমধ্যে এ-দেশে একটি পোলিটিশিয়ানের প্রাণ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো জননী ভারতের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য। আসলে তুমি তো জানো, এ সব নির্জলা ব্লাফ্। ভদ্রলোক চান, তিনি যেন 'কল্‌চর'-জগতেও সম্মানিত হোন। অবশ্য পরের হাত দিয়ে তামাক খেয়ে। সেই "পরে"রও অভাব হল না। এ অঞ্চলের শেঠীয়াদের টাকের ঠিক জায়গায় হাত বুলোতে পারলে গৌরীশঙ্করের শিখরে মরূদ্যান নির্মাণের জন্যও পিল পিল করে টাকা বেরিয়ে আসে।

তারপর শ্যানায় শ্যানায়[১] কুলোকুলি। তোমার এই প্যারা চৌধুরী—'

আমি বললুম, 'শট্ অপ্।'

'আহা, চটো কেন? তারপর সাড়ম্বর স্থাপিত হল, "জম্বুদ্বীপ-সমন্বিতাসমুদ্র—" যাক্‌গে যাক্, আমার নামটা ঠিক মনে নেই, ওই "কল্‌চর" "মল্‌চর" নিয়ে কি যেন একটা প্রতিষ্ঠান, আর চৌধুরী হলেন তার "সর্বাধিকারী" "মহাস্থবির" না কি যেন একটা।...কিছুদিন পর—ইতিমধ্যে অবশ্য প্ল্যান মাফিক দু-দশখানা ভালো-মন্দ-মাঝারি "কলচরল" বই "জম্বুদ্বীপসমন্বিত—" দুচ্‌ছাই আবার ভুলে গেলুম প্রতিষ্ঠানের নামটা—বই বেরিয়েছে। সর্বাধিকারী চৌধুরী প্রতিষ্ঠানের কর্তাকে বোঝালেন—

(ক) ঋগ্বেদের যে সব অনুবাদ গত এবং এই শতকে ইংরিজী-বাংলা-ফরাসী-জর্মনে বেরিয়েছে, সেগুলো ইতিমধ্যে বিলকুল বেকার ঔট অব্ ডেট হয়ে গিয়েছে, (খ) একটি নূতন অনুবাদ দরকার, (গ) সেটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে হলে বড় বড় পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে হবে, (ঘ) এবং তাঁদের দক্ষিণা এবং ছাপা বাবদ লাগবে আশী হাজার টাকা।

আমি তাজ্জব মেনে বললুম, 'কি বললে, আশী হাজার টাকা? বলো কি!'

'বিলক্ষণ! আশী হাজার টাকা! ব্যাপারটা হল গিয়ে, ওই যে প্রতিষ্ঠাতা পলিটিশিয়ান কল্‌চরড্ হতে চান, তিনি শেয়ারবাজার, টেভয় টিন্ থেকে ওমরা তুলো, শিবরাজপুর মেঙ্গানীজ সব বোঝেন, কিন্তু—কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতদের তেজীমন্দী বাবদে বিলকুল না-ওয়াকিফহাল। ঢেলে দিলেন টাকাটা। তার পর বেরুতে লাগলো কিস্তিতে কিস্তিতে বেদের নবীন ইংরিজী অনুবাদ। যে রকম আমাদের হরিবাবুর বাংলা কোষ বেরিয়েছিল। উত্তম প্রস্তাব! কিন্তু, ব্রাদার, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি এই দগ্ধ সংসারে কোথায়? হঠাৎ পুণার এক পণ্ডিত আমাদের কল্‌চর-প্রতিষ্ঠাতার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে অনুবাদের খুনিয়া খুনিয়া সব ভুল দেখাতে লাগলেন। যেমন মনে করো—কথার কথা কইচি, আমি তো ওখানে ছিলুম না—"রবিকর" অনুবাদে হয়েছেন, "সূর্য যে খাজনা দেন" কিংবা "রাজকর" অনুবাদে হয়েছেন, "রাজা যে রশ্মি দেন"!...এ রকম বিদকুটে বরবাদ অনুবাদ কেন হল কিছুই বোঝা গেল না। সামান্যতম বৈদিক ভাষা যে জানে সেও তো এরকম ভুল করবে না। হ্যাঁ, আলবৎ, 'ক্রন্দসী' 'রোদসী' ধরনের অচলিত শব্দ

১ 'চলন্তিকা' বলেন 'সজ্ঞান' থেকে সেয়ানা। বড়বাবু বলেন, শ্যেনদৃষ্টি রাখে যে জন তার থেকে শেয়ানা, শ্যানা।

নিয়ে সাতিশয় সাধু মতান্তর হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের আকাট, বর্বর—? রহস্যটা তবে কি ?'

আমিও সায় দিয়ে বললুম, 'রহস্যটা তবে কি ?'

'ওই কল্‌চরকামী প্রতিষ্ঠাতা বেদবেদান্ত বাবদে বেকুব হতে পারেন, কিন্তু তিনি "ইঁদুরের গন্ধ পান"—শয়তানীর শ্বাস পান। নইলে সাদা-কালো-গেরুয়া বাজার কনট্রোল করছেন বৃথাই। তিন দিন যেতে না যেতে স্বয়ং চৌধুরীই এসে যা বললেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কি ভারতীয়, কি ফরাসী, কি ইংরেজ, কি জর্মন কোনো পণ্ডিতকেই অনুবাদ-কর্মে নিযুক্ত করেন নি। তাবৎ কর্ম করিয়াছেন একটি দুঃস্থা জর্মন রমণীকে দিয়ে। সে বেচারী সংস্কৃতেরও এক বর্ণ জানে না—বেদের ভাষা মনোজের ভাষায় কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে! সে স্রেফ জর্মন পণ্ডিত গেল্টনার-কৃত কয়েক বৎসর পূর্বে প্রকাশিত বেদের অনবদ্য জর্মন অনুবাদ ইংরিজীতে অনুবাদ করে গেছে। মেয়েটি ভালো জর্মন জানে বটে, কিন্তু তার ইংরিজী কাঁচা। কিন্তু সেইটেই মূলতত্ত্ব নয়। আসল বিপদ হয়েছে, বেদের অনেক বস্তু অস্পষ্ট, রহস্যময়, দ্ব্যর্থ কেন—বহু অর্থসূচক। সেগুলো জর্মন পণ্ডিত গেল্টনারও করেছেন সন্তর্পণে, আবছা-আবছা রেখে—যেন সান্ধ্যভাষায়। এ নারী তাই তার অনুবাদে—আদৌ সংস্কৃত জানে না বলে—রবিকর, রাজকর, নরকর, হাতীর কর (কথার কথা কইচি!) গুবলেট করে বসেছে। তখন পরিষ্কার হল রহস্যটা।

তস্য বিগলিতার্থ, চৌধুরী দশ-বিশজন পণ্ডিত লাগিয়ে, তাদের ন্যায্য দক্ষিণা দিয়ে অনুবাদ করান নি। মেমসাহেবকে দিয়ে কম্মটি করিয়ে নিয়েছেন।

আরো অর্থাৎ এবং সেখানেই অর্থ, মেমসাহেবকে তিনি দিয়েছেন এক হাজার টাকা, ছাপার খরচা বাদ দিয়ে তিনি পকেটস্থ করেছেন সত্তর হাজার টাকা। হল ?'

* *

চৌধুরী এখন ফট্‌কা-বাজারে ভালো পয়সা কামায়॥

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

এই 'দেশ' পত্রিকাতেই আমার এক সতীর্থ কিছুদিন পূর্বে 'ফরেন ডিগ্রী'-ধারীর দম্ভের প্রতি ক্ষণতরে ঈষৎ ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মর্মঘাতী আপন মূল

বক্তব্যে চলে যান। হয়তো সে-স্থলে এ বিষয় নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করার অবকাশ ছিল না, অর্থাৎ তিনি শেখ চিল্লীর মত মূল বক্তব্যের লাভ এবং ঈষৎ অবান্তর বক্তব্যের ফাউ দুটোই হারাতে চান নি।

ওঃ! গল্পটি বোধ হয় আপনি জানেন না, কারণ শেখ চিল্লী জাতে খোট্টা এবং বাঙলা দেশে কখনো পদার্পণ করেন নি। যদ্যপি শ্রীযুক্তা সীতা এবং শান্তা এবং খুব সম্ভব তাঁদের অগ্রজও মিয়া শেখ চিল্লীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন উপকথার মারফতে—স্বর্গত রামানন্দের পরিবার যে খোট্টাই দেশে বাল্যকাল কাটিয়েছেন সে কথা আগে জানা না থাকলেও তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধাদি পড়ে বহু বাঙালীই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু এস্থলে আমার যে গল্পটি স্মরণে এল সেটি বোধ হয় তাঁরা ইতিপূর্বে সবিস্তর বয়ান করে আমাকে পরবর্তী যুগের 'চোর' প্রতিপন্ন করার সুব্যবস্থা করে যান নি—এই ভরসাতেই সেটি উল্লেখ করছি। করে গেলেও ঝুটমুট 'ঝেপবার' ভয় নেই—কারণ গল্পটি ক্লাসিক পর্যায়ের, অর্থাৎ এর বিষয়বস্তু সর্বসাধারণের কার্যকলাপে নিত্য নিত্য সপ্রকাশ হয় বলে এটি নিত্যদিনের ব্যবহার্য গল্প।

মা-সরস্বতীর বর পাওয়ার পূর্বে কালিদাস যে আক্কেল-বুদ্ধি ধারণ করতেন, হিন্দী-উর্দুভাষীদের শেখ চিল্লীও সেই রকম আস্ত একটি 'পল্টক' ( 'কণ্টক' থেকে 'কাঁটা'—সেই সূত্রানুযায়ী 'পল্টক' থেকে কি উৎপন্ন হয় সে তত্ত্ব সুচতুর পাঠককে বুঝিয়ে বলতে হবে না ; আসলে এই গূঢ় তত্ত্বটি আবিষ্কার করার ফলেই শ্রীযুত সুনীতি চট্টো অস্মদ্দেশীয় শব্দতাত্ত্বিকদের পঙ্‌ক্তিতে আপন তখ্‌ৎ-ই-তাউসে গ্যাঁট হয়ে বসবার হকক কব্জা করেন )।

সেই শেখ চিল্লীকে তাঁর মা হাতে একটি বোতল আর পয়সা দিয়ে বাজার থেকে তেল কিনে আনবার আদেশ দিলেন এবং পুত্রের পেটে কি পরিমাণ এলেম গজগজ করছে সেটা জানতেন বলে পই পই করে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আসল তেলটা পাওয়ার পর সে যেন ফাউ আনতে না ভোলে। শেখ চিল্লী এক গাল হেসে বললেন, 'তা-ও কখনো হয়!'

আমি জানি, আজকের দিনের পাঠক কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না যে, কোনো জিনিসের দাম বাজারে কস্মিনকালে কখনো কমে। কিন্তু করতেই হবে, এই হালের সুকুমার রায়ের যুগেও 'বাড়তি' 'কমতি' ছিল—এমন কি বয়সের বেলাও। আমি যে যুগের বয়ান দিচ্ছি সেটা তারও বহু পূর্বেকার। তাই মিয়া চিল্লীর আম্মাজানের অজানতেই বাজারে তেলের দর হঠাৎ কমে গিয়েছিল। হয়তো কোনো 'রাধা'কে নাচাবার জন্য নবাব সাহেবের 'ন মন তেলে'র প্রয়োজন

হওয়াতে তিনিও শায়েস্তা খানের মত তেলের দর সস্তায় বেঁধে দিয়ে বাজার শায়েস্তা করেছিলেন। সেটা এ যুগের 'সন্দেশ' শায়েস্তা করতে গিয়ে স্বহস্তে স্বপৃষ্ঠে ভূতের কিল খাওয়া নয়।

তা সে যা-ই হোক্, তেল সস্তা হয়ে যাওয়ার দরুন মূল তেলেই বোতল কানায় কানায় ভরে গেল। শেখ চিল্লীর ঘটে বুদ্ধি কম ছিল সত্য কিন্তু তার স্মৃতিশক্তিটি আমাদের 'দাদখানী তেল, মসুরির বেল'-এর মত ছিল না! তিনি দোকানীকে বললেন, 'ফাউ?'

দোকানী বললে, 'কী আপদ, বোতলে জায়গা কোথায়?'

শেখ বললেন, 'বট্যে! চালাকি পেয়েছ? এই তো জায়গা।' বলে তিনি বোতলটি উপুড় করে, বোতলের তলার গর্তটি দেখিয়ে দিলেন। মেরি মাগডেলেন যে খৃষ্টের পদদ্বয় তৈলাক্ত করেছিলেন সেটাকেও হার মানালেন শেখ—অবশ্য স্বহস্তে। দোকানী মুচকি হেসে সেই গর্তটি এক কাঁচ্চা তেল নিয়ে ভরে দিয়ে শেখের ফাউয়ের খাঁইও ভরে দিল।

বোতলটি অতি সন্তর্পণে 'স্টাটুস কুয়ো' বজায় রেখে ধরে ধরে শেখ বাড়ি পৌঁছে মাকে বললেন, 'এই নাও আম্মা, তোমার ফাউ।' তারপর বোতলটি উল্টে খাড়া করে ধরে বললেন, 'আর ভিতরে তোমার আসল।'

আম্মা-জানের পদদ্বয় অবশ্য খৃষ্টের তুলনায় অল্পই অভিষিক্ত হল!

* *

দেশ থেকে যে বোতলটি নিয়ে এ-দেশের ছাত্র বিদেশে বিদ্যার তেল—না ভুল বললুম, ডিগ্রীর তেল—কিনতে যায়, সেটি নিয়ে সে কোন শেখ চিল্লীর মত কি বেসাতি করে সে তত্ত্বটি অনেকেরই জানা নেই। না জানারই কথা, কারণ ইংরেজ আমলের পূর্বে এ-দেশে কখনো এই 'ফরেন' ভূতের উপদ্রব হয় নি। মুসলমান আমলে কি হয়েছিল সেটা পরের কথা। তার পূর্বে কোনো ভারতসন্তান 'ফরেন' ডিগ্রীর জন্য কামচাটকা থেকে কাসাব্লাঙ্কা কোথাও গিয়েছে বলে শুনি নি। তবে জাতক পড়লে পাই, ঐ যুগে তক্ষশিলা ছিল বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার কেন্দ্র এবং বারাণসী ছিল সনাতন ধর্ম-জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার জন্য সর্বপ্রসিদ্ধ তীর্থ। তাই জাতকের একাধিক গল্পে পাই, বৌদ্ধ কিংবা বৌদ্ধভাবাপন্ন বারাণসী গৃহী পুত্রকে তক্ষশিলায় বিদ্যার্জনের জন্য পাঠাতেন। তদ্রূপ কাশী সর্বকালেই সনাতন ধর্ম ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি থাকা সত্ত্বেও হয়তো বিক্রমাদিত্যের যুগে সারা ভারতের কোনো কোনো অঞ্চল থেকে কিছু ছাত্র উজ্জয়িনীতে বিদ্যাভ্যাস করতে গিয়েছে।

মুসলমান আমলে রাজকার্য তথা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ফার্সীতে হত। (বৌদ্ধধর্ম লোপ পাওয়ার ফলে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লোপ পায়; কিন্তু কাশী ও পরবর্তী যুগে বৃন্দাবনে হিন্দুশাস্ত্র চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল এবং এখনো আছে।) কিন্তু ফার্সী যদিও পারস্যের ভাষা, তবু এ-দেশের কোনো ফার্সী শিক্ষার্থী তেহ্‌রান বা মেশেদ্ শহরে ফার্সী শিখতে যেত না। ধর্মচর্চার জন্য ছাত্রেরা পড়তো আরবী, কিন্তু তারাও মক্কা, মদিনা বা কাইরোতে গিয়ে 'ফরেন' ডিগ্রী নিয়ে আসতো না। অবশ্য কোনো কোনো ছাত্র এ-দেশে পাঠ সমাপন করে মক্কায় গিয়ে হজ্ করার সময় কাবার চতুর্দিকে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেগুলো শুনে নিত। অধীনের মাতামহ তাই করেছিলেন।

বিদেশে না যাওয়ার কারণ এ-দেশেই আরবী-ফার্সীর মাধ্যমে উত্তম জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা ছিল। এবং পাঠান-মোগল যুগেও কাবুল, কান্দাহার বা মজার-ই-শরীফে কোনো বড় কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি—উঠেছিল দেওবন্দ, রামপুর, সুরট অঞ্চলের রাঁদেরে, হায়দ্রাবাদে, ঢাকায়, সিলেটে। বস্তুত কাবুল অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র মাত্রই আমানুল্লার আমল পর্যন্ত দিল্লী অঞ্চলেই পড়াশুনো করতে আসত। আমি কাবুলে যাই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। তখন যে কয়টি আরবী-ফার্সীজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে আমার আলাপ-পরিচয় হয় তাঁরা সকলেই উর্দু ও জানতেন, কারণ সকলেই বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন ভারতে। ঠিক যে রকম বৌদ্ধ যুগে চীনা তথা অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শ্রমণরা এদেশে শিক্ষালাভের জন্য আসতেন, এখনো অল্পবিস্তর আসেন।

এমন কি, যে কাইরোর আজহর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় এক হাজার পনরো বছর ধরে ধীরে ধীরে মুসলিম শাস্ত্রচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ববৃহৎ সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী কেন্দ্ররূপে স্বীকৃত হয়েছে, সেখানেও ভারত থেকে কখনো খুব বেশী ছাত্র যায় নি। আমি যখন (১৯৩০।৩৫) কাইরোতে ছিলুম তখন পাক (বর্তমান) ভারত উভয়ে মিলিয়েও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনারও বেশী ছাত্র ছিল না। পক্ষান্তরে, সেখানে আরবী দর্শনের যে পাঠ্যপুস্তক সম্মানিত ছিল, সেটি জনৈক ভারতীয় মৌলানা দ্বারা লিখিত।

[এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে উল্লেখ করি, সাত শ বছর আরবী-ফার্সীর কঠিন একনিষ্ঠ সাধনা করে ভারতীয় মৌলবীরা জ্ঞানবিজ্ঞান ধর্মচর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সত্য, কিন্তু আরবী দূরে থাক, ফার্সী সাহিত্যেও কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। তার এক মাত্র কারণ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্যের কুৎব্‌মিনার গড়া অসম্ভব। তাই যখন দেখি, মাত্র এক শ বছর ইংরেজী

চর্চার পর এদেশে, কেউ কেউ সে সাহিত্যে ঢিপি তৈরি করে ভাবছেন সেটি মিনার, তখন বড়ই বিস্ময় বোধ হয়। তাঁরা কি সত্যই ভাবেন, সেই সাত শ বছরের তাবৎ গুণীজ্ঞানীরা—এবং তাঁরা রাজার্থানুকূল্য পেয়েছিলেন চেরাপুঞ্জির বর্ষণের চেয়েও বেশী—এঁদের তুলনায় অতিশয় কুক্কুটমস্তিষ্কধারী ছিলেন? তাই যখন দেখি র্যাবোর বদলে হ্র্যাবো—তা হলে 'rare' অর্থাৎ 'বিরল' হবে 'হ্রাহ্র', France হবে 'ফ্রহাঁস এবং যেখানে 'r' অক্ষরের সঙ্গে উ-কার যুক্ত, যেমন 'প্রুস্ত', সেখানে গতি কি? কারণ 'প'র নিচে 'হ' এবং তারও নিচে উ-কার দিয়ে তৈরি কোন 'হাঁসজারুই' (হাঁস+সজারু+রুই) জাতীয় অক্ষর তো বাঙলা ছাপাখানায় নেই—তখন শুধু সবিনয় সকাতর সভয়ে প্রশ্ন শুধোতে ইচ্ছা করে, 'আপনারা তরুণরা, যে নানাবিধ ভাষা শিখছেন সেটা বড়ই আনন্দের কথা, কিন্তু একবার একটু ভেবে নিলেই তো হয় যে মাইকেল, জ্যোতি ঠাকুর, বীরবল, ধ্বনিবিদ সুনীতি চট্টো, শহীদুল্লা এঁরা কেউই এই বিদকুটে ফরাসী 'র' ধ্বনি যে আলাদা সেটা লক্ষ্য করলেন না, এটা কি প্রকারে সম্ভবে?' এবং শেষ নিবেদন—জানি আপনারা পেত্যয় যাবেন না, ফরাসী জর্মন এমন কি ইংরাজি 'r'ও বাঙলা 'র'-এর মত নয় সেটা সত্য, কিন্তু তাদের 'r'র সঙ্গে যে আমাদের 'র' মিলছে না সেটা আমরা 'র'-এর উচ্চারণ করার সময় মুখগহ্বরের অন্য জায়গা থেকে করি বলে নয়—তাদের আপত্তি আমরা 'r' উচ্চারণের সময় সেটিকে 'ট্রিল' করি বলে, অর্থাৎ আমরা যখন বলি 'পারি' (প্যারিস) তখন ফরাসী শুনতে পায় যেন আমরা 'r'টা তিনবার উচ্চারণ করে বসে আছি। বিচক্ষণ ফরাসী গুরু তদ্দণ্ডেই বলেন, 'কিন্তু মসিয়ো Paris শব্দে মাত্র একটি "r" আপনি তিনটে "r" উচ্চারণ করলেন যে?' আমি আরো জানি—আপনারা আরো পেত্যয় যাবেন না যদি বলি, ফরাসী জর্মন উভয় অভিনেতাই [এবং উচ্চারণের ক্ষেত্রে ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতের চেয়ে এঁরাই সর্বসাধারণের কাছে অধিকতর সম্মান লাভ করেন—ইংলণ্ডেও বার্নার্ড শ-কে যে বি বি সি উচ্চারণ-বোর্ডে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করা হত তাঁর কারণ তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি নয়, নাট্যে উচ্চারণ বাবদে তাঁর ওয়াকিফহালত্ব] চেষ্টা করেন বাঙালীর 'র'র মত আপন 'r' উচ্চারণ করতে!!! —কিন্তু ট্রিল না করে। অর্থাৎ জর্মনে যাকে বলে হ্যাল[১]—উজ্জ্বল—ফরাসীতে

---

১ কথাটা জর্মনে hell, কিন্তু বাঙলায় আমি 'হেল' না লিখে হ্যাল কেন লিখলুম সে বিষয় নিয়ে সুদূর ভবিষ্যতে আলোচনা করবার আশা রাখি। কারণ জনৈক পত্রলেখক ইটিকে আমার 'হিমালয়ান ব্লাণ্ডার' পর্যায়ে ফেলেছেন।

যাকে বলে ক্ল্যার—ক্লিয়ার, পরিষ্কার, স্বচ্ছ 'r' উচ্চারণ করাটাকে আদর্শ 'r' উচ্চারণ মনে করেন। তাই মোটামুটি ভাবে বলা যায় ফরাসী বা জর্মন এমন কি ইংরিজী 'r' উচ্চারণ করার সময় যদি জিভটাকে মুখের ভিতর ঝুলিয়ে রেখে—অর্থাৎ সেটাকে তালু, মূর্ধা বা দাঁতের পিছনে ছুঁতে না দিয়ে, এবং কাজে কাজেই কোনো প্রকারের ট্রিল বা ফ্ল্যাপ করবার সুযোগ না দিয়ে—বাঙলা 'র' ধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তবে ঐ তিন ভাষায় ধ্বনিবিদ্ পণ্ডিতরাই আদর্শ "r" উচ্চারিত হয়েছে বলে মনে করেন। তার পর অবশ্য যদি কেউ সেটাকে খাঁটি প্যারিসিয়ান করতে চান তবে সেটা গলা থেকে আরবী 'গাইন' ঘেঁষা করবেন, দক্ষিণ-ফ্রান্সের মত করতে হলে ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন এবং জর্মন বলার সময় কলোন-বন্ অঞ্চলের 'r' উচ্চারণ করতে হলে সেটাকেও ঐ ফার্সী 'খে' ঘেঁষা করবেন। কিন্তু সর্বক্ষণ সাবধান থাকতে হবে যে, ট্রিলিং দুষ্কর্মটি যেন করা না হয়। বীরভূম অঞ্চলে যখন 'রাম'-এর পরিবর্তে 'আম' উচ্চারণ শোনা যায় তখন ঐ ট্রিলটি করা হয় না বলে—এবং রেডুকৎসিয়ো আড্ আব্‌সুর্ডুম হয়ে যাওয়ার ফলে 'র-এর সর্বনাশ হয়ে 'অ' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। ইংরিজীতেও তাই, কিংবা প্রায় তাই হয়—যখন 'r' কোনো স্বরবর্ণের পরে আসে। যথা 'hard'; এস্থলে 'r' শুধু আগের a-টিকে দীর্ঘ করে। 'r'-এর পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনধর্ম লোপ পায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে কোনো কোনো ধ্বনিবিদ্ উচ্চারণ দেখাবার সময় তাই 'r' হরফটি উল্টো করে দিয়ে লেখেন এবং ছাপাখানায়ও হরফটি উল্টো করে ছাপা হয়—লাইনো বা টাইপ রাইটারে অবশ্য সেটা সম্ভব নয়। আর 'r' বলার সময় যদি বাঙলার মত সেটাকে ট্রিল করতে চান, তবে প্রাণভরে করা যায় ইতালির 'r' উচ্চারণ করার সময়। ইংরিজিতে যে স্থলে 'Irregular' বলার সময় প্রথম যে দুটো 'r' একসঙ্গে এল, সে দুটোকে দু'বার উচ্চারণ করতে তো দেয়ই না, একবারই—বাঙলার হিসেবে—প্রাণভরে করতে দেয় কই? সেখানে ইটালিয়ান 'birra' (বিয়ার) বলার সময় যদি 'r'-টা প্রেমসে ট্রিল না করেন—কম-সে-কম দুবার—তবে বিয়ারের বদলে সেই যে ফুটোয় ভর্তি এক রকম পনির হয় বেয়ারা তারই ফুটোগুলো শুধু প্লেটে করে হয়তো নিয়ে আসবে! এবং শেষ কথা: ফরাসী জর্মন ধ্বনিবিদ্ যে তাঁদের 'r' পরিষ্কার ক্ল্যার হ্যাল উজ্জ্বল রাখতে চান, তার অন্যতম কারণ, গ্রীক এবং লাতিন যে 'r' আছে সেটা সংস্কৃত 'র'-এরই মত পরিষ্কার উজ্জ্বল—এবং জানা-অজানাতে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত মাত্রই গ্রীক- লাতিন থেকে খুব দূরে চলে যেতে চান না। এরই উদাহরণ 'গুড্‌বাই, মিঃ চিপ্‌স্ ফিল্মে আছে'।]

সত্য জ্ঞানলাভের জন্য তৃষ্ণার্ত জন যুগে যুগে বিদেশ গিয়েছে, বিধর্মীর কাছে গিয়েছে। পয়গম্বর বলেছেন, 'জ্ঞানলাভের জন্য যদি চীন যেতে হয় তবে সেখানে যেয়ো'—বলা বাহুল্য, তাঁর আমলে চীন দেশে কোনো মুসলমান ছিলেন না এবং তাই ধরে নিতে পারি বিধর্মী 'কাফেরে'র কাছ থেকে জ্ঞানসঞ্চয় করতেও তিনি আপত্তিজনক কিছু পান নি।

কিন্তু এই যে 'ফরেন' যাওয়ার হিড়িক আরম্ভ হল প্রায় শ' খানেক বছর আগে এবং স্বরাজ পাওয়ার পর—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—এখনো বাড়তির দিকে, তার বেশীর ভাগই ছিল 'ইস্টাম্বো' নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে – পেটটাকে এলেমে ভর্তি করার জন্য নয়। পাঠান এবং মোগল রাজারা এ-দেশেই বাস করতেন, এইটেই তাঁদের মাতৃভূমি, কাজেই বিদেশের ইস্টাম্বোর প্রতি তাঁদের কোনো অহেতুক মোহ ছিল না—যদিও বিদেশাগত হুনুরী গুণীকে তাঁরা আদর করে দরবারে স্থান দিতেন। কিন্তু ইংরেজ কলকাতায় বসেও চোখ বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতো লণ্ডনের দিকে, Kedgeree ('কেজরী'—খিচুড়ি—কৃশর, কৃশরান্ন ?—) খাওয়ার সময় চিন্তা করতো আল্লায় মালুম কিসের!

অতএব সেখানে থেকে যদি কপালে একটি 'ইস্টাম্বো' মারিয়ে নিয়ে আসা যায় তবে পেটে আপনার এলেম গজ্‌গজ্ করুক আর নাই করুক, আপনি 'ফ্রেশ্ ফ্রম্ ক্রিস্টিয়ান হোম', আপনিও এখন গোরা রায়। তাই স্বরাজ লাভের পরও

অদ্যাপিও সেই খেলা খেলে গোরা রায়।
দিবাভাগে মন্দ ভাগ্যে তার মার খায়॥

## সাবিত্রী

দক্ষিণ ভারতের একটি সানাটরিয়ামে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ব্যামো গোড়াতেই ধরা পড়েছিল বলে কেস্ খারাপ হতে পায় নি। আমাকেও তাই কোন প্রকারের সেবা-শুশ্রূষা করতে হত না। হাতে মেলা সময়। তাই কটেজে কটেজে—এ-সব কটেজে থাকে অপেক্ষাকৃত বিত্তশালীরা আর বিরাট বিরাট লাটের একাধিক জেনরেল ওয়ার্ড তো আছেই—ডাক্তাররা সকাল বেলাকার রোগী-পরীক্ষার রোঁদ সেরে বেরিয়ে যাবার পরই আমি বেরুতাম আমার রোঁদে। বেচারাদের অধিকাংশকেই দিনের পর দিন একা-একা শুয়ে

শুয়ে কাটাতে হয় বলে কেউ তাদের দেখতে এলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ যে কী রকম খুশীতে উজ্জ্বল— এবং যে-ক'টি ফোঁটা রক্ত গায়ে আছে, সব ক'টি মুখে এসে যেত বলে রাঙা—হয়ে যেত, সেটা সত্যই অবর্ণনীয়।

করে করে প্রায় সব্বাইকেই আমি চিনে গিয়েছিলুম—তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতীই বেশী।

একটি কটেজে আমি কখখনো যাই নি, ডাক্তার ভিন্ন আর কাউকে কখনো যেতেও দেখি নি। রোগীর পাশে সর্বক্ষণ দেখা যেত একটি যুবতী—বরঞ্চ তরুণী-ঘেঁষা যুবতী বললেই ঠিক হয়—মোড়ার উপর বসে উলের কাজ করে যাচ্ছেন; তাই বোধ হয় কেউ তাঁদের বিরক্ত করতে চাইতো না।

একদা রোদ শেষে, পথিমধ্যে হঠাৎ আচমকা বৃষ্টি। উঠলুম সেই কটেজ-টাতেই।

যুবতীটি ধীরে ধীরে মোড়া ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে অতি ক্ষীণ ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আসুন, বসুন। কী ভাগ্য বৃষ্টিটা নেমেছিল। নইলে আপনি হয়তো কোনদিনই এ-কটেজে পায়ের ধূলি দিতেন না।'

কী মিষ্টি গলা! আর সৌন্দর্যে ইনি রাজরানী হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সে কী শান্ত সৌন্দর্য! গভীর রাত্রে, ক্ষীণ চন্দ্রালোকে, আমি নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে দেখেছি এই শান্ত ভাব—দিক্-দিগন্ত জুড়ে। আমরা প্রাচীন যুগের বাঙালী। চট করে অপরিচিতার মুখের দিকে তাকাতে বাধো বাধো ঠেকে। এঁর দিকে তাকানো যায় অসঙ্কোচে।

রোগীও সুপুরুষ, এবং এই পরিবেশে খাটে শুয়ে না থাকলে বলতুম, রীতিমত স্বাস্থ্যবান। শুধু মুখটি অস্বাভাবিক লালচে—যেন গোরা অফিসারের মুখের লাল।

স্ত্রীর কথায় সায় দিয়ে হেসে বললেন—গলাটা কিন্তু রোগীর—'রোজ চারবেলা দেখি আপনাকে এ-পথ দিয়ে আসতে যেতে। পাশের কটেজে শুনি আপনার উচ্চহাস্য। শুধু আমরাই ছিলুম অস্পৃশ্য! অথচ দেখুন, আমি মুখুজ্যে বামুন—'

আমি গল্প জমাবার জন্য বললুম, 'কোন্ মেল? আমার হাতে বাঁড়ুজ্যে ফুলের মেল একটি মেয়ে আছে।'

এবারে দুজনার আনন্দ অবিমিশ্র। এ লোকটা তাহলে পরকে 'আপনাতে' জানে। তিন্মুহূর্তে জমে গেল।

খানিকক্ষণ পরে আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই বড় খাঁটি বাঙলা বলেন, কিন্তু একটু যেন পুরনো পুরনো।'

মুখুজ্যে বললেন, 'আমি ডাক্তার—অবশ্য এখন অবস্থা "কবরাজ। ঠেকাও আপন যমরাজ।" তা সে যাকগে। আসলে কি জানেন, আমরা দুজনাই প্রবাসী বাঙালী। তিনপুরুষ ধরে লক্ষ্ণৌয়ে। আমার মা কাশীর, ঠাকুরমা ভট্ট-পল্লীর। সেই ঠাকুরমার কাছে শিখেছি বাঙলা—শাস্ত্রীঘরের সংস্কৃতঘেঁষা বাঙলা। সেইটে বুনিয়াদ। সবিতা আমাদের প্রতিবেশী। আমার ঠাকুরমার ছাত্রী। আমরা দুজনা হুবহু একই বাঙলা পড়েছি, শিখেছি, বলেছি। তবে ম্যাট্রিক পর্যন্ত উর্দু শিখেছি বলে মাঝে মাঝে দু-একটি উর্দু শব্দ এসে যায়—আমার ভাষাতে, সবিতার না। আপনার খারাপ লাগে?'

আমি প্রতিবাদ করে বললুম, 'তওবা, তওবা! আমি বাঙালী মুসলমান; আমরা ইও্হী দু-চারটে ফাল্তো আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করি।'

পাশ ফিরে, আপন দুই বাহু আমার দিকে প্রসারিত করে দিলেন। আমি আমার হাত দিলুম। দু'হাত চেপে ধরে, চোখ বন্ধ করে, গভীর আত্মপ্রসাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'বাঁচালেন। আপনি মুসলমান!'

আমি একটু দিশেহারা হয়ে চুপ করে রইলুম।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যত্রতত্র খান এখানে? ডাক্তার হিসেবে বলছি, সেটা কিন্তু উচিত নয়।'

আমি বললুম, 'আমি যত্রতত্র যা-তা খাই, এবং ভবিষ্যতেও খাবো। অপরাধ নেবেন না।'

'বাঁচালেন!' এবারে আমি আরো দিশেহারা। আমি তাঁর পরামর্শ অমান্য করছি দেখে তিনি খুশী!

'বাঁচালেন! জানেন, প্রথম দিনই আপনার চেহারা দেখে, অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ করলুম আমার এক মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে।'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমায় বলি নি, সবিতা?'

সবিতা একক্ষণ ধরে শুধু উল বুনে যাচ্ছিলেন। মাথা তুলে সম্মতি জানিয়ে বললেন, 'এমন কি, চলার ধরনটি, গলার স্বরও!'

মুখুজ্যে বললেন, 'সেই বন্ধুটি যদি আজ এ-লোকে থাকতো, তবে আজ আমার এ-দুর্দশা হত না! সে কথা থাক। মূল বক্তব্য এই: ঠাকুরমা প্লাস তামাম পরিবার, প্লাস সেই সখার পরিবার—সবাইকে লুকিয়ে, বিস্তর ছলনা-জাল বিস্তার করে আমি ছেলেবেলা থেকে খেয়েছি ওর মায়ের তৈরী মুর্গী-মটন। সে খেত আমাদের বাড়িতে নিশ্চিন্ত মনে। আপনি বোধ হয় জানেন না—'

'বিলক্ষণ জানি, স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—আপনার ঠাকুরমার পাড়ার লোক -

বাড়িতে দিশী-বিদেশী সবাইকে খাওয়াতেন। তাঁর ছেলে, স্বর্গত বিনয়তোষ তিনিও নিষ্ঠাচারী ছিলেন। ঝাড়া আটটি বছর প্রতি রোববারে, তাঁর সামনে বসে, তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করেছি আমি, মুসলমান।'

ডাক্তার বললেন, 'তারপর ঠাকুরমা মা আর সবাই গত হলেন। রইল ঐ দোস্ত-ইয়ার-সখা বেদার্-বখ্‌শ্। একই বছরে দুজনায় ডাক্তারি পাস করলুম। ইতিমধ্যে আমার বিয়ে হয়েছে। সবিতা রাঁধে ভালো, কিন্তু তার মা তাকে বলে দিয়েছিলেন, 'অন্তত রান্নার ব্যাপারে বাপের বাড়ির ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে, স্বামী যে-ভাবে খেতে চায় ঠিক সেইভাবে খাওয়াবি।' তাই সবিতা বেদারের মায়ের কাছ থেকে শিখলো বিরয়ানী থেকে ফালুদা, বুরহানী থেকে আজওয়ান রুটি। অতএব স্যার, কাল দ্বিপ্রহরে এখানে একটু হবিষ্যান্ন করবেন—' হেসে বললেন, 'অবশ্যই, মোগলাই! আসলে কি জানেন, এই যে চোখের সামনে সবিতা উদয়াস্ত উল বোনে, এটা, it gets on my nerves! আর সবিতা একটি পারফেকট আর্টিস্ট। রন্ধনে। তার অনুশীলন নেই, রেওয়াজ নেই। আপনার শোক হয় না? আমার তো ওসব খাওয়া বারণ। নিজের জন্য—'

আমি সবিতার দিকে তাকিয়ে আমার মাকে দেখতে পেলুম; বাড়িতে কেউ না থাকলে মা হাঁড়ি পর্যন্ত চড়াতো না। তেল-মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়তো। আর এই সবিতা নাকি বিস্বাদ বিবর্ণ মাছসেদ্ধ, কপিসেদ্ধ, পাতলাসে পাতলা যেন কড়াই-ধোয়া-জল সুপ নামে পরিচিত গব্বযন্ত্রণা স্বামীকে খেতে দিয়ে নিজে গণ্ডার-গ্রাসে খাবে বিরয়ানী, বুরহানী কাবাব-মুসল্লম!

আমি বললুম, 'ফিন্‌সে তওবা! তা-ও কখনো হয়! কিন্তু আমি একা-একা খাব?—কেমন যেন?'

আর্তনাদ করে বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না, রান্নাঘর থেকে সবিতার রেওয়াজের গন্ধ আমার নাকে আসবে—আচ্ছা, আপনি না-হয় আড়ালেই খাবেন, শুধু আমি পদগুলো কম্পোজ করে দেব। আপনাকে এ-নিমন্ত্রণ সাহস করে জানালুম, আপনি যত্রতত্র খান শুনে। নইলে—'

আমি বললুম, 'ডাক্তার, আমি জানি আপনাদের অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা বারণ। কাল সকালের রোঁদ সেরেই আসবো। দুপুরে খাব।'

সবিতা রাস্তা অবধি নেমে এসে বললেন—মাথা নিচু করে, প্রায় হাতজোড় করে, 'এই দু'বছর ধরে আমরা এখানে আছি। এই প্রথমবার তিনি পুরো আধ ঘণ্টা ধরে খুশিতে আনন্দে সময় কাটালেন। আপনি দয়া করে আসতে ভুলবেন না। বড় ডাক্তার বলেছে, উনি ফুর্তিতে থাকলে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। আমি

ওঁকে বাঁচাতে চাই। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন—'

হঠাৎ ধপ্ করে রাস্তার পাশে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর তার মাথা ঠুকে দিল। এত দুঃখের ভিতরও আমি দেখলুম, বন্যার জলের মত একমাথা গোছা গোছা গাদা গাদা কালো চুল ঘোমটার বাঁধ সরিয়ে আমার দুই গোড়ালির হাড় পেরিয়ে, মাঝ-হাঁটু অবধি ছাপিয়ে দিল। এ-চুল আমি দেখেছি, অতিশয় শৈশবে, আজ মনে হয়, যেন আধাস্বপ্নে, যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে, আমার মায়ের মাথায়।

সতীসাধ্বী যুবতীকে স্পর্শ করা গুনাহ্। জাহান্নামে যাক গুনাহ্!

দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে ধরলুম। বললুম, 'মা! ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো।'

সীমন্তিনী বললে, 'আমি আল্লাকে ইয়াদ করি।' ॥

## আধুনিকা

থেকে থেকে 'মর্ডান' মেয়েদের বিরুদ্ধে খবরের কাগজে নানা জাতের চিঠি বেরোয়। সেগুলোর মূল বক্তব্য কি, তার সবিস্তার বয়ান দেবার প্রয়োজন নেই এবং সেগুলো যে সর্বৈব ভিত্তিহীন সে-কথাও বলা যায় না। হালে পাড়ার বুড়োরা আমাকে দফে দফে মডার্নীদের 'কুকীর্তি'র কাহিনী কয়ে গেলেন। সেই সুবাদে আমার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল।

ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখনও এদেশে 'পেট-কাটা' 'নখরাঙানো' মডার্নীদের আবির্ভাব হয় নি, এ তো জানা কথা, কিন্তু 'মর্ডান' মেয়ে সর্বযুগে সর্বদেশেই থাকে। আমার মনে হত, সে যুগের মডার্নতম দেখা যেত চাঁদপুর—নারায়ণগঞ্জ—গোয়ালন্দী জাহাজে। এরা ঐসব অঞ্চলের ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়েথদের মেয়ে—তবে বৈদ্যই বেশী—কলকাতায় আসতো যেতো কলেজে পড়বে বলে। এক একটির চেহারা ছিল অপূর্ব। তন্বী, শ্যামাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী—আপন আনন্দে থার্ড ক্লাস ডেকের যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়, চায়ের স্টলে বসে খেতেও ওদের বাধে না। প্রাচীনরা ওদের দিকে একটু বাঁকা নয়নে তাকালেও একথা আমি কিছুতেই স্বীকার করবো না, ওরা বেহায়া বা বেশরম ছিল।

সে-আমলে ইণ্টার ক্লাস প্যাসেঞ্জারের জন্য দুটো জালে ঘেরা কামরা—বা খাঁচা থাকতো। একটা পুরুষ, একটা মেয়েদের। খুব যে আরামের ছিল তা নয়, তবে যে-সব লাজুক বউঝিরা পরপুরুষের সামনে কখনো বেরোয় নি তারা সেখানে

খানিকটে আরাম বোধ করতো।

সেকেণ্ড ক্লাসের কামরাতেই শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলুম, থার্ড ক্লাস ডেক ও দুটো খাঁচা অঞ্চলে হঠাৎ আন্দোলন উত্তেজনা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বয়েস আমার তখনো কম, তাই কৌতূহল ছিল বেশী। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে শুধোই, ব্যাপারটা কি ?

হট্টগোল হচ্ছে বটে, কিন্তু যাকেই প্রশ্ন শুধোই সে-ই পাশ কাটিয়ে যায়। এস্তেক চা'র স্টলের দোকানটি পর্যন্ত এমন ভাব করলে যেন আমার প্রশ্নটা আদৌ শুনতে পায় নি।

স্যুর্‌রিয়ালিজম দাদাইজম যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন, আমি যদি তখনকার অবস্থার বর্ণনাটা দিতে গিয়ে বলি, ডেকের সর্বত্র যেন 'ছি ছি' আঁকা, কানে আসছে 'ছি ছি' স্বর, নাকের ভিতরও যেন 'ছি ছি' ঢুকছে।

টুয়েন্টিনাইন খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দশ-পঁচিশের দান একদিকে অবহেলে পড়ে আছে, এদিকে ওদিকে ছোট ছোট দলের ঘোটালা, আর সারেঙ্গ জাহাজময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করছে। কিন্তু সর্বোপরি ঐ ছি ছি ভাব।

তখন হঠাৎ চোখে পড়ল, মেয়েদের ইণ্টার ক্লাসের খাঁচা বেবাক ফাঁক—খানিকক্ষণ পূর্বেও যেটাকে কাঁঠাল-বোঝাই দেখে গিয়েছি—অবশ্য আড়নয়নে। আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খাঁচাটার এক কোণায় আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা কি যেন একটা বস্তু—মানুষই হবে—পড়ে আছে মেঝেতে। মনে হল, সেটা গোঙরাচ্ছে, কিন্তু ঐ 'ছি ছি'-র ভিতর দিয়ে ঠিক ঠিক ধরতে পারলুম না।

এমন সময় খানসামার সঙ্গে দেখা। পূর্বেই লোকটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে সিলেটি।

ইতিউতি করে বললে, 'কেলেঙ্কারি ব্যাপার। ইণ্টার ক্লাসের ঐ মেয়েটি গর্ভযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কী ব্যাপার! একে কেউ সাহায্য করছে না কেন? স্টিমারে, তো গণ্ডায় গণ্ডায় বুড়ী-হাবড়ী রয়েছে যারা কুড়িবুড়িতে আণ্ডাবাচ্চা বিইয়েছে?'

খানসামার পো ঈষৎ লাজুক প্রকৃতি ধরে। আবার গাঁই-গুঁই করে বললে, 'ব্যাপারটা কি হয়েছে, হুজুর, মেয়েটার বিয়ে হয় নি।'

'তা হলে এল কোত্থেকে? সঙ্গীসাথী নেই?'

'যা শুনেছি, তাই বলছি হুজুর। কেউই সঠিক খবর জানে না। মেয়েটার সঙ্গে একটা ছোকরা ছিল ওরই বয়সী। সে মাঝে মাঝে ওকে চা-টা পৌঁছে

দিয়েছে। ছেলেটা আমার কাছেই মুর্গী-কারি খেয়েছে। মেয়েটা কোনো কিছুই খেতে রাজী হয় নি। শুধু চা-টি খেয়েছে অনেক চাপাচাপির পর—বোধ হয় জাতঘরের হিন্দু মেয়ে।'

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললুম, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু ছেলেটা কোথায়? সেই তো জিম্মেদার।'

'গর্ভযন্ত্রণার প্রথম লক্ষণ দেখা দিতেই সে গা-ঢাকা দিয়ে মাঝখানের স্টেশনে নেমে পড়ে পালিয়েছে। লোকে অনুমান করছে, মেয়েটাকে সে নিয়ে যাচ্ছিল কলকাতায় কোনো একটা ব্যবস্থা করার জন্য। দেশ থেকে বেরুতে দেরি হয়ে যায়, তাই হঠাৎ এ গর্দিশ এসে পড়েছে।'

আমি বললুম, 'সেও বুঝলুম, কিন্তু মেয়েটা বিপদে পড়েছে, আর কেউই সাহায্য করছে না! এটা একটা কথার কথা হল?'

অসহায় ভাব দেখিয়ে বললে, 'হিন্দুদের ব্যাপার, কি করে বুঝি বলুন! দু' একটি মুসলমান আছে। তারাও হিন্দুদের ঐ সব দেখে বোধ হয় সাহস পাচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'জাহাজে ডাক্তার নেই? প্যাসেঞ্জারের ভিতরেও?'

'তারই সন্ধান চলছে, হুজুর।'

তারপর খানসামা বিজ্ঞভাবে দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে যেন আপন মনে বললে, 'যত সব নাদান বেকুবের কারবার। আরে বাপু, মেয়েটার মাথায় এক থাবড়া সিঁদুর আগে লেপটে দিলেই তো পারতো!'

(জানি নে, তাতে করে কি হত! হালে এ্যারোপ্লেনে নাকি এমতাবস্থায় এ্যারহোস্টেস্ সাহায্য করতে রাজী হয় নি)।

আপন ক্যাবিনে ফিরে যাচ্ছি। এমন সময় এক সহৃদয় প্যাসেঞ্জার আমাকে পাকড়ে বললে, 'আপনি চলুন না, স্যার।'

তাজ্জব মেনে বললুম, 'আমি!'

'কেন? আপনি তো ডাক্তার!'

বুঝলুম, আমার ট্রাঙ্কে বা রিজার্ভেশন কার্ডে দেখেছে, লেখা, Dr.। কাতর কণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, সেটা ভিন্ন বস্তু, বেকার, 'ফরেন'। এটা দিয়ে মাছিটার ছেঁড়া পাখনাও জোড়া দেওয়া যায় না। লোকটি বড়ই সরল। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি নে, চিকিৎসার ডাক্তার এক প্রাণী, আমার ডক্টরেট ত্রিসংসারে কারো কোনো কাজে লাগে না। এ ধরনের গেরো আমার জীবনে আরো দু'দুবার হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে জাহাজে নূতন চাঞ্চল্য। কোত্থেকে পাওয়া গেছে এক না-পাস কম্পাউণ্ডার। সে বোধ হয় 'শ্মশান-চিকিৎসাটা' করতে রাজী হয়েছে। তবে বলছে, একটি মেয়েছেলের সাহায্য পেলে ভালো হত।

তারপর যা দেখলুম, সে দৃশ্যটি আমার জীবনে ভুলবো না।

ঐ যে পূর্বে বলছিলুম, জাহাজে তখনকার দিনের কলেজের দু'পাঁচটা 'আধুনিকা' নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়াতো, তাদেরই একটি—লম্বা, ছিপছিপে শ্যামবর্ণ, পরনে সাদামাটা শাড়ি ব্লাউজ—গমগম করে কম্পাউণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল, দু হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে। তখন চতুর্দিক থেকে উঠেছে তার দিকে 'ছ্যা ছ্যা ছি ছি' রব। সকলের টার্গেট তখন ঐ আসন্নপ্রসবা নয়—তখন এই ভদ্রকন্যা।

আমি জীবনে দু'জন পরমহংস দেখেছি।

আর এই দেখলুম, একটি পরমহংসী। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে নয়, সর্ব ধিক্কার, সব ব্যঙ্গ, সব বিদ্রূপ উপেক্ষা করে প্রসন্ন বদনে সে এগিয়ে যাচ্ছে !!

## ফরাইজ্

'বাপের বাড়ি', 'শ্বশুরবাড়ি', 'পিতৃগৃহ', 'পতিগৃহ', 'মুখ্যগৃহ', 'গৌণ গৃহ' ইত্যাকার বহু প্রকার 'গৃহে'র নবীন নামকরণের প্রস্তাব পত্রান্তরে হয়ে যাচ্ছে। এই সুবাদে মুসলমানদের ভিতর কি রীতি প্রচলিত আছে সেটার উল্লেখ বোধ হয় সম্পূর্ণ অবান্তর হবে না। কারণ হিন্দু এবং মুসলমান ধর্মের লোকাচারে, বিষয়-সম্পত্তি বণ্টন বাবদে যতই পার্থক্য থাক না কেন, উভয় ধর্মাবলম্বীরই ভাষা বাঙলা এবং মুসলমান মেয়েও বলে 'বাপের বাড়ি' 'শ্বশুরবাড়ি'। তবু একটা ব্যাপারে সামান্য তফাত আছে।

অল্প হোক, বিস্তর হোক, পিতার মৃত্যুর পর মুসলমান মেয়ে বাপের সম্পত্তির কিছুটা হিস্যে পায়। অর্থাৎ পৈতৃক ভদ্রাসনেও তার আইনত অংশ বিদ্যমান থাকে। একেই বলে 'ফরাইজ্'।

কার্যত কিন্তু সে এ-ফরাইজ্ দাবি করে না। এমন কি পতিগৃহে তার লোভী স্বামী যদি তাকে ন্যায্য হক পাওয়াব জন্য ক্রমাগত টুইয়ে দিতে থাকে তবু সে সেটার দাবি করে না, মোকদ্দমা করতেও রাজী হয় না—আর স্বামী নিজের থেকে কোনো দাবি-দাওয়া করতে পারে না, কারণ হক তার স্ত্রীর, তার নয়।

বোন কেন মোকদ্দমা করে না, তার একাধিক কারণ আছে। লোকাচারে বাধে ( এতে হয় তো কিছুটা প্রতিবেশী হিন্দুর প্রভাব আছে ), এবং দ্বিতীয়ত তার অন্য স্বার্থ আছে। সে যদি তার ন্যায্য পাওনা নিয়ে নেয়, তবে সে অর্থ হয়তো খর্চা হয়ে যাবে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পর সে যদি কোনো কারণে অসহায় হয়ে যায় —দেবর ভাশুর তাকে অবহেলা করে—তবে তার অন্য আশ্রয় থাকে না। পক্ষান্তরে সে যদি ফরাইজ্ না নেয়, তবে সে তারই হক্কের জোরে বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে। এমন কি শ্বশুর ভাশুর স্বামীর জীবিতাবস্থায়ও যদি তার উপর অত্যধিক চোটপাট হয় তবে সে ফরাইজের হক্কে বাপের বা ( বাপ মরে গিয়ে থাকলে ) ভাইয়ের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিতে পারে।

আরো একটা কারণ আছে। মুসলমান মেয়ে মাত্রই আশা করে, সে যেন বছরে অন্তত একবার তার বাপ-মা, ভাইবোন, ছেলেবেলার পাড়াপ্রতিবেশীকে দেখতে যেতে পায়। এস্থলে স্মরণ করিয়ে দি, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান মেয়ের নাম পদবী বদলায় না। মুসলমান বিবাহ অনেকটা সিভিল ম্যারিজের মত কন্‌ট্রাক্‌ট্ ম্যারিজ—সেক্রেমেণ্টাল নয়। অপরাধ যদি না নেন, তবে উল্লেখ করি, আমার পিতার নাম ছিল সৈয়দ সিকন্দর আলী। অথচ আমার মা চিরকালই নাম সই করেছেন, আমতুল মন্নান খাতুন চৌধুরী। মিসেস আলী, মিসেস সৈয়দ —বা বেগম আলী এসব হালে ইংরেজের অনুকরণে হয়েছে।

* *

এবারে গরীব দুঃখী চাষীবাসীদের একটি উদাহরণ দি। পূব বাঙলার।

মনে করুন চাষা কেরামতুল্লা মারা গেছে। তার মেয়ে জয়নবের বিয়ে হয়েছে বেশ দূরে ভিন্ গাঁয়ে। জয়নবের বাল্যাবস্থায় তার মা মারা যায় বলে কেরামতুল্লা দুসরা শাদী করেছিল। সে পক্ষের ছেলে আকরম বিধবা মাকে নিয়ে, বিয়ে করে মোটামুটি সুখে-স্বচ্ছন্দেই আছে। সৎ বোনকে আর স্মরণেই আনে না। তার মাও সতীনের মেয়ে জয়নবকে দু' চোখে দেখতে পায় না। অতএব জয়নব বেচারী বাপের বাড়ির মুখ দেখতে পায় না। জয়নবের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ের লোকে তাই নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে। ওদিকে লোভী স্বামীও বলে, 'ফরাইজ্ চেয়ে নে।'

জয়নব বেচারী তখন যদি দৈবযোগে বাপের গাঁয়ের কাউকে পেয়ে যায় তখন তাকে দিয়ে ভাইকে খবর পাঠায় তাকে যেন এসে বাপের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যায়—একেই বলে 'নাইওর' যাওয়া। ভাই খবর পেয়েও গা করে না —আর সৎমার তো কথাই নেই। বেচারী জয়নব একাধিকবার খবর পাঠিয়ে

হয়রান হয়ে গেল। ওদিকে বাপের গাঁয়ের লোক তো আর তার শ্বশুরের গাঁয়ে নিত্যি নিত্যি আসে না যে নিত্যি নিত্যি খবর পাঠাবে।

তখন সে ধরে অন্য পন্থা। নদীতে জল আনতে গিয়ে সুযোগ পেলেই সময় কাটায় বিস্তর। এবং স্বভাবতই তার গাঁয়ের সব মাঝিদের সে চেনে। তাদের কাউকে দেখতে পেলে পাড়ে বসেই চিৎকার করে তার ফরিয়াদটি জানিয়ে দেয়। সবিস্তারে বলতে হয় না—সবাই সব খবর জানে।

তাতেও যদি ওষুধ না ধরে, তখন সে ধরে রুদ্রমূর্তি।

শাসিয়ে দেয়, তাকে নাইওর না নিয়ে গেলে সে ফরাইজের মোকদ্দমা করবে

এইবার ভাইয়ের কানে কিঞ্চিৎ জল যায়। তাও পুরোমাত্রায় না। ইতিমধ্যে গাঁয়ের মুরুব্বীদের কানেও তাবৎ ফরিয়াদ পৌঁচেছে—বিশেষত সেই সব বৃদ্ধদের কানে যাঁরা বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন। তাঁরা তখন ছোকরাকে বুঝিয়ে বলেন, 'তোর আছে কুল্লে আড়াই বিঘত জমি—আচ্ছা, তার না হয় কিছুটা গেল; কিন্তু তোর বসত-বাড়িতেও যে ছুঁড়ির হিস্সে রয়েছে। সেইটেও তুই লাটে তুলবি নাকি? যা, যা, বোনকে নিয়ে আয়।'

আমি এতক্ষণ যা বললুম, এসব পূব-বাঙলার লোকসঙ্গীতেও আছে। তারই একটির শেষ দুই লাইনে আছে,

"থাকো গো বোন, থাকো গো বোন,
কিলগুঁতা খাইয়া,
আষাঢ়[১] মাসে লইয়া যাইমু
পঙ্খীরাজ ওড়াইয়া॥"

ভাই নৌকা নিয়ে আসার খবর পাওয়া মাত্রই বোন লেগে যায় নানারকম মিষ্টি পিঠে বানাতে। শাশুড়ী গজর গজর করে, কিন্তু জা-রা তো একই গোয়ালের গাই তারা সাহায্য করে।

নৌকা এল। বোন সগর্বে হাঁড়ি-ভর্তি মিঠে পিঠে নিয়ে নৌকায় চাপলো। গাঁয়ের মেয়েরা এখন আর তাকে খোঁটা দিতে পারবে না। এ তো সতীর নিঃসঙ্গ হিমালয়-যাত্রা নয়।

* *

---

১ লেখকের মনে ঈষৎ সন্দেহ আছে, এস্থলে ভাই বোধ হয় বোনকে কিঞ্চিৎ ধাপ্পা দিচ্ছে। বোনকে সচরাচর নাইওর নেওয়া হয় অঘ্রান মাসে ধান কাটার পর। কিন্তু আমি সঠিক বলতে পারবো না। কারণ দেশ ছেড়েছি দুই যুগ পূর্বে।

বুদ্ধিমতা মেয়ে বলে বাপের বাড়ি গিয়ে জয়নব পাড়াময় চর্কিবাজি মেরে দিন কাটায় না। অবশ্য সর্বপ্রথম মিঠে পিঠে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, সইটইদের সঙ্গে দেখা করতে যায়, কিন্তু তারপরই লেগে যায় নূতন ধানচাল যা উঠেছে তার দুরুস্ত-ব্যবস্থা করতে। অবশ্য একথাও ঠিক, কেউ তা সে যে কোনো স্ত্রীপুরুষই হোক যদি সুবো-শাম বেঘোরে ঘুমোয় তবে লোকে প্রবাদটা বলে, 'দেখো খোদার খাসিটা ঘুমুচ্ছে যেন "নাইওরী-মাগীটার" মত!'

এই করে করে 'নাইওর' বাস যখন শেষ হয়, তখন বাপের বাড়িতে আবার মিঠে পিঠে তৈরী আরম্ভ হয়—এগুলো সে নিয়ে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। ভাই অন্তত একখানা শাড়ি, একটি কুর্তা কিনে দেবে বোনকে—জামা-ফ্রক ভাগ্নেভাগ্নিকে!

জয়নব কিন্তু ধান ভানা কোটাতে এমনই সাহায্য করে যেন ভাই, সৎমা ফ্রী চীপ-লেবারের প্রলোভনে তাকে আসছে বছর নিজের থেকেই 'নাইওর' নিয়ে আসে—ফরাইজের মোকদ্দমার শাসানি যেন মাঝি-মাল্লা মারফত না পাঠাতে হয় শ্বশুরবাড়ি ফিরে জয়নব আবার দেমাক করে, 'আমি মাগনা খাই নে পরি নে। যদ্দিন ওখানে ছিলুম সৎমাকে কুটোটি পর্যন্ত কুড়োতে দি নি!'

* *

এতক্ষণ যা নিবেদন করলুম এটা হিন্দুদের বেলাও প্রযোজ্য। প্যাটার্ন মোটামুটি একই, তবে তফাৎটা কোথায়?

তফাৎ ঐ ফরাইজের হক্ক, ড্যুরেস, ব্ল্যাকমেল (অবশ্য বেআইনী নয়) দিয়ে সে বাপের বাড়ি যাবার হক্ক আজীবন জিইয়ে রাখে। স্বামীর সঙ্গে না বনলে সেই হক্কের জোরে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাপের বাড়ি চলে আসে। অবস্থা চরমে পৌঁছলে সেখানে বসে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ন্যায্য স্ত্রীধনের মোকদ্দমা লাগায়। কিংবা যদি স্বামীর মৃত্যুর পর ভাশুর-দেওর তাকে অসম্মান করে তবে সে চলে আসে বাপের বাড়িতে, ঠুকে দেয় ওদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা। এগুলোই আসল তত্ত্ব বলে পুনরাবৃত্তি করলুম।

* *

এ সব সম্ভব বাপের বাড়ির ফরাইজের জোরে।

তাই সেটি সে কখনো হাত-ছাড়া করে না। লোভী স্বামী যতই চোটপাট করুক না কেন।

হিন্দু মেয়েরা একটু চিন্তা করে দেখবেন॥

# চোখের জলের লেখক

ইংরিজির শব্দভাণ্ডার অতুলনীয়। তন্মধ্যে একটি শব্দ 'গ্যাগা'—এর সঠিক উচ্চারণ না জানা থাকলেও ক্ষতি নেই। 'গ্যাগা' শব্দের অর্থ, লোকটার ব্রেন্-বক্সে যা আছে—যদি কিছু আদৌ থাকে—সেটা এমনই হযবরল গোবলেট পাকানোর জগা-খিচুড়ি যে কেউ কিছু বললে তার গলা দিয়ে যে ধ্বনি বেরয় সেটা 'গাগা', 'গ্যাগো' 'গ্যাগ্যা' গোঙরানো ঢপের—কাজেই শব্দটির যে কোনো উচ্চারণই মঞ্জুর। অর্থাৎ গাগার সঙ্গে ইম্‌বেসাইল, ইডিয়ট ( 'পণ্টক' বললুম না, কারণ সুনীতিবাবুর শব্দটির কপি-রাইট মেরে দিয়ে সেটার পাইরেটিং সংস্করণ বের করার দরুন পাড়ার ছোঁড়ারা আমাকে 'কণ্টক' থেকে 'কাঁটা', 'পণ্টক' থেকে 'পাঁঠা' বের না করে আড়াল থেকে আমাকে 'পন্‌ঠক্' বলতে আরম্ভ করেছে ) গোবর-গণেশ যে কারো সঙ্গে তুলনা করলে শেষোক্তদের অপমান করা হয়।

সেই গ্যাগাদের গ্যাগা—গ্যাগায়েস্টের মত আমি শুধু অর্থহীন কতকগুলো ধ্বনি বের করলুম যখন আমার এক নিত্যালাপী গুণী বললেন, জনৈক অধ্যাপক[১] নাকি প্রকাশ্য সভাস্থলে রায় প্রকাশ করেন, স্বর্গত, প্রাতঃস্মরণীয় শিল্পীরাজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নাকি থাড্ডোকেলাস্ 'চোখের জলের লেখক'। আচ্ছা, পাঠক তুমিও কও, সেস্থলে তুমি কি করতে! শরৎচন্দ্র কাঁদিয়েছেন! শরৎচন্দ্র হাসান নি! সামাজিক নিষ্ঠুরতার কাঁটাবনের উপর দিয়ে আমাদের কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যান নি!—কাঁদাবার জন্য নয়, যন্ত্রণায় চিৎকার করার জন্য। ব্যঙ্গ, শ্লেষ, বিদ্রূপ-বাণে আমাদের জর্জরিত করেন নি?

এই পুণ্য বঙ্গভূমিতে শতাধিক বর্ষ ধরে দুটি দল আছে। রামমোহন বনাম সতীদাহের দল, বিদ্যাসাগর বনাম নিরম্বু উপবাসের দল, রবীন্দ্রনাথ বনাম—তা সে যাই হোক্। সেই দল চেষ্টা করেছিলেন শরৎচন্দ্রকে নেতা বানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অতিষ্ঠ করে তুলতে। তাঁরা মাষা পরিমাণ কৃতকার্য হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, শরৎচন্দ্র দলের বাইরে। শরৎচন্দ্র যেমন 'দত্তা'র 'রাসবিহারী' চরিত্র আঁকেন, ঠিক তেমনি 'নারীর মূল্য'ও লিখতে জানেন। (আশা করি বলার প্রয়োজন নেই যে শরৎচন্দ্র এই অমূল্য গ্রন্থ কাঁদাবার জন্য লেখেন নি; পাঠক, আপনি সে বই পড়ে কি ভেবেছেন সঠিক বলতে পারবো না; আমার মনে হয়েছে, আমি যেন দু গালে চড় খাচ্ছি এবং জানি যখন এ-ই আমার

---

১ যে-কোনো কারণেই হোক, বন্ধুবর নাম উল্লেখ করলেন না, আমিও শুধোই নি।

প্রাপ্য তাই আমি তখন কাঁদি নি—কারণ কাঁদবার হক্কও সঞ্চয় করতে হয়। )

এদিকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'অন্ধভক্তে'র দল—ডেকে আন্ বললে যারা বেঁধে আনে—( যদিও আমি রবীন্দ্র-শিষ্য হিসেবে শপথ করে বলতে পারি, তিনি ডেকে আনতেও বলেন নি ) লাগলেন শরৎচন্দ্রের পিছনে। তার জের আজও চলছে। অবশ্য এস্থলে আমি করজোড়ে ক্ষমা ভিক্ষাকরে নিবেদন করি, পূর্বোল্লিখিত অধ্যাপক এ-'দলে'র নাও হতে পারেন। তিনি হয়তো তাঁর স্বাধীন ধর্মবুদ্ধি অনুযায়ী তাঁর বক্তব্য বলেছেন।

কিন্তু এসব 'বৃথা বাক্য'। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি 'তুলনাহীনা' কবিতা লিখতে লিখতে হঠাৎ লিখেছেন, 'বৃথা বাক্য থাক্'। গুরুবাক্য স্মরণে এবং সেই নীতি অনুযায়ী আমারও মন তাই এতক্ষণ ধরে বৃথা বাক্য ভুলে গিয়ে শুধু ঝাঁকুবাঁকু করছে, মেজদার স্মরণে—যিনি দুর্দান্ত শীতের রাতে লেপের ভিতর কচ্ছপটির মত শুয়ে আছেন আর শ্রীকান্ত তাঁর জন্য পাতা উল্টে দিচ্ছেন, হঠাৎ ব্যাঘ্ররূপী 'বউরূপী'র আবির্ভাব, ভিরমি কাটলে পর মেজদা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'—ইতিমধ্যে খড়ম পেটাতে পেটাতে ( আহা, কী সুন্দর ছবিটি। ) কটুবাক্য, 'খোট্টার ব্যাটারা কাঁঠাল পাকা দিয়া'—এবং সবশেষে পিসীমার সাত পাকের সোয়ামীর প্রতি অত্যন্ত প্র্যাকটিকাল সময়োপযোগী সদুপদেশ,—কাটা ন্যাজটি ভবিষ্যতের সুব্যবহারার্থে তরিবৎ করে তুলে রাখার জন্য—সেকালে বোধ হয় ভাগলপুরে ব্যাঙ্কে ভল্টের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাবধান! আমাকে সর্বক্ষণ সচেতন হয়ে থাকতে হবে যেন ফাঁদে পা না দি ;—শরৎচন্দ্র যে বাঙলা দেশকে হাসিয়েছেন তার উদ্ধৃতি দেবার প্রলোভন সম্বরণ না করলে বর্তমানে যাদের হাতে শরৎ-গ্রন্থাবলীর কপিরাইট তাঁরা আমাকে জেলে পুরবেন—পাতার পর পাতা নিছক পুনর্মুদ্রণ তাঁরা বরদাস্ত করবেন কেন? অথচ আমার বক্তব্য তো স্পষ্টতম হবে, যদি আমি একটি মাত্র বাক্যব্যয় না করে নিছক উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাই।

তর্কস্থলে স্বীকার করছি কাঁদানো সহজ। হাসানো কঠিন। টেকো ভদ্রলোক তাঁর বাদবাকি কুল্লে আড়াইগাছা চুল দিয়ে মাথার সামনের দিকের চালটা যেন খড় দিয়ে ছাওয়ার নিষ্ফল প্রচেষ্টা করেছেন—তাই দেখে রকে বসে আমার তিন ভাগনে যে 'সেব্রামীয়' টিপ্পনী কাটলে সেটি অনায়াসে অলিম্পিকে পাঠানো যায় এবং সেটি আমি ঘরের ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলুম। কিন্তু, হায়, ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারলুম না, কারণ, সরলতম কারণ, আমার আপন টাকটি—থাক, 'বৃথা বাক্য থাক্'। কিন্তু ঠিক ঐ সময় অন্য একটি ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে যাবার সময় রক্ থেকে যদি শব্দ আসতো, 'আহা বেচারা, কাল রাত্রে তার ছেলেটি

—জানিস, কি হয়েছে?'—বাকিটা শুনতে পেলুম না বলে হেঁকে শুধালুম, 'কেন রে, কি হয়েছে?' 'টাইফয়েডে একটা চোখ গেছে।' আমি তখন রকেরই একজন হয়ে গেলুম।

কিংবা সরলতর উদাহরণ দি।

ঐ বৈঠকখানায়ই বসে আছি। বাড়ির বউঝিরা রান্নাঘরে ফিস ফিস করে গালগল্প করতে করতে—রাঁধে মেয়ে কি চুল বাঁধে না—হঠাৎ সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। আমি যত গ্যাগা-ই হই না কেন, উঠে গিয়ে শুধবো না, 'হ্যাঁ বউমা, তোমরা হাসছিলে কেন?'

কিন্তু তারা যদি হঠাৎ একসঙ্গে ডুকরে কেঁদে ওঠে তবে আমি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে জানতে চাইবো তারা এরকম ধারা হঠাৎ কেঁদে উঠলো কেন? অর্থাৎ হাসি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়, কান্না কাছে টেনে আনে।

* *

শরৎচন্দ্র 'চোখের জলের লেখক'? আর বিদ্যেসাগর? বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় তিনি যে সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তখন আমরা ঠাঠা করে হেসেছি?—না? তাঁর 'শকুন্তলা' পড়তে পড়তে আমি তো হেসেই গড়াগড়ি! রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস নিশ্চয়ই অত্যন্ত অপ্রচুর ছিল। নইলে তিনি লিখবেন কেন, 'কেহ দুঃখ পায় ইহা তিনি (শ্রীকণ্ঠবাবু) সহিতে পারিতেন না—ইহার কাহিনীও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। এই বালকদের কেহ যখন কৌতুক করিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে চাহিত তখন বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" বা "শকুন্তলা" হইতে কোনো একটা করুণ অংশ তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইত, তিনি দুই হাত তুলিয়া নিষেধ করিয়া, অনুনয় করিয়া কোনো মতে থামাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।'

আশ্চর্য! আমি তো গ্রন্থ দু'খানা পড়ে হেসেই কুটিকুটি! তবে হ্যাঁ, আমি পূর্বেই স্বীকার করেছি আমি গ্যাগা।

সাহিত্যিক বিদ্যাসাগর মশাইকে লোকে চেনে তাঁর 'চোখের জলে'র বইয়ের জন্য। অবতার বিদ্যাসাগরকে বাঙালী চেনে তিনি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দিতেন বলে। বিদ্যাসাগর মশাই দুটোই পারতেন। কিন্তু সবাই তো তা পারে না। সমাজের অত্যাচার অনাচার দেখে সত্য সাহিত্যিক মানুষকে কাঁদায়। তাঁদের ভিতরে যাঁরা সত্যকার মানুষ তখন তাঁদের অনেকেই সে-সব অনাচারের বিরুদ্ধে নাঙ্গা তলওয়ার নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করে। কারণ আমাদের অধিকাংশই জড়। সাহিত্যিক স্পর্শকাতর। সে যখন করুণ বর্ণনা দিয়ে আমাদের কাঁদায়,

তখন আমাদেরই মত জড়ভরতদের কেউ কেউ ঐ সম্বন্ধে সচেতন হয়।[২]

ড্রাইফুসের প্রতি নষ্টাধম ফরাসী মিলিটারী মদমত্ত হয়ে যে অবিচার করে তার প্রতিকারের জন্য তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী প্যারিসের বড় বড় রাজনৈতিক শক্তিধর শাসক সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে করুণ আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সে বেচারী তো আমাদের 'তুলনাহীনা' লেখিকা আশাপূর্ণা নয়। শেষটায় চরম দীনজন যে রকম ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা চায়, ঠিক সেই রকম সে গেল সাহিত্যিক এমিল জোলার কাছে। তাঁর তখন বয়স হয়ে গিয়েছে। তিনি মাফ চাইলেন। শেষটায় বেচারী তার কাগজপত্র জোলার টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেল।

এই পৃথিবীর পরম সৌভাগ্য সেরাত্রে জোলার কোন কিছু করার ছিল না। এটা ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ সেই রমণীর কাগজপত্র চোখে পড়লো। অলস-ভরে পড়া আরম্ভ করে, বুড়া হঠাৎ সোজা হয়ে বসল—তারপর গেল ক্ষেপে। তখন লিখল জাক্যুজ ( J'accuse ) 'আই একুজ'। 'ফরাসী সরকারকে আমি একুজ করি'।

তারপর কি হল সেটা বলতে গেলে ঐ বইখানা ছাড়িয়ে আরো দুখানা বই লিখতে হয়।

মনে নেই, ক'বছর নির্বাসনের কারাযন্ত্রণা ভোগ করে 'কাঁদানো'র লেখক জোলার কৃপায় ড্রাইফুসের প্রতি সুবিচার হল।

শেষ কথা: বহু বহু প্রকৃত লেখক, 'চোখের জলের লেখক' নন কিংবা শুধু 'হাসাবার' লেখক নন। দুইই।

তবে কে কোথায় হাসবে, কে কোথায় কাঁদবে, বলা কঠিন। সেই "অরক্ষণীয়া" মেয়েটি যখন পড়ি-মরি হয়ে 'সেজেগুজে' কনে দেখবার পক্ষের সামনে বেরুতে যাচ্ছিল তখন একটি ছোট মেয়ে হাসি থামাতে না পেরে বলেছিল, পিসিমা সং সেজেছে।

আমি গ্যাগা। আমি ষোল বছর বয়সে কেঁদেছিলুম॥

৪।১২।৬৫

---

২ বিদ্যেসাগর ছদ্মনামে হাস্য—বরঞ্চ বলা উচিত—ব্যঙ্গরসও করে গেছেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি সেজন্য নয়। বস্তুত তাঁর সে সব ছদ্মনামে লেখা পুনরায় 'আবিষ্কৃত' হয় বছর বিশ-ত্রিশ পূর্বে।

# ছাত্র বনাম পুলিশ

( ১ )

'দেখি! বের করো অভিজ্ঞান-পত্র—আইডেনটিফিকেশন কার্ড!'

কী আর করে বেচারী—দেখাতে হল কার্ডখানা। নামধাম ঠিকানা তো রয়েইছে, তদুপরি রয়েছে বেচারীর ফোটোগ্রাফ, তার নিচে ছোকরার দস্তখত, এবং দুটোর দু'কোণ জুড়ে য়ুনিভার্সিটির স্ট্যাম্প। হোমিওপ্যাথিক পাসপোর্ট আর কি!

হায় বেচারা! যখন য়ুনিভার্সিটিতে প্রবেশ করার ওক্তে সগর্বে কর্তৃপক্ষের সম্মুখে ফোটোগ্রাফের নিচে দস্তখত করেছিলে তখন কি জানতে এটা 'দস্তখত' নয়, এই 'কুকর্ম' করে তার 'দস্ত্' ( হাত ) 'ক্ষত' হয়েছিল—এ 'পান্'টি আমার নয়, বিদ্যেসাগর মশাইয়ের। তাঁর প্রোতেজে মাইকেল পান করতেন প্রচুর, স্বয়ং বিদ্যেসাগর 'পান্' করতেন অত্যল্পই!

প্রাগুক্ত সরস প্রেমালাপ হচ্ছিল জর্মানির কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পুলিশম্যানে ( চলতি জর্মনে 'শুপো' )। ছোকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাত দুটোর সময় কাঁকর ছুঁড়ছিল একটি বিশেষ জানলার শার্সিকে নিশান করে, এবং যেহেতু তৎপূর্বে—অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দুটো অবধি চেন-স্মোকারদের মত এ্যাট্টুখানি, মানে ইয়ে, ঐ যাকে বলে বিয়ার—পান করেছিল বলে তাগটা স্বভাবতই টালমাটাল হয়ে পাশের যার-তার জানলার শার্সির উপর পড়ছিল। অবশ্য একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, সে কাপুরুষের মত শুপোর হাতে আত্মসমর্পণ করে নি—আপ্রাণ পলায়ন-প্রচেষ্টায় নিষ্ফল হয়ে তবে ধরা পড়ে।

ব্যাপারটা সবিস্তার কি?

অতি সরল। জর্মন ছাত্রছাত্রী ডিগ্রী লাভের পূর্বের তিন বৎসর ভূতের মত খাটে। কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে রবির সকাল পর্যন্ত দল বেঁধে 'পাবে' ব'সে প্রেমসে বিয়ার পান করে। এবং যেহেতু বাড়াবাড়ি না করলে খৃষ্টধর্ম মদ্যপান সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করে না, তাই কোনো কোনো ধর্মানুরাগী ছেলে ভোর সাতটার 'মেস' ( উপাসনায় ) যোগ দিতে যায় 'পাব' থেকেই, সোজা গির্জার দিকে—শনির সন্ধ্যা থেকে রবির ভোর ছ'টা, সাড়ে ছ'টা অবধি বিয়ার পান করার পর। অবশ্যই মত্তাবস্থায় নয়—তবে ইংরিজীতে যাকে বলে ঈষৎ মডলিন।

তা সে যাক। এ লেখনের বিষয়বস্তু—পুলিশ বনাম স্টুডেন্ট ( 'স্টুডেন্ট' বলতে জর্মনে একমাত্র য়ুনিভার্সিটি স্টুডেন্টই বোঝায়—স্কুলবয়কে বলে 'শুলার' )। এই দুই দলের মধ্যে হামেহাল—অবশ্য সাধারণত সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত

এবং বিশেষ করে শনির দিনগত রাতে—একটা অঘোষিত বৈরিতা বিরাজ করছে, য়ুনিভার্সিটি সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। আমি যা নিবেদন করতে যাচ্ছি তার ঐতিহাসিক পটভূমিটি কিন্তু কিংবদন্তীমূলক, অর্থাৎ পুরাণ জাতীয়। সেইটুকু সয়ে নিন। তার পরই মাল।

আমরা সকলেই জানি কতকগুলো উপাধি মানুষের নামের অচ্ছেদ্য অংশ: যেমন (১) রেভারেণ্ড, (২) কর্নেল, বা (৩) ডক্টর (শুধু চিকিৎসক অর্থে নয়; যে কোনো বিষয়ে পি এচ ডি; ডি এস সি জাতীয় ডক্টরেট পাস করা থাকলে)। প্রথম শ্রেণীর উপাধিগুলো বিধিদত্ত, দ্বিতীয়গুলো রাজদত্ত এবং তৃতীয়গুলো য়ুনিভার্সিটি-দত্ত।

রাজাতে চার্চে লড়াই বহু যুগ ধরে চলেছে। এ-লড়াইয়ে শেষের দিকে এলেন য়ুনিভার্সিটি। তার পূর্বে শিক্ষা-দীক্ষার ভার ছিল প্রধানত পাদ্রীদের হাতে। কিন্তু মহামতি লুথারের আন্দোলনের ফলে বহু পিতা পুত্রকে আর 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন' যাজক সম্প্রদায়ের কাছে মানসিক, হার্দিক এমন কি আধিভৌতিক উন্নতির জন্য পাঠাতে চাইলেন না। এ ছাড়া আরো বিস্তর কারণ ছিল, কিন্তু সেগুলো এস্থলে অবান্তর না হলেও নীরস। মোদ্দা কথা, চার্চ ও রাজার লড়াইয়ের মধ্যিখানে য়ুনিভার্সিটিগুলো তক্কে তক্কে রইল আপন আপ- স্বয়ংসম্পূর্ণ-স্বাধীনতা-স্বরাজ লাভের জন্য। তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল লুথারপন্থী এবং তাদের মূল নীতি ছিল অনেকটা—'যখন পোপের "গুরু-বাদ" ত্যাগ করে স্বয়ং স্বাধীনভাবে বাইবেল পড়তে চাও, এবং তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একমাত্র স্বাধীন চিন্তার উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করতে চাও, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দিতে হবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, (অটোনমাস ইণ্ডিপেনডেন্স)—নইলে তারা স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন বিচার-বিশ্লেষণ করবে কি প্রকারে?'

যে করেই হোক সে স্বাধীনতা য়ুনিভার্সিটি-টাউনগুলোর (অর্থাৎ যে শহরগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রধান সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান) রাস্তাঘাটেও সক্রিয় হয়ে উঠলো। অর্থাৎ নিতান্ত খুন, ধর্ষণ জাতীয় পাপাচার না করলে স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ই ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের আপন জেলে (?) পুরে দিতো—বিচারের ভার নিতেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' বা আইন, জুরিস্প্রুডেন্সের প্রফেসরগণ—'ছাত্র আসামী' এঁদেরই একজন বা একাধিকজনকে আপন উকীল নিয়োগ করতো—এবং সবকুছ ফ্রী-গ্র্যাটিস-এ্যাণ্ড-ফর্-নাথিং!

সে-সব দিন গেছে। তবু শুনেছি, হাইডেলবের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংবা অন্য কোনো একটা হতে পারে—আমার ঠিক মনে নেই—জেলখানাটি নাকি এখনো

মিউজিয়ামের মত বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এবং সেটি নাকি সত্যই দ্রষ্টব্য বস্তু।

যে-পাঠক বাঙলা ভাষার অতুলনীয় ( আমার মতে বাঙলা ভাষার 'অদ্বিতীয়' ) পুস্তক, উপেন বাঁড়ুয্যের 'নির্বাসিতের আত্মকথা' পড়েছেন, তিনি হয়তো স্মরণে আনতে পারবেন ( আমিও স্মৃতির উপর নির্ভর করে বলছি ; তাই ভুলচুক হবে নিশ্চয়ই, এবং তার জন্য মাফ চাইছি ) যে, যখন অরবিন্দ-বারীন-উল্লাস-উপেন-কানাই-সত্যেন এট আল্-এর বিরুদ্ধে আলীপুরে বোমার মামলা হয় তখন হাজতে থাকাকালীন ছোকরাদের মধ্যে যাদের অদম্য কবিত্বপ্রকাশব্যাধি ছিল. তারা লেখনীমস্যাধারাভাবাৎ কাঠকয়লা দিয়ে দেয়ালে পদ্য লিখত। তারই একটি,

'ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে পাট শরীর হইল কাঠ
সোনার বরণ হৈল কালি
প্রহরী যতেক ব্যাটা বুদ্ধিতে তো বোকা-পাঁঠা
দিনরাত দেয় গালাগালি।'

যতদূর মনে পড়ছে, 'উপীন'বাবু যেন মুচকি হেসে মন্তব্য করছেন, আহা কী 'সোনার বরণ'ই না বঙ্গসন্তানের হয়!

তারপর যা লিখছেন তার সারমর্ম ; মাঝে মাঝে দু'একটি ভালো কবিতাও চোখে পড়ত। উদাহরণ-স্বরূপ দিয়েছেন,

'রাধার দুটি রাঙা পায়ে
অনন্ত পড়েছে ধরা,
ওঠে ভাসে কত বিশ্ব
চিদানন্দে মাতোয়ারা।'

এবারে তিনি যেন তাঁর চোখে একফোঁটা জল আসতে না আসতে দুঃখ করছেন, 'হায় রে মানুষের মন! কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের ভিতরেও রাধার দু'টি রাঙা পায়ের জন্য সে আছাড় খায়।'[১]

* *

জর্মন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন যুগের আপন জেলখানার কথা হচ্ছিল। তার

১ অধীন পারতপক্ষে আপন বইয়ের বরাত দেয় না, কিন্তু এ-স্থলে নিতান্তই বাধ্য হয়ে নিবেদন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'নির্বাসিতের আত্মকথা'র উপর মল্লিখিত প্রশস্তি ময়ূরকণ্ঠীতে পশ্য। তবে অনুরোধ এই, মূল বইখানা প্রথম পড়বেন। তারপর আমার বই পড়ার প্রয়োজন আশা করি আর হবে না।

অন্যতম প্রাচীনতমের নিঃসন্দেহ সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন মার্ক টুয়েন্। সে বর্ণনাটি এমনই সব-জাতের-বাড়া চৌম্বকীয় আকর্ষণীয় বর্ণনা যে তারই টানে আমারই চেনা এক সহযাত্রী জর্মন-সীমান্তে পৌঁছেই নাক-বরাবর চলে যান ঐ জেল দেখতে—সা সুসি প্রাসাদ, ড্রেসডেনে সঞ্চিত রাফায়েলের মাদোন্না নস্যাৎ করে!

আলীপুরের যে সব 'কবিরা' প্রহরীকে পাঁঠা নাম দিয়েছেন, কিংবা চোখ বন্ধ করে রাধার দুটি রাঙা পায়ের ধ্যানে মজে গেছেন, তারা কিন্তু বিলক্ষণ জানতেন, তাঁদের জন্য মৃত্যু জেলের চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে—শহীদ হওয়ার সম্ভাবনা কবি, অকবি সকলেরই প্রায় সমান। কিন্তু জর্মন-বিশ্ববিদ্যালয়-জেলে ছাত্রেরা যেত অল্প কয়েক দিনের জন্য, ফাঁসির তো কথাই ওঠে না। তাই মার্ক টুয়েনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে অপূর্ব হাস্যরসে রঞ্জিত করে সেই জেলটির বর্ণনা দেবার। কাজেই উপস্থিত আলীপুরের কথা ভুলে যান।

* *

বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলে ফাঁসি-কাঠ না থাকতে পারে, ক্যাবারে কাঁ কাঁ'র ব্যবস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু লেখনী-মস্যাধারের অভাব!—এটা কল্পনাতীত। যদিস্যাৎ ঐ জর্মনীরই সর্বোৎকৃষ্ট দশ লিটার বিয়ার প্রসাদাৎ কল্পনাটা করেই ফেলি, তখন চোখের সামনে, বিকল্পে ভেসে উঠবে পেন্‌সিল্—এ-কথা তো ভুললে চলবে না, এদেশের কেতাবপত্রে মহামান্য কাইজারের (ভারতীয় কাইসর-ই-হিন্দ পদক, লাতিন সীজার ইত্যাদি) নাম পড়ার বহু পূর্বেই ভারতীয় ছেলেবুড়ো ব্যবহার করেছে, Koh-i-noor, made by L. & C. Hardmuth in Austria, graphite[২] drawing pencil, compressed lead.

তাই সেই পেনসিল অকৃপণ হস্তে ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্র-'কয়েদী'র দল দ্বারা বংশপরম্পরায়—সাদা দেয়ালের উপর। শুধু কবিতা না বহুবিধ অন্যান্য চীজ্!

কিন্তু তৎপূর্বে তো জানতে হয়, এরা জেলে আসতো কোন্ কোন্ 'অপরাধ' করে। এর অনেকগুলোই আমি স্বচক্ষে দেখেছি, এবং সাতিশয় সন্তোষ

---

২ এসব বাবদে জর্মনী অস্ট্রিয়া একই ধরা হয়। হিটলার নিজে অস্ট্রিয়ান হয়েও জর্মনীর ফ্যুরার হয়েছিলেন, এ সব তো জানা কথা। উভয় দেশের ভাষাও এক।

সহকারে স্বীকার করছি, সবল সক্রিয় হিস্সেদারও হয়েছি বহু ক্ষেত্রে, অর্থাৎ গুপো-স্টুডেন্টেন, পুলিশ ভর্সস্ ছাত্র 'যুদ্ধে'—কিংবা যুদ্ধ আসন্ন দেখে দ্রুততম গতিতে পলায়নে। কিন্তু সেটা অন্য অধ্যায়।

॥ ২ ॥

'পাজীটা এখনো এল না যে, ব্যাপারটা কি? বলেছিল না, তার কাকা আসছে ডান্‌ৎসিগ থেকে, ওর জন্য নিয়ে আসবে কয়েক বোতল অত্যুৎকৃষ্ট ডান্‌ৎসিগার গোল্ট্ ভাসার্ (ডান্‌ৎসিগের স্বর্ণবারি—সোমালী সোমরস), আমরা সবাই হিস্সে পাবো।'

'একটা ফোন করলে হয় না?'

'হুঁ! সেই আনন্দেই থাকো! টেলিফোন! বুড়ির বাড়িতে এখনো দড়ি টেনে ভিতরের ঘণ্টা বাজাতে হয়। ইলেকট্রিক বেল্ পর্যন্ত নেই। তবে, হ্যাঁ, গার্ল ফ্রেণ্ডদের যখন তখন আপন কামরায় নিয়ে যেতে দেয়। তদুপরি বুড়ি বদ্ধ কালা। শুনেছি, পায়ের উপর গরম ইস্ত্রিটা হঠাৎ হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছিল—শুনতে পায় নি!'

রসালাপ হচ্ছিল শনির সন্ধ্যায় 'পাব'-এ। জনসাতেক মেম্বর জমায়েৎ হয়ে একটা গোল টেবিল ঘিরে বিয়ার পান করছেন। সেটার উপর কোনো টেবিল-ক্লথ নেই। আছে গত একশ বছরের স্টুডেন্ট খদ্দেরদের নাম, যারা প্রতি শনিবারে এই টেবিলটা ঘিরে গুলতানি করেছে—ছুরি দিয়ে খোদাই করা। আমাদের পলের বাপ ভিল্ হেল্‌মের নামও এই টেবিলে আছে। সমস্ত টেবিলটা নামে নামে সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গিয়েছে—আর নূতন নাম খোদাই করার উপায় নেই।

এদের গুলতানির বর্ণনা বা ইতিহাস দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সবাই জানেন, সেই সোক্রাতেসের যুগ থেকে ইয়োরোপের গুণীজ্ঞানী থেকে চোরচোট্টা সবাই মদ্যালয়ে বসে বিশ্রম্ভালাপ করেছেন, এবং সহজেই অনুমেয়, চোরচোট্টারা প্লাতোর 'আইডিয়া'র সংজ্ঞা খুঁজতে গিয়ে ছোরাছুরি করে নি, আর সোক্রাতেস প্রতিবেশীর তালাটি কি প্রকারে নিঃশব্দে বে-কার করা যায় তাই নিয়ে মদ্যপান করতে করতে শিষ্যদের সঙ্গে কূট ষড়যন্ত্রে ত্রিযামা যামিনী যাপন করেন নি। অর্থাৎ যে যার বৈদগ্ধ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, যাতে তার চিত্তাকর্ষণ তাই নিয়ে কথাবার্তা কইতে ভালোবাসে। তবে হ্যাঁ, মদ্যপানের মেকদার

বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার বিষয়বস্তু যে ঈষৎ নিম্নস্তরে নেমে যায় সেটা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। জর্মনির স্টুডেন্টদের বেলায়ও তাই।

আমার ছিল মেজাজমর্জি অত্যন্ত খারাপ। ঠিক সেদিনই খবর পেয়েছি ইংরেজ গোল্ড স্ট্যাণ্ডার্ডকে তালাক দিয়েছে। তারই ফলে আমার কুল্লে বচ্ছরের খরচার জন্য ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার এক-তৃতীয়াংশ (বেশী হতে পারে, কমও হতে পারে, এতকাল পর সঠিক বলা কঠিন) কর্পূর হয়ে গেল। অর্থাৎ এখন যে য়ুনিভার্সিটি রেস্তোরাঁর সবচেয়ে সস্তা ডিনারটি (সে যুগে দাম ছিল এদেশী পয়সায় কুল্লে বারো আনা) খাবো, তারো উপায় রইল না। কাল সন্ধ্যা থেকে রাত্তিরের খাওয়াটা নিজেকেই রাঁধতে হবে। ওদিকে দেশের ইয়াররা ভাবছেন, 'লেখাপড়ায় আস্ত একটা গর্দভ ঐ ছেলে জর্মনি গিয়ে তোপা মজাটা লুটে নিলে, মাইরি!'

ইতিমধ্যে এসব 'পাবে' শনির সন্ধ্যায় যা-সব হয় সে-সবই হয়ে গেছে। ঠেলায় করে গরম গরম সসেজ এসেছে, দু'চারটে আনাড়ি বাজিয়ে ব্যাঞ্জোর উপর উৎপাত করে যৎসামান্য কামিয়ে গিয়েছে, পিকচার পোস্টকার্ড জুতোর ফিতে বিক্রির ছলে ভিখিরি তার রোঁদ মেরে গেল।

করে করে রাত একটা বাজলো। বিস্ময়বোধক চিহ্ন দেবার জন্য ঐ চিহ্নেরই বিন্দুটির বিন্দুবৎ প্রয়োজন নেই। শনির রাত্রি জর্মনিতে আরম্ভ হয় বারোটায় —যদ্যপি গ্রিনিজ ফয়তা ঝাড়ে ঐ সময়টায় নাকি তার পরের দিন আরম্ভ। কিন্তু রাত একটার পর সাধারণ মদ্যালয় বন্ধ। এর পর করা যায় কি? আমি বিশেষ করে তাদেরই কথা ভাবছি যাদের তখনো তেষ্টা মেটে নি—জর্মনদের বিশ্বাস তারা বিয়ার পান করে তৃষ্ণা নিবারণার্থে। সাধারণ মদ্যালয় যখন বন্ধ তখন খোলা রইল অসাধারণ মদ্যালয়। সেগুলো একটু ইয়ে অর্থাৎ বিশেষ শ্রেণীর মহিলায় ভর্তি আর কি। তবে স্টুডেন্টরা দল বেঁধে যখন সেখানে ঢুকে আপন গালগল্পে মত্ত হয় তখন ঐ পূর্বোক্ত 'ইয়েরা' ওদের জ্বালাতন দূরে থাক্ —ডিস্টার্বও করে না। ওদের পকেটে আছেই বা কি?

ইতিমধ্যে সেই যে আমাদের টেওডর যাকে নিয়ে কাহিনী পত্তন করেছি, তার হঠাৎ পুনরায় শোক উথলে উঠলো ঐ ডান্‌ৎসিগ নগরীর প্রখ্যাত স্বর্ণবারির জন্য। বার বার বলে, 'দেখলে ব্যাটার কাণ্ডখানা! রাত একটা তক্ আমাদের বসিয়ে রাখলে একটা সুরালয়ে—যখন কিনা প্রত্যেক বাপের প্রত্যেক সুপুত্তুরের কর্তব্য আপন আপন সুনির্মিত স্নেহময় নীড়ে নিদ্রাদেবীর শান্ত্যঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া।'

কে একজন বললে, 'এই খানিকক্ষণ আগেই না তুইই বললি, পেটারের

বাড়িটা আসলে অ্যাডাম এবং ঈভ তৈরী করেছিলেন ঝুরঝুরে থুরথুরে ?'

টেওডরের কিন্তু তখন কারো টিপ্পনীতে কান দেবার মত মরজি নয়—সে তখন মৌজে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে, যেন এক নবীন রিলেটিভিটি আবিষ্কার করার উৎসাহ দেখিয়ে বললে, 'আর পেটার ব্যাটা নিশ্চয়ই আরামসে ঘুমুচ্ছে। চলো, ব্যাটাকে গিয়ে জাগানো যাক।'

এস্থলে কারো পক্ষে রণে ভঙ্গ দেওয়া জর্মন-স্টুডেন্ট-মনু-শাস্ত্রে গোমাংস ভক্ষণের চেয়েও গুরুতর পাপ। তুমি তা হলে আস্ত একটা কাপুরুষ! পুলিশকে —অর্থাৎ দুশমনকে—ডরাও। তোমার কলিজা বক্‌রির, তোমার সীনা চিড়িয়ার। অতিষ্ঠ হয়ে আপনি শুধোবেন, 'রাত্রি একটাই হোক্, আর তিনটেই হোক্, কেউ কাকে জাগালে পুলিশের পূর্বতর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের কিবা ক্ষতিক্ষয়, জখম-লোকসান? ওদেশে কি রেতে-বেরেতে টেলিগ্রাফ পিয়ন আসে না?'

দাঁড়াও পাঠকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এসব ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বলা বাহুল্য রাত তেরোটার সময়—গ্রিনিজ যদিও সেটাকে দিবাভাগ বলেন —আপনি যদি বাড়ির, অবশ্য অন্য বাড়ির, দোস্ত দুশমন—যে-ই হোক্ কাউকে জাগাবার চেষ্টা করেন, তা সে সীমেন-হালেস্কে-শুকের্টের নব্যতম বিজলি-বেল্ বাজিয়েই হোক্, আর পৌরাণিক যুগীয় ঘণ্টাকর্ণ কানে যে-ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতো যাতে করে সে তার জন্মবৈরী শ্রীহরির নাম-কীর্তন শুনতে না পায়—সেই ঘণ্টাটিই বাজান, বাড়িউলী দরজা খুলে শনির রাতে ঐ জবাকুসুমসঙ্কাশ টেওডরের নয়নযুগল দেখতে পাবে—আমরা আর-সবাই না হয় পাশের গলিতে গা-ঢাকা দিয়েই রইলুম—তখন তার কণ্ঠ থেকে—ভুল বললুম, নাভিকুণ্ডলী থেকে যেসব মুরজ-মুরলীধ্বনি বেরুবে তার ঈষদ্‌তমাংশ শুনতে পেলে, ঐ যে খানিকক্ষণ আগে কি-সব 'ইয়ে'দের কথা বলছিলুম তারা পর্যন্ত নোকের সামনে নজ্জা পাবে। অতএব ঐ কবোষ্ণ অন্ধকারেও আমাদের কাছে জাজ্বল্যমান হল যে ফ্রণ্টাল এটাকের স্ট্রাটেজি বিলকুল ঔট্ অব্ ডেট্।

আমাদের হস্তে তৎসত্ত্বেও আশার একটি ক্ষীণ প্রদীপ মিদির্ মিদির্ করছে। পেটারের কামরাটা দোতলায়, এবং একদম রাস্তার উপরে। অতএব আমরা সেদিক বাগে যেতে যেতে হেথাহোথা ক্ষুদ্রাকারের নুড়ি, কাঁকর, সোডার ছিপি ইত্যাকার মারণাস্ত্র কুড়িয়ে নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে পৌঁছলুম পেটারালয়ে—বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথ দুর্গম নির্জন পেরিয়ে।

পেটার থাকে মাউস ফাডে (সার্থক নাম, বাবা,—'ইঁদুরের পথ!')।

টেওডরই আমাদের হিণ্ডেনবুর্গ বলুন, লুডেনডর্ফ বলুন, আমাদের রাইষ মার্শাল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যদিও সে পেটারের ঘরে আসে সপ্তাহে নিদেন দশ দিন, তবু তার জানলা যে ঠিক কোন্‌টা সেটা ঠাহর করতে পারছে না—আশা করি তার কারণ আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। অবশেষে হান্‌স্‌-ই লোকেট্‌ করলে জানলাটা। হান্‌স্‌ বটনির ছাত্র—পেটারের জন্মদিনে তাকে একটা অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ সাতিশয় বিরল ফণীমনসা উপহার দেয়। একটা জানলার বাইরের চৌকাঠ-পানা ফালি কাঠের উপর হান্‌স্‌ সেটি আবিষ্কার করলে—রাত্রের হিম খাওয়াবার জন্য পেটার সেটি ঐ সিল্‌ না লেজ্‌ কি যেন বলে ইংরিজীতে—তারই উপর রেখে দিয়েছিল। কালিদাসের যুগে দ্বারে আঁকা থাকতো ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন যেমন শঙ্খচক্র—হেথায় কেক্‌টাস্‌।

পয়লা রৌণ্ডে টেওডর ছুঁড়ে মারল সোডার ছিপি। লাগলো গিয়ে ডান-পাশের জানলাটায়। আমরা ফিসফিস করে পেটারকে সাবধান করতে কসুর করি নি, কিন্তু কেবা শোনে কার কথা, সে তখন জাঁদরেল জনরৈল সিং, আমরা নিতান্ত ডালভাত দাবাখেলার বড়ে-পেয়াদা। দুসরা রৌণ্ডে টেওডর বোধহয় 'ফইর' করেছিল একটা স্নো কৌটোর ঢাকনা। এটা ধন্‌-ন্‌-ন্‌ করে গিয়ে লাগলো বাঁ-পাশের জানলাটায়। আমরা তাকে কিছু বলতে যেতেই সে ধমক দিয়ে বললে, 'চোপ! এই হল আর্টিলারির আইন। প্রথম মারবে তাগের চেয়ে দূরে, তার পর তাগের চেয়ে কাছে, শেষটায় ম্যাথম্যাটিকলি মেজার করে ঠিক মধ্যিখানে।' হবেও বা। ও তো প্রাশান যুংকার ঘরের ছেলে—জানার কথা। এবং আমাদের তুলনায় তার পকেট-শস্ত্রাগার পরিপূর্ণ। কারণ আমরা জর্মনীর ধোপ-দুরস্ত রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি কীই বা এমন কামান-ট্যাঙ্ক। পক্ষান্তরে যুযুধান টেওডর ঘিনপিৎ উপেক্ষা করে 'পাবে'র সামনের 'বিন্‌' থেকে মেলা অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এনেছে। তাই এবারে ছুঁড়লে ছোট্ট একটি মার্কিং ইঙ্কের খালি শিশি। লাগলো গিয়ে তেতলার একটা জানলায়। তখন বুঝতে পারলুম জর্মনী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কেন জিততে পারে নি। দ্বিতীয়টা তখনো হয় নি। সে সময় হিট্‌লার যদি আমাকে কন্‌সল্‌ট করতো তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে বারণ করে দিতুম—বিশেষত এই অভিজ্ঞতার পর।

তার চেয়েও পষ্ট বুঝতে পারছি, টেওডর এখন যে অবস্থায় পৌঁচেছে সেখানে আপন নাক চুলকোতে চাইলে গুত্তা মারবে পিঠে। কিন্তু সে-তত্ত্বটি তখন তাকে বলতে গেলে সেই সুপ্রাচীন জর্মন কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হবে মাত্র ; এক মাতাল রাত চৌদ্দটায় বাড়ি ভুল করে বার বার চেষ্টা করছে চাবি দিয়ে সদর দরজা

খোলবার এবং সঙ্গে সঙ্গে কটুকাটব্য। সেই শব্দে শেষটায় দোতলায় একজনের ঘুম ভেঙে গেল। নিচের দিকে মাতালকে দেখে বললে, 'হেই, তুমি ভুল বাড়ির তালা খোলবার চেষ্টা করছো'। মাতাল উপরের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বললে, 'হে হে হে হে। তুমিই ভুল বাড়িতে ঘুমুচ্ছো।'

এই একতরফা লড়াই—আইনে যাকে বলে ইন্ আবসেন্শিয়া—কিংবা বলতে পারেন ডন্ কুইক্সটের জল-যন্ত্র-আক্রমণ আধঘণ্টাটাক চলার পর টেওডর ছাড়লে—বলতে গেলে তার প্রায় শেষ সিক্স্ পৌণ্ডার—সার্ডিনমাছের খালি একটা টিন। ঝন্ ঝন্ করে শব্দ হল। কিন্তু পরে মনে হয়েছিল সে যেন ওস্তাদ এনায়েৎ খানের সেতার—কারণ সঙ্গে সঙ্গে সব-কিছু ছাপিয়ে কানে গেল পুলিশের ভারি ভারি বুটের শব্দ! এটা হল কি প্রকারে? সচরাচর শানবাঁধানো রাস্তার উপর রোঁদের পুলিশের বুটের শব্দ সেই নিঝুম নিশীথে অনেক দূরের থেকে শোনা যায়, এবং টেওডর ছাড়া আমাদের আর সকলের আধখানা কান খাড়া ছিল তারই আশঙ্কায়। অতএব দে ছুট, দে ছুট! কোন্ মূর্খ বলে যুদ্ধে পলায়ন কাপুরুষের কর্ম! ইংরেজ আফ্রিদীদের সঙ্গে যুদ্ধে পালালে পর এ-দেশের জোয়ানদের বুঝিয়ে বলতো, 'এর নাম বাহাদুরীকে সাথ্ পিছে হঠনা।'

কিন্তু ছুটতে ছুটতে আমি শুধু ভাবছি, এতগুলো বুটের শব্দ এক সঙ্গে হল কি করে? রোঁদে তো বেরোয় প্রতি মহল্লায় হার্টের, sorry, হার্টলেস্ সিংগ্ল্টন। তা সে যা-ই হোক, এখন তো প্রাণটা বাঁচাই।

পূর্বেই বলেছি, পেটারের গলিটার নাম মুষিকমার্গ। আসলে কিন্তু বন্ শহরের আঁকাবাঁকা হাঁসুলি বাঁকের মোড়, পায়ের 'বেঁকি'-গয়নার প্যাঁচ-খাওয়া আড়াই বিঘৎ চওড়া নিরানব্বুইটি 'রাস্তাকেই' মুষিকমার্গ বলা যেতে পারে—তার জন্য কল্পনাশক্তিটিকে বহু সুদূরে সম্প্রসারিত করতে হয় না।

কিন্তু একটি তত্ত্ব সর্বজনবিদিত। এই গলিঘুঁচি কোথায় যে হঠাৎ বেঁকে গেছে, কোথায় যে রাস্তার একপাশে বহু প্রাচীন কালেই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত একটি কারখানার অন্ধকার অঙ্গনে অশরীরী হওয়া যায়, অর্থাৎ লুকানো যায় (হংসমিথুনের কথা অবশ্য আলাদা), কোথায় যে একটা গারাজের আংটাতে পা দিয়ে সামান্য তকলিফেই ছাতে ওঠা যায়, এ সব তথ্য পুলিশ যতখানি জানে আমরাও ঠিক ততখানিই জানি। এমন কি লেটেস্ট খবরও আমরা রাখি: অমুক দেউড়ির ঠিক সামনের রাস্তার বাতিটি বরবাদ হয়ে গিয়েছে, এখনো মেরামত হয় নি, কিংবা অমুক জায়গায় পরশুদিন থেকে এক ডাঁই পিপে জুটেছে—পিছনে দিব্য অন্ধকার। অর্থাৎ পুলিশ তার আপন হাতের তেলো যতখানি

চেনে, আমরাও আমাদের তেলো ভতখানিই চিনি।

মূষিকমার্গ ধরে খানিকটে এগোলেই সেখানে তেরাস্তা। আমাদের স্ট্র্যাটেজি অতি সনাতন, সুপ্রাচীন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'দিকে ছুট লাগালাম। আবার তেরাস্তা পেলে আবার দু' ভাগ হব। ধরা যদি পড়িই তবে দলসুদ্ধ ধরা পড়বো কেন? এবং যুদ্ধের নীতিও বটে, 'আক্রমণের সময় দল বেঁধে; পলায়নে একলা-একলি।' খুদে বন্ শহরে পুলিশ গিস্ গিস্ করে না—আর এই রাত চোদ্দটায় ফাঁড়ি-থানা ক'টাই বা স্পেয়ার করতে পারে? কাজেই প্রতি তেরাস্তায় তারা যদি আমাদেরই স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করে তবে যাদের 'মেন পাওয়ার' কম বলে, কয়েকটা রাস্তা ফোলো অপ্ করতে পারবে না বলে শেষ পর্যন্ত হয়ত কেউই ধরা পড়বে না। কিন্তু এই 'গুপো' নন্দনগণ ঘড়েল। এবম্প্রকার বহু যুদ্ধে তারা জয়ী এবং পরাজয়ী হয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে সেটা তাদের শেখায় অন্য স্ট্র্যাটেজি।

পাঠক, তুমি কখনো পোষা চিতে বাঘ দিয়ে হরিণ-শিকার দেখেছ? না দেখারই সম্ভাবনা বেশী, কারণ সেই রাজারাজড়াদের আমলেও এ খেলাটি অস্মদ্দেশে ছিল বিরল। আমাকে দেখিয়েছিলেন বরোদার বুড়ো মহারাজ।

মহারাজার খাস রিজার্ভ ফরেস্টে ছিল বিস্তর হরিণ। তাদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হত একটা পোষা, ট্রেন্‌ড্ চিতে বাঘ। বাঘ দেখা মাত্রই হরিণের পাল দে ছুট দে ছুট। এবং মাচাঙের উপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, একটু সুবিধা পাওয়া মাত্রই তারা দু' ভাগ হয়ে গেল, তার পর আবার দু' ভাগ, ফের দু' ভাগ—ক'রে ক'রে হরিণের পাল আর পাল রইল না, হয়ে গেলো চিত্তিরমিত্তির।

কিন্তু আমাদের নেকড়ে মহাশয়টিও অতিশয় সুবুদ্ধিমান। এ ভাগ, ও ভাগকে খামোখা তাড়া করে সে বর্বরস্য শক্তিক্ষয় করলো না। সে প্রথম থেকেই তাগ করে নিয়েছে একটা বিশেষ হরিণ। প্রতিবারে পাল যখন দু' ভাগ হয়, তখন সে ঐ বিশেষ হরিণটার ভাগেরই পিছন নেয়। পরে চিতার ট্রেনার আমাকে বলেছিল, 'সব চেয়ে যে হরিণটা ধুমসো, চিতে সব সময়ই একমাত্র ঐটের পিছু নেয়—এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে শক্তিক্ষয় করে না, কারণ চিতে জানে ঐটেই হাঁপিয়ে পড়বে সকলের পয়লা। ধরতে পারলে পারবে ঐটেকেই—সব সময় যে পারে তাও নয়।'

বন্ শহরের গুপো সম্প্রদায় ঠিক তাই করলে। আমাদের মধ্যে যে দুটি ছিল সব চেয়ে হোঁৎকা ওরা প্রতি দু' ভাগ হওয়ার সময় ওদেরই পিছু নিল। শেষটায়

ধরতে পেরেছিল অবশ্য একজনকে। সে কিন্তু টেওডর নয়, এবং জস্ট্ টু কীপ কম্পানি, ছুঁড়ে ছিল মাত্র নিতান্ত খুদে দু'চারটি কাঁকর। তার কথাই আপনাদের খেদমতে ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

আগের জমানায় পুলিশ তাকে দিয়ে দিত য়ুনিভার্সিটির হাতে—সে যেত য়ুনিভার্সিটির জেলে। শুনেছি, এস্তেক স্বয়ং প্রিনস আউটো এডওয়ার্ড লেওপোল্ড ফন্ বিস্‌মার্ক অবধি গেছেন। এবং সে তখন জেলের দেয়ালের উপর পেন্সিলযোগে আপন জিঘাংসা, কিংবা অনুশোচনা, কিংবা মধ্যিখানে, কিংবা কটুবাক্য—যথা যার অভিরুচি—কভু গদ্যে কভু ছন্দে, সেও কী বিচিত্র, কখনো আলেক্‌জেন্‌ড্রিয়ান কখনো—সে কথা আরেক দিন না হয় হবে—লিখতো: আমার আমলে আমাদের যেতে হত শহরের জেলে—একদিনের তরে (সেও এক মাসের ভিতর দিনটা বাছাই করে নেওয়া 'আসামী'র এক্তেয়ারেই ছেড়ে দেওয়া হত, বাইরে থেকে আপন খানা আনানো যেত, এবং যেহেতু যেসব সহযুযুধানবর্গ সে যাত্রায় পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা নেমকহারাম নন, তাঁরাই চাঁদা তুলে উত্তম লঞ্চ ডিনার বাইরে থেকে পাঠাতেন); কিংবা (ভারতীয় মুদ্রায়) সোয়া তিন টাকা জরিমানা দান—যথা অভিরুচি।

কিন্তু প্রশ্ন, এতগুলো পুলিশ সে রাত্রে হঠাৎ এক জোট হল কি করে?

খাঁটি বন্-বাসিন্দারা আমাদের যুদ্ধে নিরপেক্ষ। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট কাঁকর বা সোডার ছিপি যদি তার জানলায় লেগে গিয়ে তার নিদ্রাভঙ্গ করে তবে সে জানলা খুলে কটুবাক্য আরম্ভ করার পূর্বেই আমরা অকুস্থল ত্যাগ করি। কেউ কেউ আবার হঠাৎ এক ঝটকায় জানলা খুলে আমাদের মাথার উপর ঢেলে দেয় এক জাগ্ হিমশীতল জল। আমরা অবশ্য এজাতীয় অহেতুক উপদ্রবের জন্য সদাই সতর্ক থাকি।

কিন্তু আজ ছিল আমাদের পড়তা খারাপ। টেওডরের সক্কলের পয়লা বুলেট, বা সোডার ছিপি, যাই বলুন, পড়ে একদম পাশের ফ্ল্যাটে এক নবাগত বিদেশীর জানলায়—কেন যে বিদেশীগুলো বন-শহরটাকে বিষাক্ত করার জন্য আসে, আল্লায় মালুম—সে কিন্তু জানতো, বন্ শহরের খাস বাসিন্দারা এই (মোর্ দ্যান্) হান্‌ড্রেড্ ইয়ার ওয়ারে ভদ্র সুইটজারল্যাণ্ডের মত সেই যুদ্ধারম্ভের রাত্রি থেকেই নিরপেক্ষ, জোর কটুকাটব্য (অর্থাৎ ডিপ্লোমাটিক প্রটেস্ট)। কিংবা এক জাগ্ জল। তা সে এমন কীই বা অপকর্ম? ইউরোপীয়রা তো চান করে একমাত্র যখন জাহাজ-ডুবি হয়। জল ঢেলে সে তো পুণ্যসঞ্চয় করলো, ডাক্তারদের শ্রদ্ধাভাজন হল। কিন্তু আজকের এই বিদেশী পাপিষ্ঠটা কটুবাক্য করে নি, জল

চালে নি, করেছে কি, সে-ফ্ল্যাটে ফোন ছিল বলে চুপিসাড়ে ফাঁড়ি-থানাকে জানিয়ে দিয়েছে। ওদিকে আবার ইয়ার টেওডরের অগুনতি সখা এই শহরে। এবং বছর দুই ধরে সে প্রাগুক্ত পদ্ধতিতে শহরের এ-মহল্লায়, ও-মহল্লায় শনির রাতে—এবং সেটা যত গভীর হয় ততই উমদা—আজ একে, পরের শনিতে অন্য কাউকে জাগাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। পুলিশ বিস্তর গবেষণার পর লক্ষ্য করলো যে সর্বত্রই ওয়ার্কিং মেথড বা মডুস অপেরাণ্ডি হুবহু এক—বড় বড় ব্যাঙ্ক-ডাকাতরা যে রকম পুলিশের এই জাতীয় গভীর গবেষণার ফলেই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে। তাই তারা সেই ডেঞ্জরস্ ক্রিমিনাল টেওডরের প্রতীক্ষাতেই ছিল।

আর আপনাদের সেবক এই অধম? সে কি কখনো ধরা পড়েছিল?

॥ ৩ ॥

অধীর পাঠক! শান্ত হও, তোমার মনে কি কুচিন্তা সে আমি জানি; ইতিমধ্যে ঐ বাবদে দু'খানা চিঠিও পেয়েছি, আমার কিন্তু কিন্তু-কিন্তু ভাবটা যাচ্ছে না। আমি জানি, তোমার জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল, তাই জানতে চাও আমি কখনো ধরা পড়ে শ্রীঘরবাস করেছিলুম কিনা। আমার সে 'দুরাবস্থা'র[৩] বর্ণনা শুনে তোমার হৃদয়মনে কোন্ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হবে সেই নিয়ে আমার দুর্ভাবনা। তাহলে একটি ছোট্ট কাহিনী দিয়ে আমার সঙ্কোচটা বোঝাই।

মাত্র কয়েকদিন আগে, এই ১৬ই অগ্রহায়ণ, আমরা স্বর্গত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুদিন পালন করলুম। এঁর বহু বহু সদ্‌গুণ ছিল, তার অন্যতম, তিনি নিজে সাহিত্য নাট্য সৃষ্টি করুন আর নাই করুন সে যুগের সবাই মেনে নিয়েছিলেন যে তাঁর মত শাস্ত্রজ্ঞ রসজ্ঞ জন বাঙলা দেশে বিরল—এবং শুদ্ধমাত্র রসজ্ঞ হিসাবে অদ্বিতীয়। তাই কাঁচা পাকা সর্ব লেখকই তাঁকে তাঁদের বই পাঠিয়ে মতামত জানতে চাইতেন। ওদিকে গুরুদাস ছিলেন কর্মব্যস্ত পুরুষ। সেই ডাঁই ডাঁই বই পড়ে স্বহস্তে উত্তর লেখার তাঁর সময় কই? তাই একখানা পোস্টকার্ডে যা ছাপিয়ে নিয়েছিলেন তার মোটামুটি মর্ম এই :—'মহাশয়, আপনার

৩ এ-যুগের ছেলে-ছোকরারা বিদ্যাসাগর পড়ে না ব'লে বলতে দোষ নেই যে একদা এক পিতা-পুত্র বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে তাদের দুঃখের কাহিনী শেষ করলে এই বলে, 'আমাদের দুরাবস্থাটা দেখুন।' বিদ্যাসাগর নাকি মুচকি হেসে বললেন, 'তা সেটা আকার (আ-কার) থেকেই বুঝতে পারছি।'

পাঠানো পুস্তকের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি উহা মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি। সত্য বলিতে কি পড়িতে পড়িতে—' এখানে এসে থাকতো একটা লম্বা লাইন, এবং তার উপরে ছাপা থাকতো, 'হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই' এবং লাইনের নিচে ছাপা থাকতো 'অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।' তিনি নাকি পাঠানো বইখানা পড়ে যথোপযুক্তভাবে হয় লাইনের উপরের 'হাস্য সম্বরণ' বা নিচের 'অশ্রু সম্বরণ' কেটে দিতেন। তিনি ছিলেন অজাতশত্রু, তাই নিশ্চয়ই কোনো বদরসিক কাহিনীটির সঙ্গে আরো জুড়ে দিত যে, অধিকাংশ স্থলেই তিনি নিজে বইখানি পড়তেন না, তাঁর সেক্রেটারি সেটি পড়ে বা না পড়ে উপরের 'হাস্য' কিংবা নিচের 'অশ্রু' কেটে দিত। [৪]

তাই আমার কিন্তু-কিন্তু, তুমি লাইনের উপরের না নিচের, কোন্ বাক্যটি কাটবে—আমার কাহিনী শুনে। তা সে যাক্‌গে, বলেই ফেলি। কোন্ দিন আবার দুম করে মরে যাবো।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, চিতে বাঘ হরিণের পালের গোদাটাকেই সব সময় ধরবার চেষ্টা করে তারই পিছনে ধাওয়া করে যখন সব কটা এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে—শহরের পুলিশও ঠিক সেই রকম আমাদের মত 'পিশাচ-সম্প্রদায়ে'র সব চেয়ে হোঁৎকাটাকেই ধরবার চেষ্টা করতো, আমরা যখন তাড়া খেয়ে হরিণের টেকনিকই অনুসরণ করে ইদিকের ওদিকের গলিতে ছড়িয়ে পড়তুম। কিন্তু কিছুদিন পরে আমরা লক্ষ্য করলুম, একই গোদাকে বার বার শিকার করে পুলিশ যেন আর খাঁটি স্পোর্টসম্যানের নির্দোষানন্দ লাভ করছে না। তখন তারা দুসরা কিংবা তেসরা মোট্‌কাটাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। তাদেরও ট্রেনিং হচ্ছে, আম্মোগোরও। কখনো তারা জেতে, কখনো আমরা জিতি। সেই যে

৪ ভিক্টর য়্যুগো ( Hugo ) সম্বন্ধে বলা হয়, একবার এক অখ্যাতনামা কবি য়্যুগোকে তাঁর কবিতার বই পাঠিয়ে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে য়্যুগোর সানন্দ অভিনন্দন এসে পৌঁছল সেই কবির হাতে, তাঁর কাব্যসৃষ্টির অজস্র প্রশংসাবাদ করে য়্যুগো শেষ করেছেন এই বলে, 'হে নবীন কবি, আমি তোমাকে সাদর আলিঙ্গন করে, ফ্রান্সের কবিচক্রের আমন্ত্রণ জানাই।' তিন দিন পরে বুক-পোস্টে পাঠানো কবির সেই কবিতার বই ফেরত এল তাঁর কাছে। উপরের পিঠে পোস্ট অফিসের রবর স্ট্যাম্পে ছাপ, 'যথেষ্ট টিকিট লাগানো হয় নি বলে গ্রহণকারী বেয়ারিং হারে ফালতো পয়সা দিতে নারাজ অতএব প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠানো হল।'

গুলিখোর শিকারী বয়ান দিচ্ছিল, 'তারপর আমি তো ফইর করলুম বন্দুক, আর কুত্তাকেও দিলুম শিকারের দিকে লোলয়ে। তারপর বন্দুকের গুলি আর কুত্তাতে কী রেস্। কভী কুত্তা কভী গোলী, কভী গোলী কভী কুত্তা।' আমাদের বেলাও তাই, 'কভী ইস্টুডেন্ট কভী পুলিশ, কভী পুলিশ কভী ইস্টুডেন্ট।' আমার অবশ্য কোনই ডর ভয় ছিল না। কারণ আমি তখন এমনিতেই ছিলুম বেহদ্ রোগা টিঙটিঙে—পাঁচ ফুট সাড়ে ছ'ইঞ্চি নিয়ে একশ' পাঁচ পৌণ্ড ওজন—অর্থাৎ হোঁৎকা মোট্কা জর্মন সহপাঠীদের তুলনায় তো আধটিপ নস্যি। তদুপরি আমি সর্বদাই সুনির্মল বসুর সেই তিরস্কারটি মনে রাখি, 'বাঙালী হয়েছো, পালাতে শেখ নি।'

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই রাত্রে দেখি, পুলিশ অন্য ব্যবস্থা করেছে। এতদিন যেই আমি একা হয়ে যেতুম, পিছনে আর বুটের শব্দ শুনতে পেতুম না। সেরাত্রে দেখি, পুলিশ নিতান্ত আমাকেই ধরবার জন্য যে মনস্থির করেছে তাই নয়, আগের থেকে, বেশ সুচিন্তিত ফাইভ ইয়ারস প্ল্যানিং করে যেন জাল পেতেছে। আমি তাড়া খেয়ে যেদিকেই যাই, পিছনে তো বুটের শব্দ শুনতে পাই-ই, তদুপরি দেখি, ঐ দূরে গলির মুখে আরেকটা পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন বিরহজর্জরিত ফিলমের নায়ক প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকাকে আলিঙ্গনার্থে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আমি মহাভারত পড়েছি, জানি, এ আলিঙ্গন হবে ধার্তরাষ্ট্র। অতএব মারি গুত্তা অন্য বাগে।

অনেকক্ষণ ধরে এই খেলা চললো। ইতিমধ্যে আমি কয়েক সেকেণ্ডের তরে সব পুলিশের দৃষ্টির বাইরে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলুম একটা 'পাবে'। ঝটকা মেরে 'বার' থেকে অন্য কারো অর্ডারী এক কাপ কফি যেন ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে বসলুম, 'পাব'-এর সুদূরতম প্রান্তে। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলো একটা পুলিশ।

খাইছে। এবারে এসে পাকড়াবে। বৈদ্যরাজ চরক বলেন, 'এ অবস্থায় হরিনামের বটিকা খেয়ে শুয়ে পড়বে।'

সে কিন্তু হাঁপাতে হাঁপাতে প্রথমটায় 'বার' কীপারের মুখোমুখি হয়ে, আমার দিকে পিছন ফিরে এক গেলাস বিয়ার কিনে একটা অতি দীর্ঘ চুমুক দিলে। আমি বুঝলুম, মাইকেল সত্যই বলেছেন, সীতাদেবীকে রাবণের রাক্ষসী প্রহরিণীরা কোনো গাছতলায় বসিয়ে বেপরোয়া ঘোরাঘুরি করতো,

'হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে'

গদ্যময় ইংরিজীতে যাকে বলে নিতান্তই 'ক্যাট অ্যাণ্ড মাউস প্লে'। বরঞ্চ

রবীন্দ্রনাথেরটাই ভালো, 'এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে শিকারী বিড়ালের খেলা'।

এবারে সে গেলাস হাতে করে 'বার'-এর দিকে পেছন ফিরে আমার দিকে মুখ করে তাকাল।

আমিও অলস কৌতূহলে একবার তার দিকে তাকালুম। 'পাব'-এ নূতন নিরীহ খদ্দের ঢুকলে যেরকম অন্য নিরীহ খদ্দের তার উপর একবার একটি নজর বুলিয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরায়।

আমি যদিও তখন মাথা নিচু করে কাপের দিকে তাকিয়ে আছি—যেন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে বৈজ্ঞানিক অণুপরমাণু পর্যবেক্ষণ করছেন—তবু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, লোকটা কি ভাবছে। তারপর শুনলুম, 'গুটে নাখট্'। আমি মাথা তুলে দেখি পুলিশ তার বিয়ার শেষ করে 'পাব'ওলাকে 'গুড নাইট' জানিয়ে চলে যাচ্ছে। (জর্মনীর অলিখিত আইন, 'বিয়ার খাবে ঢক ঢক করে, ওয়াইন খাবে আ-স্তে, আ-স্তে।')

ঠিক বুঝতে পারলুম না কেন? তবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম বলি নি। এদের তো রাবণের গুষ্টি। এবার যিনি আসবেন, তিনি এঁয়ার মত বাপের সুপুত্তুর নাও হতে পারেন। আবার বাইরে যাবারও উপায় নেই। জাল গুটিয়ে সবাই চলে গেছেন, না ঘাপটি মেরে বসে আছেন, কে জানে?

ঘণ্টাখানেক পর যখন 'পাব' নিতান্তই বন্ধ হয়ে গেল, তখন দেখি সব ফাঁকা। তবু সাবধানের মার নেই। অকুস্থলের উল্টো মুখে রওয়ানা দিয়ে অনেকখানি চক্কর খেয়ে বাড়ি ফিরলুম 'তড়পত হুঁ জৈসে জলবিন মীন' হয়ে।

* *

তার দু-তিনদিন পর সকালবেলা যখন পাত্তাড়ি নিয়ে য়ুনি (ভার্সিটি) যাচ্ছি, তখন একজন পুলিশ হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে বুটের গোড়ালি গোড়ালিতে ক্লিক্ করে আমাকে সেলুট দিলে। আমি হামেশাই পুলিশের সামনে ভারী সুবিনয়ী—বার তিনেক 'গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন গুটেন মর্গেন' বললুম, যদ্যপি একবারই যথেষ্ট।

কোন প্রকারের লৌকিকতা না করে সোজা শুধোলে, 'তুমি ইণ্ডিয়ান?'

তালেবর পুলিশ মানতে হবে! বলেছে 'ইণ্ডার'। 'ইণ্ডিয়ানার' বা রেড ইণ্ডিয়ান বলে নি। এদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকও সে পার্থক্যটি জানে না। বললুম, 'হ্যাঁ।'—

শুধোলে, 'এখান থেকে ইণ্ডিয়া কতদূর?'

আমি বললুম, 'এই হাজার পাঁচেক মাইল হবে। সঠিক জানি নে, তবে

জাহাজে যেতে ১২।১৩ দিন লাগে।'

বললে, 'বাপ-মা এই পাঁচ হাজার মাইল দূরে পাঠিয়েছে বাঁদরামি শেখবার জন্যে ?'

এতক্ষণে আমার কানে জল গেল। বুঝলুম, উইথ রেফারেন্স্ টু দি কনটেকসট যে, লোকটা সেই রাত্রের আমাদের দলের দুষ্কর্ম এবং পরবর্তী লুকোচুরির কথা পাড়ছে। আমি তবু নাক-টিপলে-দুধ-বেরোয়-না গোছ হয়ে বললুম, 'কিসের বাঁদরামি ?'

জর্মনে 'ন্যাকা' শব্দের ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ নেই। কিন্তু যে কটি শব্দ পুলিশম্যান প্রয়োগ করলে তার অর্থ ঐ দাঁড়ায়। তারপর নামলো সম্মুখসমরে। বললে, 'সেরাত্রে কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখের আড়াল হয়ে যেতে পেরেছিলে বলে তোমাকে ধরি নি। এবারে কিন্তু ছাড়বো না।'

'অনেক ধন্যবাদ !' তারপর আমিও রণাঙ্গনে নেমে বেহায়ার মত বললুম, 'সে দেখা যাবে।'

যেন একটু দরদী গলায় বললে, 'কিন্তু কেন, কেন এসব করো ?'

আমিও তখন একটু নরম গলায় বললুম, 'এদেশে কি শুধু য়ুনিতে পড়তেই এসেছি ? ওদেশে বসেও তো এ-দেশের বই কিনে পড়া যায়। আমি এসেছি সব শিখতে, আর-সব স্টুডেণ্টরা যা করে, তাই করি।'

'সব ছেলে এরকম বাঁদরামি করে ?'

আমাকে বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হল সবাই করে না।

'তবে ?'

তখন বললুম, 'ব্রাদার, শোনো। এই স্টুডেণ্ট বনাম পুলিশ লড়াই সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে হাইডেলবের্গে। এখানে আরম্ভ হয় ১৭৮৬তে। তারপর কয়েক বছর য়ুনি বন্ধ ছিল—কেন, সঠিক জানি নে, বোধ হয় নেপোলিয়ন তার জন্য দায়ী—ফের য়ুনি খোলার সঙ্গে সঙ্গে ১৮১৮ থেকে। এবারে তুমিই কও, বুকে হাত দিয়ে, এই আমরা আজ যারা স্টুডেণ্ট, আমরা যদি আজ লড়াই ক্ষান্ত দি তবে ভবিষ্যৎ-বংশীয় স্টুডেণ্টরা ইতিহাসে লিখে রাখবে না "অতঃপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এক দল কাপুরুষ ছাত্র আগমনের ফলে—তাহাদের মধ্যে একটা অপদার্থ ইণ্ডিয়ানও ছিল—সেই সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়—স্টুডেণ্টরা পরাজয় স্বীকার করিয়া লইল।" তারপর ভারতীয় নাটকীয় পদ্ধতিতে 'হা হতোস্মি হা হতোস্মি' করার পর বললুম, 'এই যে মহাকবি হাইনে, তিনি পর্যন্ত এখানে—'

এই করলুম ব্যাকরণে ভুল। বাধা দিয়ে শুধোলে, 'তুমি তার মত কবিতা লিখতে পারো ?'

নিশারণে সে জিতেছিল না আমি জিতেছিলুম, সেটা সমস্যাময়, সেটাকে 'ড্র' বললেও বলা যেতে পারে, কিন্তু দিবাভাগে এই তর্ক-যুদ্ধে আমি হার মেনে বললুম, 'বাকিটা আর একদিন হবে, ব্রাদার। এখন তোমার নামটা বলো। সেই শনির রাত্রে যেখানে আমাদের প্রথম চারি চক্ষুর মিলন হয়েছিল সেখানেই দেখা হবে। আমি ফোন করে ঠিক করে নেব। এখন চলি, আমার ক্লাস আছে।'

সে হেসে যা বললে সেটাকে বাঙলায় বলা চলে, 'ডুডু খাবে টামাকও ছাড়বে না।'

* *

এবারে ধরতে পারলে ছাড়বে না—সে তো বুঝলুম। ওদিকে এক মাস পরে আমার পরীক্ষা। তিনটে ভাইভা। শনির রাত জেগে তামাম রব্বার শুধু মুখস্থ আর মুখস্থ। হাসি পায় যখন এদেশে শুনি, এখানে বড্ড বেশী মুখস্থ করানো হয়; মুখস্থ না করে কে কবে কোন্ দেশে কোন্ পরীক্ষা পাশ করেছে। তা সে পেসতালদ্জির দেশেই হোক আর ফ্রোবেলের দেশ, এই জর্মনিতেই হোক। তাই আমাকে আর যুদ্ধে না ডেকে আমাদের ফীলড মার্শেল আমাকে রিজার্ভে রাখলেন। মাত্র এক রাত্রে ডাক পড়েছিল, তবে সেটা শহরের অন্য প্রান্তে। আর এক দিন, সেই দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ-পোটির সঙ্গেই একটা 'পাব'-এ বসে দু-দণ্ড রসালাপ করেছিলুম। লোকটি সত্যই অমায়িক।

* *

এদেশে পরীক্ষার পূর্বে এত সাতান্ন রকমের কাগজপত্র মায় থীসিস্ ডীনের দফ্তরে জমা দিতে হয় যে, সবাই শরণ নেয় আন্কোরা হালের যে দু'দিন আগে পাস বা ফেল করেছে। তারাই শুধু এসব হাবিজাবির লেটেস্ট খবর রাখে। সে রকম দুজনা অনেকক্ষণ ধরে বসে, দফে দফে, একাধিক বার মিলিয়ে নিয়ে এক বাণ্ডিল কাগজ, ফর্ম, সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে বললে, 'এইবারে যাও বৎস, ডীনের দফ্তরে। সব মিলিয়ে দিয়েছি। আর, শোনো, সব কাগজের নিচে রাখবে একখানা পাঁচ মার্কের (তখনকার কালে পাঁচ টাকার একটু কম) নোট। এটা কেরানীর অন্যায্য প্রাপ্য—কিন্তু পূর্ণ শত বৎসরের ঐতিহ্য।'

দুরু দুরু বুকে—প্রায় নার্ভাস ব্রেক ডাউনের সীমান্তে পৌঁছে—দাঁড়ালুম গিয়ে ডীনের দফ্তরে, কাউন্টারের সামনে। পাঁচ টাকার চেয়ে বেশীই রেখেছিলুম।

যে কেরানী এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন তাঁর এ্যাব্বড়া হিণ্ডেনবুর্গী গোঁফ, আর

বয়েসে বোধ হয় তিনি মুনির সমান। সাতিশয় গম্ভীর কণ্ঠে আমার গুড্ মর্নিঙের কি একটা বিড়বিড় করে উত্তর দিয়ে দফে দফে কাগজ গুনলেন, টাকাটা কি কায়দায় যে সরালেন ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। কিন্তু মুখে হাসি ফুটলো না। বরঞ্চ গম্ভীর কণ্ঠে গম্ভীরতর করে শুধোলেন, 'অমুক সার্টিফিকেটটা কই ?'

আমি তো সেই দুই যোগানদারদের উপর রেগে টঙ্। পই পই করে আমি শুধিয়েছি, ওরা আরো পই পই করে বলেছে, সব কাগজ ঠিকঠাক আছে, এখন এ কা গেরো রে বাবা! বুঝলুম, কি একটা সার্টিফিকেট আনা হয় নি। কিন্তু সে সার্টিফিকেট কিসের, কোনোই অনুমান করতে পারলুম না। যোগানদারদের মুখেও শুনি নি।

ভয়ে ভয়ে শুধালুম, 'কি বললেন, স্যর!'

এবার যেন নাভিকুণ্ডুলি থেকে কৈয়াজখানি কণ্ঠে কি একটা বেরুলো।

গুরু-মুর্শীদ, ওস্তাদ-মুরুব্বীদের আশীর্বাদ-দোওয়া আমার উপর নিশ্চয়ই ছিল; হঠাৎ অর্থটা মাথার ভিতরে যেন বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে আপন অজান্তে এক গাল হেসে বলে ফেলেছি, 'চেষ্টা তো দিয়েছি, স্যর, দু বচ্ছর ধরে প্রায় প্রতি শনির রাত্রে—মাফ করবেন স্যর—বলা উচিত রবির ভোরে। তা ওরা ধরতে না পারলে আমি কি করবো ? বললে পেত্যয় যাবেন না, স্যর—'

ইতিমধ্যে বুড়ো হঠাৎ ঠাঠা করে হেসে উঠেছেন। যেমন তাঁর গাম্ভীর্য তেমন তাঁর হাসি। বিশেষ করে তাঁর বিরাট গোঁপ জোড়ার একটা দিক নেমে যায় নিচে, তো অন্যটা উঠে যায় উপরের দিকে। সে হাসি আর থামে না। ইতিমধ্যে ছোকরা কেরানীরাও হাসির রগড় দেখে তাঁর চতুর্দিকে এসে দাঁড়িয়েছে। এবারে থেমে বললেন, 'ধরা দেবার চেষ্টা করলে, আর ওরা ধরতে পারলো না, এটা কি রকম কথা ?'

আমি বললুম, 'যে-পুলিশ আরেকটু হ'লে ধরতে পারতো, তাকে সাক্ষী স্বরূপ হাজির করতে পারি যে, আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি, এই জেলে যাবার সার্টিফিকেট যোগাড় করার।'

সংক্ষেপে বললেন, 'খুলে কও।'

আমি সেই প্রকৃতির লোক যারা নার্ভাস ব্রেকডাউনের ভাঙন থেকে পড়ি-পড়ি করতে করতে বেঁচে গিয়ে হঠাৎ নিষ্কৃতি পেয়ে হয়ে যায় অহেতুক বাচাল—সেও আরেক রকমের নার্ভাস্‌নেস্। গড় গড় করে বলে গেলুম, পুলিশের সেই জাল পাতার কাহিনী—বিশেষ করে আমার উপকারার্থে—'পাব'-এর ভিতরকার বয়ান

ও সর্বশেষে সেই পুলিশম্যানের সঙ্গে পথিমধ্যে আমার যম-নচিকেতা কথোপকথন। বক্তৃতা শেষ করলুম, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'এর পর এই পরীক্ষার পড়া নিয়ে বড্ড ব্যস্ত ছিলুম বলে সলিড্ কিছু করে উঠতে পারি নি, স্যর। শুধু ঐ যে, দিন পনেরো আগে হঠাৎ এক সকালে দেখা গেল লর্ড মেয়ারের বিরাট দফতরের উচ্চতম টাওয়ারে একটা ছেঁড়া ছাতা বাঁধা, বাতাসে পৎপৎ করছে, ফায়ার ব্রিগেড পর্যন্ত নামাতে পারে নি, ঐ উপলক্ষে অধীন কিঞ্চিৎ, অতি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে—'

একজন ছোকরা কেরানী আঁতকে উঠে বললে, 'সর্বনাশ! ওটার তালাশী যে এখনো শেষ হয় নি!'

বুড়ো বললেন, 'আমরা তো কিছু শুনছি না।'

বুড়োর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরুতে গেলে তিনি কাউন্টারের ফ্ল্যাপ্‌টা তুলে আমার সঙ্গে দোর পর্যন্ত এলেন—পরে শুনলুম, এ-রকম বিরল সম্মান ইতি-পূর্বে নাকি মাত্র দু'একজন বিদেশীই পেয়েছেন। আমি কিছু শুধাবার পূর্বেই তিনি যেন বুঝতে পেরে তাঁর মাথাটি আমার কানের কাছে নিচু করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আঙুলের ডগা বুকে ঠুকে ঠুকে ফিস ফিস করে বললেন, 'আমি তিনবার, আমি তিনবার!' তারপর অত্যন্ত সিরিয়াসলি শুধোলেন, 'বছর তিনেক পূর্বে এক ডাচ্ স্টুডেন্ট বললে—বুঝতেই পারছো, এ রসিকতাটা আমি শুধু বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গেই করে থাকি, সুদ্দু মাত্র জানবার জন্য, তারা কতখানি সত্যকার জর্মন ঐতিহ্যের য়ুনি ছাত্র হতে পেরেছে—স্টুডেন্টরা নাকি ক্রমেই হারছে!' কণ্ঠে রীতিমত আশঙ্কার উৎপীড়ন।

আমি তাঁর প্রসারিত হাত ধরে হ্যাণ্ডশেক করতে করতে বললুম, 'তিন বছর পূর্বে, ইয়া। কিন্তু তারপর জানেন তো, আমি আর আপনার মত মুরুব্বীকে কি বলবো, কৃষ্ণতম মেঘেরও রূপালী সীমন্তরেখা থাকে—এল জর্মনিতে অভূতপূর্ব বিরাট বেকার সমস্যা, যেটা এখনও চলছে। ফলে ছেলেরা ম্যাট্রিক পাস করে এদিক ওদিক কাজে ঢুকতে না পেরে বাধ্য হয়ে ঢুকছে য়ুনিতে, আগে যেখানে ঢুকতো একজন, এখন ঢোকে দশজন। ওদিকে সরকারের পয়সার অভাবে পুলিশের গুষ্টি না বেড়ে বরঞ্চ কমতির দিকে। আমরা এখন দলে ভারি। বস্তুতঃ আমরা এখন নিশাচরবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্বক দিবাভাগেই তাদের সম্মুখ-সমরে আহ্বান করতে পারি—করি না, শুধু শতাধিক বৎসরের ঐতিহ্য ভঙ্গ হবে বলে।' তারপর একটু থেমে গম্ভীরতর কণ্ঠে বললুম, 'আর যদি কখনো সে দুর্দিনের চিহ্ন দেখি, তবে সেই সুদূর ভারত থেকে ফিরে আসবো—আমি। সামনের পরীক্ষায়

পাস করি আর ফেলই মারি, সেই পরাজয় প্রতিরোধ করার জন্ত য়ুনিতে ঢুকে ছাত্র হব আবার—আ মি।'

'আম্মো।' ॥

## রাসপুতিন

এক একটা দুঃখ মানুষ আমৃত্যু বয়ে চলে। আমার নিজের কথা যদি বলার অনুমতি দেন, তবে নিবেদন করি, অধ্যাপক বগ্‌দানফের আমাকে বলা তাঁর নিজের জীবনের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আমি যে কেন তখনই লিখে রাখি নি সেই নিয়ে আমার শোক, এবং এ-শোক আমার কখনো যাবে না। তারই একটি ১৯১৭-র কম্যুনিস্ট বিপ্লব। তিনি অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং সমস্ত ঘটনাটি বর্ণন করতে তাঁর লেগেছিল পুরো ন'টি ঘণ্টা। শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ইস্কুলের শোবার ঘণ্টা পড়ে রাত ন'টার সময়; আমি কলেজে পড়তুম বলে অধ্যাপকের ঘরে ঐ সময়ে যেতে কোনো বাধা ছিল না। পর পর তিন রাত্রি ধরে রাত বারোটা-একটা অবধি তিনি আমাকে সে ইতিহাস বলে যান। অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন, ঐ যুগপরিবর্তনকারী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তর প্রামাণিক পুস্তক লেখা হয়ে গিয়েছে এবং অধ্যাপক বগ্‌দানফের পাঠটা খোয়া গিয়ে থাকলে এমন কাই বা ক্ষতি। হয়তো সেটা সত্য, কিন্তু ঐ বিষয়ে আমি যে কটি সামান্য বই পড়েছি তার সব কটাই বড়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক। বগ্‌দানফ তাঁর কাহিনী বলেছিলেন একটি ষোল বছরের ছোকরাকে—ঘটনার মাত্র চার-পাঁচ বৎসর পরে এবং সেটি তিনি তাই করেছিলেন সেই অনুযায়ী রসময়, অর্থাৎ সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ। এস্থলে বলে রাখা প্রয়োজন মনে করি, অধ্যাপকের বর্ণনভঙ্গিটি ছিল অসাধারণ, তাই পরবর্তী যুগে তাঁর ইরান ও আফগানিস্থান (এ দুটি দেশে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন) সম্বন্ধে লিখিত গবেষণামূলক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধরাজি পণ্ডিত-মণ্ডলীতে সাহিত্যিক খ্যাতিও পায়। মাতৃভাষা রাশানে তিনি লিখেছেন কমই—তাঁর পাণ্ডিত্যপ্রকাশ-যুগে রাশাতে এ ধরনের গবেষণার কোনোই মূল্য ছিল না বলে সেগুলো সেখানে ছাপানোই ছিল অসম্ভব। তিনি প্রধানত লেখেন ফরাসী ইংরাজী ও ফার্সীর মাধ্যমে। এবং সব চেয়ে বেশী সম্মান পান ফার্সী পণ্ডিতজন মধ্যে।[১]

১ এঁর উল্লেখ শ্রীযুত প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র-জীবনীতে' করেছেন। আমিও 'দেশে-বিদেশে' বইয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছি

তিনি যে দ্বিতীয় কাহিনী বলেন, সেটি রাসপুতিন সম্বন্ধে। প্রথমটির তুলনায় এটি অনেক হ্রস্ব। রাসপুতিনকে নিহত করা হয়, পুরনো ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ১৬ই ডিসেম্বর, নতুন ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ৩০ ডিসেম্বর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে। এর প্রায় কুড়ি বৎসর পর রাসপুতিনকে নিয়ে আমেরিকায় একটি ফিল্‌ম্‌ তৈরী হয় (এবং আমার যতদূর মনে পড়ে লায়োনেল বেরিমোর রাসপুতিনের অংশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন) এবং ঐ সময় রাসপুতিন-হন্তা রাশার শেষ জারের নিকটাত্মীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসুপফ (আরবী হীব্রুতে ইউসুফ, ইংরিজীতে জোসেফ) ইয়োরোপে। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের মধ্যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী সেই সব ভাগ্যবানদের দুজনা, যাঁরা প্রাণ নিয়ে রাশা থেকে পালাতে সক্ষম হন। তিনি লণ্ডন আদালতে মোকদ্দমা করেন ফিল্‌ম্‌ নির্মাতাদের (বোধ হয় M G M) বিরুদ্ধে যে, তাঁরা যে ফিল্‌মে ইঙ্গিত দিয়েছেন, রাসপুতিন তাঁর অর্থাৎ ইউসুপফের স্ত্রীকে পর্যন্ত তাঁর কামানলের দিকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি মোকদ্দমাটি হেরে যান বটে, কিন্তু ঐ মোকদ্দমাটি তখন এমনই cause celebre কজ্‌ সেলেব্র রূপে—যেমন আমাদের ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মোকদ্দমা—প্রখ্যাতি লাভ করে যে তার অল্প দু'এক বৎসর পর ঐ মোকদ্দমায় প্রধান অংশগ্রহণকারী একজন উকিল মোকদ্দমাটি সম্বন্ধে একটি প্রামাণিক—এবং আমি বলবো—সাহিত্যিক উচ্চপর্যায়ের প্রবন্ধ লেখেন। তিনি যদিও ইউসুপফের বিরুদ্ধ পক্ষের উকিল ছিলেন, তবু আদালতে ইউসুপফ দম্পতির খানদানী সৌম্য আচরণের অকৃপণ প্রশংসা করেন। তারপর হয়তো আরো অনেক কিছু ঘটেছিল কিন্তু তার খবর আমার কানে পৌঁছয় নি। হঠাৎ গত মাসের 'আনন্দবাজারে'র এক ইস্যুতে দেখি, ইউসুপফ ফের মোকদ্দমা করেছেন—এবার কিন্তু আমেরিকায়, কলাম্‌বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে রাসপুতিন ও তাঁর জীবন নিয়ে নাট্যপ্রচার করার জন্য—এবং আবার মোকদ্দমা হেরেছেন। সেই সুবাদে আমার মনটা চলে গেল ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দে, যখন অধ্যাপক বগ্‌দানফ রাসপুতিন-কাহিনী আমাকে ঘণ্টা তিনেক ধরে শোনান।

পরবর্তী যুগে ফিল্‌ম্‌ বেরুলো, তার পর লণ্ডনের উকিল তাঁর বক্তব্য বললেন, এবং 'আনন্দবাজার' বিদেশ থেকে যে সংবাদ পেয়েছেন, তা-ই প্রকাশ করেছেন। এদের ভিতর পরস্পর বিরোধ তো রয়েইছে, কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ-স্থলে আসল বক্তব্য এই যে, বগ্‌দানফ বলেছিলেন, সম্পূর্ণ না হোক্‌ অনেকখানি ভিন্ন কাহিনী। আমি আদৌ বলতে চাই নে, তাঁর বিবরণী, জবানী বা ভার্শন—যাই বলুন—সেইটেই নির্ভুল আপ্তবাক্য; বস্তুত তিনি নিজেই আমাকে বার বার

বলেছিলেন, 'মাই বয়্! সেন্ট পেটেরসবুর্গে তখন এত হাজারো রকমের গুজোব নিত্য নিত্য ডিউক সম্প্রদায় থেকে আস্তাবলের ছোকরাটা পর্যন্ত গরমাগরম এ-মুখ থেকে ও-মুখ হয়ে রাশার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে যে আমারটাই যে অভ্রান্ত সেই বা বলি কোন্ সাহসে ? তবে এটা সত্য আমার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ "টেক্স্ট্-ক্রিটিসিজ্ম্"—তখনো ছিল, এখনো আছে—অর্থাৎ কোনো পুস্তকের পেলুম তিনখানি পাণ্ডুলিপি, তাতে একাধিক জায়গায় লেখক বলেছেন পরস্পরবিরোধী তিনরকম কথা। আমার কাজ, যাচাই করে সত্য নিরূপণ করা, কিংবা সত্যের যতদূর কাছে যাওয়া যায় তারই চেষ্টা দেওয়া। অতএব, বুঝতেই পারছো, রাসপুতিন সম্বন্ধে গুজোবগুলো আমি সরলচিত্তে গোগ্রাসে গিলি নি, আমার বুদ্ধিবিবেচনা প্রয়োগ করে যেটা সর্বাপেক্ষা সত্যের নিকটতম সেইটেই বলছি।'

অধ্যাপক রাসপুতিনের প্রথম জীবনাংশ সংক্ষেপে সারেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই চাষী পরিবারের ছেলে রাসপুতিনের জন্ম সাইবেরিয়াতে। 'রাসপুতিন' তাঁর আসল নাম নয়—সেটা পরে অন্য লোকে তাঁর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, বিশেষ করে কামাদি ব্যাপারে, জানতে পেরে তাঁর উপর চাপায়। লেখাপড়ার চেষ্টা তিনি ছেলেবেলায় কিছুটা দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেদিকে ছিলেন, ক্লাসের মামুলী চাষার ছেলেরও অনেক নিকৃষ্ট। এর পর তিনি তাঁর সমাজের ভদ্রঘরেই বিয়ে করেন—আর পাঁচটা ছেলের মত। কিন্তু তার কিছুকাল পরেই হঠাৎ তাঁর ঝোঁক গেল 'ধর্মে'র দিকে, কিন্তু প্রচলিতার্থে আমরা ধর্মাচরণ বলতে যা বুঝি সেদিকে নয়। হিন্দু ধর্মে যে-রকম একাধিক মতবাদ, শাখা-প্রশাখা—রশের প্রচলিত (অর্থডক্স) সনাতন খৃষ্টধর্মেও তাই। তারই একটার দিকে আকৃষ্ট হলেন গ্রেগরি (রাসপুতিন)। এস্থলে উল্লেখ প্রয়োজন বলে মনে করি, অধ্যাপক বগ্দানফ ছিলেন অতিশয় 'গোঁড়া'—আমি সজ্ঞানে শব্দটি ব্যবহার করছি—রাশার সরকারী ধর্ম 'গ্রীক অর্থডক্স' চার্চে বিশ্বাসী এবং আচারনিষ্ঠ খৃষ্টান। শান্তিনিকেতনে তাঁর কামরায় (তখনকার দিনের অতিথিশালা, এখন বোধ হয় 'দর্শন-ভবন') দেয়ালে ছিল ইকন এবং তার নিচে অষ্টপ্রহর জ্বলন্তো মঙ্গলপ্রদীপ এবং তারই নিচে তিনি অহরহ দাঁড়িয়ে স্বদেহে আঙুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন অঙ্কিত করতে করতে—ঠিক আমাদের বুড়িদের মত—বিড়বিড় করে দ্রুতগতিতে মন্ত্রোচ্চারণ করতেন। বলা বাহুল্য রাসপুতিন যে খ্লিস্তি (khlisti) সম্প্রদায়ে প্রবেশ করলেন সেটাকে অধ্যাপক অপছন্দ করতেন। এ সম্প্রদায় উন্মত্ত নৃত্য, সংগীত (এবং লোকে বলে যৌনাভিচার) ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাত্মাকে মানবাত্মায় অবতীর্ণ করিয়ে স্বয়ং পরমাত্মায় পরিবর্তিত হওয়ার চেষ্টা

করে। এ মার্গ বিশ্বসংসারে কিছু আজগুবী নূতন চীজ নয়। তবে এঁরা বলতে কসুর করতেন না যে, স্ত্রী পুরুষের যৌনসম্পর্ক সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন, অর্থাৎ এ বাবদে কে কি করে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। রাসপুতিন এটাকে নিয়ে গেলেন তার চরমে। তিনি প্রচার করতে লাগলেন, 'পাপ না করলে ভগবানের ক্ষমা পাবে কি করে? অতএব পাপ করো!' এ ছাড়া তাঁর আরেকটি বক্তব্য ছিল, তিনি পরমাত্মার অংশাবতার, এবং তাঁর সঙ্গে দেহে মনে আত্মায় আত্মায় যে কেউ সম্মিলিত হবে তারই চরম মোক্ষ তদ্দণ্ডেই। তাঁর শিষ্যাগণের সঙ্গে তাঁর সেই সম্মিলিত হওয়াটা কোন্ পদ্ধতিতে হতো সেটা বলতে শ্লীলতায় বাধে, এবং একথা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে তিনি তাঁর শিষ্য-শিষ্যাগণকে নিয়ে একই কামরায় যে সব 'সম্মেলন' ঘটাতেন সেটা শুধু তিনি নিজেতেই সীমাবদ্ধ রাখতেন না, শিষ্য-শিষ্যাগণ নিজেদের মধ্যেও সম্মিলিত হতেন। ইংরিজীতে একেই 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়া' ইত্যাদি বলে থাকে।

এটা সত্য, রাসপুতিনের কথা আমিই উত্থাপন করেছিলুম এবং অধ্যাপকও রাসপুতিন সম্বন্ধে তাঁর যা জানা ছিল সেটি সবিস্তর বলেছিলেন, কিন্তু তিনি রাসপুতিনের ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর পূর্ণ বক্তব্যের প্রায় অর্ধাংশ ব্যয় করেন ঐ সম্প্রদায় নিয়ে, এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্মে কোথায় কোথায় এ-প্রকারের 'অর্জি' স্বীকৃত এবং কার্যে পরিণত হয়েছে তাই নিয়ে। এ বাবদে তাঁর শেষ বক্তব্য আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে: ধর্মের নামে এ ধরনের অনাচার কেন যুগে যুগে হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিংবা গোপনে গোপনে বিশেষ কয়েকটি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে প্রাচীন ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখে, এ তত্ত্বটি সাতিশয় গুরুত্ব ধারণ করে এবং এর অধ্যয়ন প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্মশাস্ত্রীয় পুস্তক অধ্যয়ন করে হয় না, এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন নৃতত্ত্ব এবং পরে সমাজতত্ত্বের গভীর অধ্যয়ন (এর পূর্বে Anthropology ও Sociology এ দুটো শব্দ আমি কখনো শুনিই নি)।

আমি তখন বুঝতে পারি নি, পরে পারি যে আর পাঁচজনের মত তিনিও রাসপুতিনের রগরগে কাহিনী কীর্তন করতে প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ওরই মাধ্যমে—ফাঁকি দিয়ে শটকে শেখানোর মত—আমাকে সাধারণ ভারতীয় ছাত্রের পাঠ্যবস্তুর গণ্ডি থেকে বের করে পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বলা বাহুল্য, এসব আমার সম্বন্ধে নিছক ব্যক্তিগত কথা হলে আমি এগুলো উল্লেখ করতুম না, আমার অন্যতম উদ্দেশ্য, এই সুবাদে তখনকার দিনের স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-চালিত বিশ্বভারতীর (স্কুল ও কলেজ—যথাক্রমে 'পূর্ব' ও 'উত্তর বিভাগ') অধ্যাপকগণ

কি প্রকৃতি ধারণ করতেন তারই যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন।

অধ্যাপক বলেছিলেন, এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ অবাধে করা যাচ্ছে এবং তদুপরি সেটা ধর্ম নামে প্রচারিত হচ্ছে, এটা যে জনপ্রিয় হবে—অন্তত জনগণের অংশবিশেষে—সেটা তো অতিশয় স্বাভাবিক। কিন্তু এই যে এক অজানা-অচেনা অর্ধলুপ্ত খ্লিস্তি সম্প্রদায় হঠাৎ নবজীবন লাভ করে খুদ জারের প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল, এটা তো আর একটা আকস্মিক অকারণ কর্তাবিহীন কর্ম নয়। এরকম একটা নবআন্দোলন আনয়নকারী পুরুষের কোনো-না-কোনো অসাধারণ গুণ, আকর্ষণ বা সম্মোহনশক্তি থাকা নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

পূর্বেই বলেছি, অধ্যাপক ছিলেন কট্টর 'অর্থডক্স্ গ্রীক চার্চ'-এর অন্ধ ভক্ত। কিন্তু এস্থলে এসে তিনিও স্বীকার করলেন, রাসপুতিন একাধিক অলৌকিক শক্তি ধারণ করতেন। তিনি যে কঠিন কঠিন দুরারোগ্য রোগ, কোনো প্রকারের ঔষধ প্রয়োগ না করে প্রশম করতে পারতেন সেটারও উল্লেখ করলেন। কি প্রকারে? কেউ জানে না।

ইতিমধ্যে জার-প্রাসাদের উপর মৃত্যু যেন তার করাল ছায়া বিস্তার করেছে। হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে বালক যুবরাজ আহত হন। তাঁর রক্তক্ষরণ আর কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। ভিয়েনা বার্লিন থেকে বড় বড় চিকিৎসক এসেছেন। আমি অধ্যাপককে শুধিয়েছিলুম, 'চিকিৎসা শাস্ত্রে কি রাশা তখনো এতই পশ্চাৎপদ?' তিনি বলেছিলেন, 'বলা শক্ত। তবে সাহিত্যের বেলা চেখফ্ যা বলেছেন এস্থলেও হয়তো সেটা প্রযোজ্য: তোমার প্রিয় লেখক চেখফ্ বলেছেন, "হ্যাঁ, আলবৎ আমরা রুশ সাহিত্য পড়ি। কিন্তু সেটা ঐ যেরকম আমরা 'কুটির শিল্প'কে মেহেরবানী করে সাহায্য করি। আসল মালের জন্য যাই ফরাসী সাহিত্যে।" হয়তো চিকিৎসার বেলাও তখন তাই ছিল।'

দাসী না ডাচেস্—সমাজের দুই প্রান্তের দুজনা—কে প্রথম রাসপুতিনকে নিয়ে গেল জারের রাজপ্রাসাদে?

সে কি? যুবরাজ মৃত্যুশয্যায়, আপন 'কটেজ ইনডাসট্রি'র রাশান ডাক্তাররা তো হার মেনেছেনই, ভিয়েনা-বার্লিনের রাজ-বৈদ্যরাও, যাঁরা কি না কাইজারের, এমপেরার ফ্রানৎস যোজেফের প্রাসাদের গণ্যমান্যদের চিকিৎসা করে করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা পর্যন্ত রাশা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচেন। কারণ রুশ যুবরাজের যে রোগ হয়েছে সেটার নাম হ্যামোফিলিয়া—আমরা গরীবদের, না জানি কোন্ পুণ্যের ফলে, আমাদের হয় না—ব্যামোটা শব্দার্থেই রাজসিক, শুধু রাজা-

রাজড়াদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। পূর্বে ছিল এই বিশ্বাস; পরে দেখা গেল, গরীবদেরও হয়। আমরা বললুম, 'সেই কথাই কও। ভগবান যে হঠাৎ খামোখা এহেন দুরারোগ্য ব্যাধি শুধু বড়লোকদের জন্যই রিজার্ভ করে রেখে দেবেন, এটা তো অকল্পনীয়। ব্যামোগুলো তো আমাদের মতন গরীবদের জন্যই তৈরি হয়েছে। ভগবান স্বয়ং তো রাজাদের দলে। কিংডম অব্ দি হেভ্ন্ বা স্বর্গরাজ্যে যাঁর বাস তিনি তো ফেভার করবেন তাঁর জাতভাই তাঁদেরই, যাঁদের কিংডম্ অব্ দি আর্থ বা পৃথ্বীরাজ্য আছে।[২] তাই যদি হয়, তবে স্বর্গরাজ্যই হোক, আর ভূস্বর্গই হোক, ভিয়েনা-বার্লিনের অশ্বিনীকুমারদ্বয় যেখানে রুগীকে হরি নামের গুলি দিয়ে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ার তালে, সেখানে দাসী 'ফার্সী পড়বে'? হয়তো ঠিক সেইখানেই, কিন্তু অন্য কারণও আছে।

আমরা এ-দেশে যত কুসংস্কারাচ্ছন্নই হই না কেন, একাধিক বাবদে অন্তত সে যুগে, অর্থাৎ এ-শতাব্দীর প্রারম্ভে জারের রাশা আমাদের অনায়াসে হার মানাতে পারতো। সে রাশার গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ ছিল শব্দার্থেই অর্থডক্স্ গোড়া, কট্টর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। আর চাষাভুষোদের তো কথাই নেই। তন্ত্রমন্ত্র, জড়িবড়ি, মাদুলী-কবচ থেকে আরম্ভ করে নিরপরাধ 'প্রভু যীশুর হত্যাকারী' ইহুদিদের সুযোগ পেলেই বেধড়ক মার, এবং সেখানেই শেষ নয়—আপন রক্তের, আপন ধর্মের জাতভাই যারা এসব কুসংস্কার থেকে একটুখানি মুক্ত হয়ে, অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ স্বাধীনভাবে প্রভু যীশুর বাণী জীবন দিয়ে গ্রহণ করার চেষ্টা করতো যেমন 'দুখবর', 'স্তান্দিস্ত' সম্প্রদায়—তাদের উপর কী বীভৎস অত্যাচার।[৩] এবং চাষাভুষোদের এই অত্যাচার-ইন্ধনে কাষ্ঠ সরবরাহ করতেন জার-সম্প্রদায় এবং তাঁদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত বিলাস-ব্যসনে গোপন পাপাচারে আকণ্ঠ-নিমগ্ন অর্থডক্স্ চার্চ তার আপন 'পোপ'—হোলি সিনড্কে নিয়ে। যে ইউসুপফ এর

---

২ স্বয়ং স্বামীজী নাকি বলেছেন, 'যে ভগবান আমাকে এ-দুনিয়ায় এক মুঠো ভাত দেয় না, সে নাকি মৃত্যুর পর আমাকে স্বর্গরাজ্য দেবে—why, even an imbecile would not believe it; much less I!' তবে এটা প্রক্ষিপ্তও হতে পারে। তবু এ-কথা অতিশয় সত্য, তিনি এই পৃথিবীতেই স্বর্গরাজ্য স্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম নাকি বলতেন, মানুষকে ভগবান হতে হবে, আর তিনি নাকি বলতেন, মানুষকে মানুষ হতে হবে।

৩ সে অত্যাচার-সংবাদে কাতর হয়ে তলস্তয় 'রেসারেক্শন' বই লিখে, টাকা তুলে এদের অনেককে কানাডা পাঠিয়ে দেন।

কয়েক বৎসর পর রাসপুতিনের ভবলীলা সাঙ্গ করেন, তিনি বা তাঁর ভাই, আরেক গ্র্যাণ্ড ডিউক প্রকাশ্য 'ডুমা' বা মন্ত্রণাসভায় প্রস্তাব করেন এবং বহু বিনিদ্র যামিনী যাপন করে স্বহস্তে নির্মিত পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে পেশ করেন, ইহুদিদের সবংশে বিনাশ করার জন্য কি প্রকারে, স্তরে স্তরে, শল্য প্রয়োগদ্বারা তাদের পুরুষদের সন্তান প্রজনন ক্ষমতা হরণ করা যায়? বগ্‌দানফ সাহেব বলেছিলেন, 'মাই বয়, হি সাব্‌মিটেড্ ইট ইন্ অল্ সিরিয়াসনেস্!' অবশ্য তৎসত্ত্বেও মার্জিত রুচিসম্পন্ন ভদ্রসন্তান অধ্যাপক বগ্‌দানফ ইহুদিদের ঘৃণা করতেন—হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে, ঐ জাতীয় আর পাঁচটা বর্বর রুশের মত। বিশ্বভারতীতে তখন একটি সুন্দরী, বিদেশিনী, ইহুদি অধ্যাপিকা ছিলেন; কি প্রসঙ্গে তাঁর কথা উঠতে বগ্‌দানফ তিক্ত অবজ্ঞায় মুখ বিকৃত করে বললেন, 'আই উড্ নট্ টাচ হার উইথ এ পেয়ার অব টংস!'—সাঁড়াশি দিয়েও তিনি তাঁকে স্পর্শ করতে রাজী হবেন না!

এ কথা সবাই বলেছেন, রাজধানী সেণ্ট পেটের্‌স্‌বুর্গে (তখন অবশ্য রাশা জর্মনীর সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত বলে তাদের সভ্যতায় জর্মনদের যে শতকরা আশী ভাগ অবদান, মায় তাদের ভাষায় প্রবেশপ্রাপ্ত জর্মন শব্দ, যেমন সেণ্ট পেটের্‌স্‌বর্গের জর্মন অংশ 'বুর্গ'—'প্রাসাদ', 'কাস্‌ল্'—সমূলে উৎপাটিত করে নামকরণ করেছে 'পেত্রোগ্রাদ'। সর্বশেষে এর নামকরণ হয় 'লেনিনগ্রাদ', কিন্তু ততদিনে রাজধানী চলে গেছে মস্কোতে। জারের 'উইণ্টার পেলেস' প্রাসাদে বিরাজ করতো কেমন যেন এক অদ্ভুত রহস্যময় (প্রধানত ধার্মিক—mysticism) বাতাবরণ। সম্রাজ্ঞী—জারিনা—ছিলেন অতিশয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আচার-অনুষ্ঠানে সদালিপ্ত, প্রতি মুহূর্তে পুত্রের পুনর্বার রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত হবার ভয়ে উদয়াস্ত সশঙ্কিত; বিশেষ করে যখন হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতি এই কঠিন পীড়ার সম্মুখে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে, তখন যে তিনি পাগলিনীর মত রাজ্যের যত প্রকারের টোটকামোটকা, তাবিজমাদুলীর সন্ধানে লেগে যাবেন সেটা অবাঞ্ছনীয় হলেও অবোধ্য নয়—এমন কি কট্টর বৈজ্ঞানিকও সেখানে সহানুভূতি দেখাবে। একেই তো শীত-প্রাসাদে বিরাজ করতো রহস্যময় বাতাবরণ, যেন সেখানে যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো প্রকারের অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে, তদুপরি নানাশ্রেণীর কুটিল ভাগ্যান্বেষী সেই প্রাসাদে কোনো প্রকারের চতুরতা দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের জন্য গমনাগমন করছে, সেখানে যদি নিত্যসঙ্গিনী দাসীটিও যদি বলে যে, সে একজন 'হোলিম্যান', 'সাধুতপস্বী'কে চেনে যাঁর হৃদয়ে প্রভু যীশুর সামান্যাংশ প্রবেশ করার ফলে ('সেই শাশ্বত সত্তার একটি কণা আমাতে অবতার রূপে অবতীর্ণ হয়েছে'—রাসপুতিনের

আপন ভাষায় ) তিনি প্রভুরই মত বহু দুরারোগ্য ব্যাধি, কোনো ঔষধ প্রয়োগ না করে অবলীলাক্রমে আরোগ্য করতে পারেন, তবে মহারানী যে নিমজ্জমানার ন্যায় সেই তৃণখণ্ডকেও দৃঢ়হস্তে ধারণ করবেন সেটা তো তেমন-কিছু অসম্ভব আচরণ নয়।

অন্যপক্ষ বলেন, দাসী নয় ডিউক।

রাসপুতিন দিগ্বিজয় করতে করতে পেত্রোগ্রাদ—সম্ভব হলে রাজপ্রাসাদ—জয় করবেন বলে মনস্থির করেছেন। এদিকে সেখানকার যাজক সম্প্রদায়ের কেউ বা তাঁর জনপ্রিয়তার সংবাদ শুনে, কেউ বা তাঁর ধর্মের নবজাগরণ প্রচেষ্টার খ্যাতি শুনে, কেউ বা তাঁর অলৌকিক কর্মক্ষমতার জনরবে আকৃষ্ট হয়ে সেটা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য, এক কথায় অনেকেই অনেক কারণে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করতে উদ্‌গ্রীব। রাসপুতিন সশিষ্য শিষ্যা পেত্রোগ্রাদে প্রবেশ করে—সে প্রবেশ প্রায় খৃষ্টের পূতপবিত্র জেরুজালেমের পুণ্যভূমিতে প্রবেশ করার সমতুল—সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠিত হলেন এক প্রভাবশালী শিষ্যের গৃহে। শীঘ্রই যোগসূত্র স্থাপিত হল পেত্রোগ্রাদের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মশিক্ষাশালার সুপণ্ডিত অধ্যক্ষের সঙ্গে। ইনি আবার মহারানীর আপন ব্যক্তিগত পুরোহিত—অর্থাৎ এঁরই সামনে মহারানী প্রতি সপ্তাহে একবার 'কনফেস্' করেন, ঐ সপ্তাহে তিনি যে সব পাপচিন্তা করেছেন, কর্মে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন সেগুলি স্বীকার করে শাস্ত্রাদেশ অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তাদেশ গ্রহণ করেন—প্রায়শ্চিত্ত সাধারণতঃ উপবাস ও মালাজপের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে।[৪] এই কনফেশন গ্রহণ করে যে পুরোহিত প্রায়শ্চিত্তাদেশ প্রদান করেন তাঁর পদটি স্বভাবতই সাতিশয় গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব ধারণ করে। তিনি সম্রাজ্ঞী-

---

৪ এই কনফেশন বা পদস্খলন স্বীকারোক্তি একাধিক ধর্মে প্রচলিত আছে। এদেশে জৈনদের ভিতর সেটি নিষ্ঠা সহকারে মানা হয়, এবং এরই নাম 'পর্যুষণ'। তবে আমাদের যতদূর জানা, পর্যুষণ বৎসরে মাত্র একবার হয় এবং সম্প্রদায়েয় সকলেই সেটা একই সময়ে করেন বলে বর্ষার শেষে সেটা পর্বদিবস রূপে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ শ্রমণরাও বর্ষাকালে পর্যটন নিষিদ্ধ বলে কোনো সংঘে আশ্রয় নিয়ে বর্ষাযাপন-শেষে পাপ স্বীকারোক্তি করে পুনরায় পর্যটনে নেমে পড়েন। মুসলমানরা হজের সময় করে থাকেন, এবং মৃত্যু আসন্ন হলে 'তওবা' করেন। 'তওবা' শব্দার্থে 'প্রত্যাবর্তন'। অর্থাৎ তওবাকারী আপন পাপ সম্বন্ধে অনুশোচনা করে ধর্মমার্গে প্রত্যাবর্তন করলো।

হৃদয়-কন্দরের অন্তরতম রহস্য জানেন বলেন—এমন কি স্বীকারোক্তির সময় তিনি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অধিকারও ধরেন—তাঁকে থাকতে হয় অতি সাবধানে।

তাঁর প্রধান কৌতূহল রাসপুতিন কোন্ কোন্ কারণে কি ভাবে হৃদয়ে ভগবানের প্রত্যাদেশ পেয়ে সমস্ত জীবনধারা পরিবর্তিত করে 'নবজন্ম' পেলেন। গ্রীক অর্থডক্স্ চার্চ, ক্যাথলিক তথা অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইতিহাসে এই 'নব-জীবন' লাভ, গৃহী খৃষ্টানের সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য এই কনভার্সনের উপ-ইতিহাস এক বিরাট অংশগ্রহণ করে আছে। খৃষ্ট সাধু মাত্রই এটি মনোযোগ সহকারে বারংবার পাঠ করে তার থেকে প্রতি দিন নবীন উৎসাহ, তেজস্বী অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেন। মহারানীর আপন যাজক ধর্ম-একাডেমির অধ্যক্ষরূপে এই উপ-ইতিহাসে অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, সেই পুস্তক তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর সম্মুখে সটীক প্রতিদিন পড়িয়ে শোনাতেন এবং স্বভাবতই সেই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন সাধুসন্তদের নিয়ে গভীর এবং সূক্ষ্ম আলোচনা করতেন। কিন্তু কোনো পাপাত্মা কি ভাবে অকস্মাৎ দৈবাদেশ পেয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্মসঙ্ঘে প্রবেশ করে, কিংবা জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে, অথবা পাণ্ডিত্য থাকলে সঙ্ঘে প্রবেশ ক'রে নির্জনে নিভৃতে বাইবেল বা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের এক নবীন টীকা নির্মাণে বাকী জীবন কাটিয়ে দেয় এ সম্বন্ধে তাঁর কোন ব্যক্তিগত অবধারিত অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং অতি সহজেই অনুমান করা যায় যে, এ রকম একটা আধ্যাত্মিক 'কনভার্সনে'র নায়ক যদি তাঁর আপন কর্মস্থলে হঠাৎ এসে পৌঁছন তবে তিনি হয়তো তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করবেন। পূর্বেই বলেছি, রাসপুতিনের ভিতর যেমন যেন একটা বৈদ্যুতিক আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিনি সাধারণ কেন, অসাধারণ জনকেও মন্ত্রমুগ্ধবৎ মোহাচ্ছন্ন করতে পারতেন। খৃষ্ট ধর্মশাস্ত্রে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ছিল অতিশয় সীমিত, কিন্তু প্রভু যীশুর যে কটি সরল উপদেশ তিনি বহু কষ্টে কণ্ঠস্থ করতে পেরেছিলেন সেগুলি তিনি অতিশয় দৃঢ়-বিশ্বাসের বীর্যশীল সরলতায় প্রকাশ করতে পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যটিও নিবেদন করা উচিত যে, রাশায় ধর্মশিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে যে পণ্ডিতকুলমান্য সর্বোত্তম শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন তিনি এই অশিক্ষিত হলধরসন্তানের কাছে আসবেন না শাস্ত্রের টীকাটিপ্পন' শ্রবণার্থে! তিনি আসবেন অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। এ স্থলেও প্রভু যীশুর সঙ্গে রাসপুতিনের সাদৃশ্য আছে। ইসরায়েলের স্মার্তপণ্ডিতরা যখন প্রভু যীশুর সঙ্গে তর্কযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত তখন তিনি যেন তাচ্ছিল্যভরে বলেছিলেন, আমি শাস্ত্রকে কার্যে পরিপূর্ণ ভাবে দেখাবো।

এসব কারণ অনুসন্ধান অপ্রয়োজনীয়। যা বাস্তবে ঘটে সেটা সর্ব তর্কের

অবসান এনে দেয়। পণ্ডিতের পণ্ডিত রাসপুতিনকে দেখে, তাঁর আচার-ব্যবহার, তাঁর প্রতি শিষ্য-শিষ্যাদের সহজ ভক্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে বিস্মিত হলেন, কিন্তু মুগ্ধ হলেন যখন রাসপুতিনের কাছ থেকে শুনলেন, তাঁর আবেগভরা কণ্ঠে তিনি বলে যেতে লাগলেন, কি ভাবে এক দৈবজ্যোতি তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হল আর তিনি ক্ষণমাত্র চিন্তা না করে স্বর্গীয় প্রভুর পদপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করলেন।

এ প্রকারের আকস্মিক পরিবর্তন ইতিহাস শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যক্ষ পড়েছেন, পড়িয়েছেন প্রচুর কিন্তু এ-জাতীয় পরিবর্তনের একটি সরল সজীব দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখা, স্বকর্ণে শোনা সে যে এক সম্পূর্ণ ভিন্ন, অভিনব, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। যে-কোনো অধ্যাপক, যে-কোন শিক্ষক এ প্রকারের অভিজ্ঞতাকে অসীম মূল্য দেন, কারণ পরের দিন থেকেই ছাত্রমণ্ডলীতে বেষ্টিতাবস্থায় তিনি অর্ধবিশ্বাসী তর্কবাগীশদের উদ্দেশে সবল, আত্মপ্রত্যয়জাত সুদৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারেন, 'পবিত্র রুশ দেশের পবিত্রতর সন্তদের যে অলৌকিক পরিবর্তনের কথা তোমরা পড়ছো, সেগুলো কাহিনী নয়, ইতিহাস, এবং শুষ্ক পত্রে লিখিত জীর্ণ ইতিহাস নয়, নিত্য-দিনের বাস্তব প্রত্যক্ষ সত্য; সে জিনিস ভাগ্যবান চক্ষুষ্মান দেখতে পায়।' অস্মদ্দেশীয় প্রচলিত নীতিবাক্য আছে:

"অদ্যাপিও সেই লীলা খেলে গোরা রায়।
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

এবং তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন, এই সাধুপুরুষকে তিনি রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত সম্রাজ্ঞীর সম্মুখীন করবেন। সর্ব ধর্মের সর্ব ইতিহাস বলে, সাধুজনের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। সম্রাজ্ঞীকে এই সাধু তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করে এনে দেবেন সান্ত্বনা, আত্মপ্রত্যয় এবং ধর্মবিশ্বাস স্থাপন করবেন দৃঢ়তর ভূমিতে।

অতি সহজেই তিনি রাসপুতিনের গুণমুগ্ধ রাজপরিবারের একাধিক নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ার সহানুভূতি ও সহযোগ পেলেন। রাসপুতিন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

কেউ কেউ বলেন, সেটা ছিল আকস্মিক যোগাযোগ। অধিকতর বিশ্বাসীরা বলেন, 'না, যুবরাজের কঠিনতম সঙ্কটময় অবস্থান, যখন রাজবৈদ্যগণ তাঁর জীবন রক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ হতাশ্বাস,তখন রাসপুতিন তাঁকে অনুরোধ করার পূর্বেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে শিষ্যগণকে প্রত্যয় দেন, তিনি যুবরাজকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারবেন।

এ তো কোনো হাস্যকর আত্মপ্রত্যয় নয়। অভিজ্ঞতম প্রবীণ চিকিৎসকও বার বার মস্তকান্দোলন করে স্বীকার করেন, কত অগুণিত রোগী যমদূতের দক্ষিণহস্ত ধরে যখন পরপারে যাত্রার জন্য প্রথম পদক্ষেপ করেছে, রূঢ় সরল ভাষায় ঐ সব রোগীদের সম্বন্ধে যখন বহু পূর্বেই সব বিশেষজ্ঞ একই বাক্যে আপন দৃঢ় নৈরাশ্য প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেই সময় হঠাৎ অকারণে, চিকিৎসকের কোন প্রকারের সাহায্য না নিয়ে সেই জীবন্মৃত ব্যক্তি শ্মশান-সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে পুনরায় লুপ্ত স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

* *

সম্রাট এবং মহিষী উভয়েই নাকি সাধুর প্রথম দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে যান। বিশেষ করে রাজমহিষী।

অধ্যাপক বগ্‌দানফের মতে, অর্থাৎ তিনি যে জনরব সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল বলে গ্রহণ করেছিলেন সেই অনুযায়ী রাসপুতিন নাকি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মহারানীকে আশ্বাস দেন, যুবরাজ রোগমুক্ত হবেন, এবং তিনিই তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। রাজমহিষী স্বয়ং তাঁকে নিয়ে রুগীর কক্ষের দিকে অগ্রসর হলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উচ্চকণ্ঠে, তারস্বরে প্রতিবাদ জানালেন। যে-ব্যক্তিকে সম্রাজ্ঞী নিয়ে যাচ্ছেন সে-ব্যক্তি যে চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনভিজ্ঞ, সে-কথা সে-ই একাধিকবার স্বীকার করেছে, এমতাবস্থায় যখন তাঁরা আশা করছেন যে, যে-কোন মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর ন্যায় যুবরাজও প্রকৃতিদত্ত শক্তিবলে—যে শক্তি সর্বজনের অলক্ষিতে জীবদেহে বেঁচে থাকার জন্য সর্বব্যাধির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম দ্বারা আপন কর্তব্য করে যায়—হয়তো নিরাময় হয়ে যেতে পারেন সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় এই নবাগত হয়তো আপন অজ্ঞতাবশত সেই শক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে।

তৎসত্ত্বেও মহারাণী রাসপুতিনকে রোগীর কক্ষে নিয়ে গেলেন।

চিকিৎসকরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন। রাসপুতিন বললেন, তিনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তির সম্মুখে চিকিৎসা করবেন না। তৃতীয় বলতে সম্রাজ্ঞীকেও বোঝায়, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে দেহলীপ্রান্ত উত্তীর্ণ হলেন।

অতি অল্পক্ষণ পরেই রাসপুতিন দোর খুলে রানীর দিকে সহাস্য ইঙ্গিত করলেন। রানীমা কক্ষে প্রবেশ করে স্তম্ভিত। যেন কত যুগ পরে তিনি দেখলেন রাসপুতিনের দেওয়া কি যেন একটা জিনিস হাতে নিয়ে যে কোনো সুস্থ বালকের মত যুবরাজ খেলা করছেন।

রাসপুতিন প্রকৃতই যুবরাজকে তাঁর রক্তমোক্ষণ রোগ থেকে নিরাময়

করেছিলেন কি না সে-বিষয়ে মতানৈক্য আছে—তবে এটাও স্মরণে আনা কর্তব্য বিবেচনা করি যে, এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে গবেষণা, পাণ্ডিত্য, সত্যানুসন্ধান বললেই বোঝাতো—অবিশ্বাস। এই মূলমন্ত্র ঐ সময়ে এমনই সুদূরপ্রসারী হয় যে, তৎকালীন লিখিত পুস্তক, এনসাইক্লোপীডিয়াতে একাধিক যশস্বী লেখক স্বয়ং বুদ্ধ, মহাবীর, এমন কি তাঁদের আপন খৃষ্টের অস্তিত্ব পর্যন্ত সন্দেহাতীতরূপে সপ্রমাণ না হওয়ায় (দু' হাজার, আড়াই হাজার বৎসরের পরের একতরফা বা 'এক্‌স্‌পার্টে' তদন্তে!) তাঁদের জীবনী এবং বাণীকে কাল্পনিক কিংবদন্তী আখ্যা দিয়েছেন, এবং কেউ কেউ তাঁদের অস্তিত্ব পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেছেন। অতএব সে যুগের পুস্তক যে রাসপুতিনের মত চিকিৎসানভিজ্ঞজন যুবরাজকে রোগমুক্ত করেছেন সে কথা হয় অস্বীকার করে, কিংবা নীরব থাকে। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করেছেন, রাসপুতিনের প্রাসাদ গমনাগমনের পর থেকেই যুবরাজের স্বাস্থ্যোন্নতি দিনে দিনে সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

আর সে যুগের সম্রাজ্ঞীদের ভিতর ধনে-ঐশ্বর্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নিঃসন্দেহে সর্বাগ্রগণ্যা না হলেও যাঁকে ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ রাজপরিবার সবাপেক্ষা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতেন সেই জারিনা? তিনি তো কৃতজ্ঞতার প্রতিদানস্বরূপ রাসপুতিনের পদপ্রান্তে কী যে রাখবেন তার সন্ধানই পাচ্ছেন না, কারণ সাধারণজনের মত ভবন-যানবাহন রজতকাঞ্চনে তাঁর লোভ ছিল না—তাঁর আসক্তি কিসে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন—ওদিকে জারিনা আবার জাতমিষ্টিক, অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে তিনি বিশ্বাস করেন এবং যাঁদের এসব মিরাকল দেখাবার শক্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে তিনি তাঁর দেহ-মন-আত্মা সর্বস্ব নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত।

জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী সাধুসজ্জনদেরই না কত প্রকারের কুৎসা রটে—দু' হাজার বৎসর হয়ে গেল এখনো খৃষ্টবৈরীরা বলে, তিনি নাকি অসচ্চরিত্রা যুবতীদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন ও মদ্যপানে তাঁর আসক্তি ছিল ঈষৎ মাত্রাধিক—সে-স্থলে রাসপুতিন! যিনি কিনা, তাঁর কামানল নির্বাপিত করার চেষ্টা তো করেনই না, তদুপরি ঐ বিশেষ রিপুর চরিতার্থতাকে তুলে ধরেছেন সর্বোচ্চ ধর্মের পর্যায়ে এবং ফলে শিষ্যশিষ্যাগণসহ বহুবিধ অনাচারে লিপ্ত হন—এসব 'অর্জি' 'সেটারনেলিয়া'র উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি—তাঁর পূর্ববর্তী মফস্বল-জীবনের তুলনায় রাজধানীতে তাঁর বর্তমান কেলেঙ্কারির বিবরণ তথা পল্লবিত জনরব চতুর্দিকে যে অধিকতর ছড়িয়ে পড়বে তাতে আর কী সন্দেহ! কিন্তু ক্রমে ক্রমে মোক্ষমতর মারাত্মক কলঙ্ককাহিনী রটতে আরম্ভ করলো চতুর্দিকে; এসব

দলবদ্ধভাবে কৃত দুষ্কর্মের 'অর্জি' এখন নাকি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে– এবং সেখানে তো সব-কিছুই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়—পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে! সম্রাস্ততম ডিউক ডাচেস, অর্থাৎ সম্রাটের নিকটতম আত্মীয়-আত্মীয়ারাও নাকি এই সব অনাচারে অংশ নিচ্ছেন। এবং সর্বশেষে যে কলঙ্ককাহিনী পেত্রোগ্রাদে জন্মলাভ করে সর্ব রুশের সর্ব সমাজের উচ্চতম থেকে অধস্তন শ্রেণী পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে আপামর জনসাধারণকে দিল রূঢ়তম পদাঘাত সেটি আর কিছু নয়, স্বয়ং জারিনা তাঁর দেহ সমর্পণ করেছেন রাসপুতিনকে। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাদের তো কথাই নেই।

গ্র্যাণ্ড ডিউক ইউসপফের দু'টি মোকদ্দমাই ছিল এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে। এই সব কলঙ্ককাহিনীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীকে জড়িয়ে প্রথমে ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে, পরে টেলিভিশনে দেখানো হয়েছে, অথচ তাঁর মতে, তাঁর সতীসাধ্বী স্ত্রী পূর্বোল্লিখিত পাপানুষ্ঠানের সঙ্গে মোটেই বিজড়িত ছিলেন না। সে কথা পরে হবে।

আমি এতক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা দিয়ে রুশ রাজনীতি এড়িয়ে গিয়েছি কিন্তু এখন থেকে আর সেটা সম্ভবপর হবে না, কারণ, এই সময়েই কূটরাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হলধর-সন্তান রাসপুতিন হিম্মে নিতে আরম্ভ করেছেন দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ কঠিন কঠিন সংকটসমস্যায়। ইতিমধ্যে যে সব সরল ধর্মযাজকগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে বিশ্বস্ততম সূত্রে তাঁর 'কীর্তিকলাপে'র সম্পূর্ণ বিবরণ অবগত হয়ে তাঁর সঙ্গে সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন। কিন্তু স্বয়ং জারিনা এবং রাশার 'পোপ' হোলি সিনড যতক্ষণ তাঁর সম্মোহন-ক্ষমতায় অর্ধচেতন ততক্ষণ তাঁকে তো মুহূর্তেক তরে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। পাঠক, স্মরণ করুন সেই সুপ্রাচীন আরবী প্রবাদ: 'কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে, কিন্তু কাফেলা (ক্যারাভান) চলে এগিয়ে!' রাসপুতিন এই কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউকে থোড়াই পরোয়া করেন।

কিন্তু রাসপুতিন কি করে এরকম নির্বিকারচিত্তে উপেক্ষা করলেন রুশ দেশের জনগণের রাজনৈতিক নবজাগরণকে! জার দ্বিতীয় নিকলাস যত না রক্ষণশীল, সম্রাটের সার্বভৌমিকত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাঁর চেয়ে শতগুণ স্থবির জড়ভরত ছিলেন তাঁর আমির-ওমরাহ। ওদিকে রুশ-সিংহ যখন সদম্ভে মূষিক জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে তার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে নির্মমরূপে পরাজিত হল, তখন আর 'হোলি' রাশার অন্তঃসারশূন্যতা গোপন রাখা সম্ভব হল না। জনমত নির্ভয়কণ্ঠে জারের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বায়ত্তশাসন দাবি করলো। ১৯০৪

খৃষ্টাব্দে যে বৎসর রাসপুতিন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, ঠিক সেই বৎসরেই জার প্রথম 'বিধানসভা' ( এরই নাম পূর্বোল্লিখিত 'ডুমা' ) নির্মাণের অনুমতি দিলেন। সে এক সত্যকার সার্কাস—নইলে তার কোন সম্মানিত সদস্য সেখানে অস্ত্রোপচার দ্বারা ইহুদিকুলকে শিখণ্ডীরূপে পরিণত করবার প্রস্তাব গুরুত্বপূর্ণ গাম্ভীর্যমণ্ডিত পদ্ধতিতে পেশ করতে পারেন ?

কিন্তু 'ডুমা' প্রতিষ্ঠান বন্ধ্যা হয়ে রইল কি না রইল সে তত্ত্ব রাসপুতিন-জীবনকে স্পর্শ করতে পারে নি যতদিন না রাজপ্রাসাদচক্রের দু-একজন ধুরন্ধর অতিশয় রক্ষণশীল রাজনৈতিক মনস্থির করলেন যে, রাসপুতিনকে দিয়ে তাঁরা এমন সব রাজকর্মচারী নিযুক্ত করিয়ে নেবেন, যারা ডুমার প্রতি পদক্ষেপের পথে লৌহপ্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান হয়ে থাকবে। কূটনীতিতে আনাড়ি রাসপুতিনের হাত দিয়ে তামাক খাওয়াটা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য হল না, কিন্তু এসব অপদার্থ নিয়োগের পশ্চাতে কে, সে তথ্যটিও গোপন রইল না। বস্তুত স্বয়ং রাসপুতিন প্রত্যেক পার্টিতে জালা জালা মদ আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সুমিষ্ট কেক্‌খণ্ড ( তাঁর জন্য বিশেষ করে কেকে তিন ডবল চিনি দেওয়া হত—এ বাবদে হিটলারের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ মিল ) চাষাড়ে পদ্ধতিতে প্রচুর শব্দ আর বিরাট আস্তব্যাদানসহ চিবুতে চিবুতে দম্ভ করতেন, 'এই যে দেখছো স্কার্ফখানা, এটি আপন হাতে বুনেছেন স্বয়ং জারিনা, ( কিংবা হয়তো তাঁর আদরের ডাকনাম সোহাগভরে উল্লেখ করতেন—আমার যেন মনে পড়ছে, তাই ), কিংবা 'জানো হে, ভরনাভাকে পাঠালুম তবল্‌স্কের বিশপ করে।' প্রভু রাসপুতিনের অন্ধভক্ত, অত্যধিক মদ্যপানবশত অর্ধমত্ত শিষ্যেরাও নাকি দ্বিতীয় সংবাদটি শুনে অচৈতন্য হবার উপক্রম! কারণ প্রভুর নিত্যসঙ্গী ঐ ভরনাভা যে একেবারে আকাট নিরক্ষর! সে হবে বিশপ!

মরীয়া হয়ে অন্যতম প্রধান পাদ্রী নিযুক্ত করলেন গুপ্তঘাতক। রাসপুতিন শুধু যে অনায়াসে সংকট অতিক্রম করলেন তাই নয়, এ 'সুবাদে' রাজপ্রাসাদে তাঁর প্রভাব এমনই নিরঙ্কুশ হয়ে গেল যে, স্বয়ং জার পর্যন্ত আর এখন উচ্চবাচ্য করেন না। অবশ্য সমস্ত ইয়োরোপই বিলক্ষণ অবগত ছিল যে, জার অতিশয় দুর্বল চরিত্রের 'যাক্‌গে, যেতে দাও না'—ধরনের নির্বীর্য 'শাসক'। কার্যত তাঁকে শাসন করেন জারিনা। এবং তাঁর সম্মুখে রাসপুতিনের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার মত সাহস তখন কারো ছিল না।

রাসপুতিনকে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ার পরই তিনি জারিনাকে সর্বজনসমক্ষে গম্ভীর প্যাকস্বরীকণ্ঠে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন ( বা শাসান ), 'আমার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে গোষ্ঠীসুদ্ধ রমানফ পরিবার ( অর্থাৎ সপরিবারে

তখনকার জার) নিহত হবে।' নিহত তাঁরা হয়েছিলেন, এবং অতিশয় নিষ্ঠুর পদ্ধতিতেই, কিন্তু সেটা ঠিক এক বৎসরের ভিতরই কিনা, বলতে পারবো না, দু' বৎসরও হতে পারে।

কিন্তু জারিনা? তাঁর শোচনীয় অবস্থা তখন দেখে কে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন অতিপ্রাকৃতে অন্ধবিশ্বাসী এই মূঢ় রমণীর যত দোষই থাক, একটা কথা অতিশয় সত্য, তিনি তাঁর পুত্রকন্যাকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলেন পাগলিনী-পারা। উদয়াস্ত তাঁর আর্ত সশঙ্ক দৃষ্টি, না জানি কোন্ অজানা অন্ধকার অন্তরাল থেকে কোন্ অজানা এক নূতন সংকট অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হবে, তাঁর কোনো একটি বৎসকে ছিনিয়ে নেবার জন্য।

অতএব প্রাণপণ প্রহরা দাও রাসপুতিনের চতুর্দিকে। তিনিই একমাত্র মুশ্‌কিল্-আসান্। এই 'হোলিম্যান' আততায়ীর হস্তে নিহত হলে সর্বলোকে সর্বনাশ!

কিন্তু বিশ্বসংসারের সকলেই রাসপুতিনের সাবধানবাণী বা শাসানোতে বিশ্বাস করেন নি এবং ভয়ও পান নি। বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের সর্বোচ্চস্তরের রাজরক্তধারী একাধিক ব্যক্তি। এঁরা ক্রমাগত জার-জারিনাকে রাসপুতিন সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন, এবং ফলে তাঁদের প্রতি বর্ষিত অপমানসূচক কটুবাক্য মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিদিন। রাজপ্রাসাদে এঁরা হচ্ছেন অপমানিত—অথচ রাসপুতিনের 'শুভাগমনে'র পূর্বে এঁরাই ছিলেন সেখানে প্রধান মন্ত্রণাদাতা। এখন তাঁদের এমনই অবস্থা যে, বাইরের সমাজে তাঁরা আর মুখ দেখাতে পারেন না। তাঁদের পদমর্যাদা, অভিজাত রক্ত প্রকাশ্য ব্যঙ্গবিদ্রূপ থেকে তাঁদের বাঁচিয়ে রেখেছে সত্য, কিন্তু ভিতরে বাইরে, স্ফুট-অস্ফুট নিত্যদিনের এ অপমান আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়! ওদিকে 'হোলি রাশা' যে কোন্ জাহান্নমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কে জানে!

অপমানিত সর্বোচ্চ অভিজাতবংশজাত তিনজন বসলেন মন্ত্রণাসভায়।

স্থির হল, ইউসুপফই হত্যা করবেন রাসপুতিনকে। তাই আজও লোকে বলে, 'তোমার স্ত্রীকে রাসপুতিন ধর্ষণ করেছিল বলেই তো তুমি প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে, নইলে রাশাতে কি আর অন্য লোক ছিল না?' ইউসুপফ এটা অস্বীকার করেন। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রধানদের আদেশানুযায়ীই তিনি ঐ কর্মে লিপ্ত হন, আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় নিজকে ভলন্টিয়ার করেন যদিও তাঁর স্ত্রী ধর্ষিতা হন নি। এ সম্বন্ধে ইউসুপফের আপন জবানী পাঠক বিশ্বাস করতে পারেন, নাও করতে পারেন; আমি শুধু বগ্‌দানফ

সাহেবের জবানীটি পেশ করছি। না হয় সেটা ভ্রান্তই হল, তাতেই বা কি? তদুপরি আমার স্মৃতিশক্তি আমার কলম নিয়ে কি যে খেলা খেলছে, জানবো কি করে?

এবং আশ্চর্য! হত্যা করবেন আপন বাড়িতেই তাঁকে সসম্মান নিমন্ত্রণ করে! পুলিসকে ভয় করতেন এঁরা থোড়াই। কিন্তু জারিনা? তিনি যে শেষ পর্যন্ত হত্যাকারী কে, সে খবরটা প্রায় নিশ্চয়ই জেনে যাবেন, এবং তার ফলাফল কি হতে পারে, না পারে, সে নিয়েও বিস্তর আলোচনা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এ ছাড়া গত্যন্তর নেই—নান্য পন্থা বিদ্যতে।

ইউসুপফ পক্ষ যে রাসপুতিনের শত্রু তিনি এটা জেনেশুনেও ইউসুপফের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে এলেন কেন? কেউ বলে, ইউসুপফের সুন্দরী স্ত্রী ইরেনে তাঁকে 'বিশেষ' প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেন, কেউ বলে, রাসপুতিন সত্যই আশা করেছিলেন, মুখোমুখি আলাপ-আলোচনার ফলে হয়তো প্রাসাদের এই শত্রুপক্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে, কেউ বলে, রাসপুতিন প্রাসাদ জয় করেছিলেন বটে কিন্তু ইউসুপফের মত অভিজাতবংশের কেউ কখনো তাঁকে নিমন্ত্রণ করা দূরে থাক, বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকতে দিতেন না। ইউসুপফ জয় অর্থই পেত্রোগ্রাদ-অভিজাতকুল জয়। তার অর্থ, নূতন শিষ্যা, নূতন ··একটা সম্পূর্ণ নূতন ভাণ্ডার!

প্রায় সবাই বলেছেন, মদে দেওয়া হয়েছিল প্রচুর পটাসিয়াম সায়েনাইড, কিন্তু অধ্যাপক বলেছিলেন, মধুভরা বিরাট কেকের সঙ্গে মিশিয়ে। আমার মনে হয় দ্বিতীয় পন্থাতেই আততায়ীর ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম। মহামান্য অতিথি রাসপুতিনকে অবশ্যই দিতে হত বংশানুক্রমে সযত্নে রক্ষিত অত্যুৎকৃষ্ট খানদানী মদ্য; এবং ভদ্রতা রক্ষার জন্য অতিথি-সেবককেও নিতে হত সেই বোতল থেকেই। এইটেই সাধারণ রীতি। কিন্তু পার্টিতে সবাই তো আর কেক খায় না—তাও আবার তিন-ডবল মধুভর্তি স্পেশাল 'রাসপুতিন কেক্'—তদুপরি, বিরাট কেকের দু-আধা দুই পদ্ধতিতে নির্মাণ করে জোড়া দেওয়া অতি সহজ।

তা সে কেক্ই হোক্ আর খানদানী মদই হোক্—রাসপুতিন তাঁর বীভৎস অভ্যাসমত সে-বস্তু খেয়ে গেলেন প্রচুরতম পরিমাণে, এবং তাজ্জব কী বাৎ! তাঁর কিছুই হল না। চোখের পাতাটি পর্যন্ত নড়লো না। আমার সুস্পষ্ট মনে আছে এস্থলে অধ্যাপকও আপন বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মাই বয়! দেয়ার উয়োজ ইনাফ পয়জন টু নক্ অফ্ সিক্স্ বুল্জ।' অর্থাৎ ঐ বিষে ছ'টা আস্ত বলদ ঘায়েল হয়! কিন্তু রাসপুতিন নির্বিকার! ইউসুপফরা

জানতেন না, রাসপুতিনকে ইতিপূর্বে একাধিকবার বিষপ্রয়োগে হত্যা করার চেষ্টা নিষ্ফল হয়। ম্যাজিশিয়ানরা যে রকম ব্লেড খায়, রাসপুতিন ঠিক সেই রকম হরেক জাতের বিষ খেতে তো পারতেনই, হজমও করতেন অক্লেশে।

ষড়যন্ত্রকারীরা পড়লেন মহা ধন্দে। তাঁদের সব প্ল্যান ভণ্ডুল।

তখন ইউসুপফ অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের ফিস ফিস করে বললেন, 'এ রকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আমি ওকে গুলি করে মারবো।'

পিছন থেকে ঠিক ঘাড়ের উপর, অর্থাৎ সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায়, একেবারে কাছে এসে ইউসুপফ গুলি ছুঁড়লেন। রাসপুতিন রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন।

সে তো হল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা এখন সম্মুখীন হলেন এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত নূতন সমস্যার। জখমহীন মৃতদেহ যত সহজে হস্তান্তর করা যায়, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে কর্মটা তো অত সহজ নয়। এখন কি করা কর্তব্য সেটা স্থির করার জন্য দলের আর যাঁরা সন্দেহ না জাগাবার জন্য পার্টিতে যোগ না দিয়ে উপরের তলায় অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের সঙ্গে ইউসুপফাদি যোগ দিলেন। তার পূর্বে তিনি লাশটা টেনে টেনে সেলারে (মাটির নিচে কয়লা এবং আর-পাঁচটা বাজে জিনিস রাখার গুদোম) রেখে এলেন। পাছে হঠাৎ কেউ ডাইনিংরুমে ঢুকে লাশটা আবিষ্কার করে ফেলে।

স্থির হল, রাসপুতিনের লাশ ইউসুপফের বাড়ির কাছে নেভা নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। সেটা ডিসেম্বর মাস।[৫] নেভার উপরকার জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সেইটে ভেঙে লাশ ভিতরে ঢুকিয়ে গায়েব করে দেওয়া কঠিন কর্ম নয়।

এইবার সবাই হলেন—যাকে বলে বজ্রাহত! এবং ভুলবেন না, এঁদের অধিকাংশই ফৌজের আপিসার। এঁদের কাউকে হকচকাতে হলে রীতিমত কস্ত করতে হয়, আর মৃত্যুভয়? ছোঃ![৬]

৫ রাসপুতিনের মৃত্যুদিবস ১৫।১৬ ডিসেম্বর ১৯১৬ বলা হয়, আবার ৩০ ডিসেম্বরও বলা হয়। তার কারণ অর্থডক্স রুশ ক্যালেণ্ডার ও কন্টিনেন্টের প্রাচীন ক্যালেণ্ডারে ১৩।১৪ দিনের পার্থক্য।

৬ অধ্যাপক আমাকে গল্পচ্ছলে একদা বলেন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে রাশান অফিসারদের সবচেয়ে প্রিয় খেলা (প্যাস্টাইম) ছিল প্রচুর মদ্যপানের পর লটারিযোগে দুজন অফিসারের নাম স্থির করা। তারপর একজন একটা ঘরে

তা নয়। সবাই সেলারে ঢুকে দেখেন, রাসপুতিনের লাশ উধাও। ঘাড়ের সবচেয়ে মারাত্মক জায়গায় গুলি খেয়ে যে-লোকটা পড়ে গিয়ে 'মরলো', সে যে শুধু আবার বেঁচে উঠলো তাই নয়, আপন পায়ে হেঁটে বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেল।

অবশ্য এ-কথা ঠিক, ইউসুপফ সেলারের দরজা বাইরের থেকে তালাবন্ধ করেন নি, এবং খামোকা বেশী লোক যাতে না জানতে পারে তাই সে রাত্রে অধিকাংশ চাকর-বাকরকে ছুটি দিয়ে রেখেছিলেন।

রাসপুতিন যদি এখন কোনো গতিকে জারিনার কাছে পৌঁছে সব বর্ণনা দেন—এবং নিশ্চয়ই তিনি করবেন তবে ইউসুপফের অবস্থাটা হবে কি?

কিন্তু তিনি অতশত ভাবেন নি—অন্যান্যদের জবানী তাই। তাঁরা বলেন, তিনি পাগলের মত পিস্তল হাতে নির্জন রাস্তায় ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দেখেন, চতুর্দিকের সেই শুভ্র শুভ্রতাময় বরফের ভিতর দিয়ে টলতে টলতে রাসপুতিন এগিয়ে যাচ্ছেন। রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারে ইউসুপফ আর কোনো চান্‌স্ নিলেন না। পিস্তলে যে কটা গুলি ছিল সব কটা ছুঁড়লেন তাঁর ঘাড়ের উপর। তারপর সবাই মিলে তাঁকে টেনে নিয়ে, নেভা নদীর উপরকার জমে-যাওয়া বরফ ভেঙে লাশটা ঢুকিয়ে ঠেলে দিলেন ভাটির দিকে।

কিন্তু জারিনা সে-দেহ উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চার্চেরই মত একটি বিশেষ উপাসনাগারসহ নির্মিত চেপলে তাঁর দেহ সযত্নে গোর দেওয়া হল একটি রমণীয় পার্কের ভিতর। মহারাণী প্রতি রাত্রে যেতেন সেই গোরের পাশে, নীরবে অঝোরে অশ্রুবর্ষণ করার জন্য, রাসপুতিনের আত্মার সদ্‌গতি কামনা করে॥

২২।১।৬৬॥

ঢুকে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় স্থান বেছে নিয়ে ঘরের সব আলো নিবিয়ে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকবে অন্য অফিসার, হাতে সবচেয়ে ছোট সাইজের পিস্তল নিয়ে। প্রথম অফিসার আশ্রয়স্থল থেকে কোকিলের মত ডাক ছাড়বে, "কু"; অন্যজন সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারে শুদ্ধমাত্র ধ্বনির উপর নির্ভর করে পিস্তল মারবে। তখন সেই অন্ধকারে 'শিকার' জায়গা বদলাবে, কিন্তু "কু" ডাক না ছাড়া পর্যন্ত পিস্তল মারা বারণ। কতক্ষণ পরে দু'জনের পার্ট বদলায়, আমার মনে নেই।

মিশরের পসারী—গন্ধবণিক—যে রকম ভারতের শঙ্খচূর্ণ[১] এবং অগুরু আতর বিক্রি করে, ঠিক তেমনি কাইরোর পুস্তক-বিক্রেতা বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'বুদ্ধজীবনী' বিক্রি করে। কিন্তু সে 'বুদ্ধজীবনী' কে লিখেছেন, কেউ জানে না।

অবশ্য পঞ্চতন্ত্র সেখানে অন্য নামে পরিচিত। আরবীতে বলে 'কলীলা ওয়া[২] দিম্‌না'। এ দুটি—কলীলা ও দিম্‌না—দুই শৃগালের নাম। সংস্কৃতে করটক ও দমনক। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন, গোড়াতে পঞ্চতন্ত্রের ঐ নামই ছিল। পরবর্তী যুগে ওটিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে পঞ্চতন্ত্র নাম দেওয়া হয়। পাঁচ সংখ্যায় কেমন যেন একটা ম্যাজিক আছে কিংবা চোখের সামনে আপন হাতের পাঁচটা আঙুল যেন কোনো ইতস্তত প্রক্ষিপ্ত তথ্য, গল্প, প্রবাদ-সমষ্টিকে পাঁচের কোটায় ফেলতে চায়। বাইবেলের 'প্রাচীন নিয়মে' ( ওল্ড টেস্টামেন্ট ) হয়তো এই কারণই 'পেন্টাটয়েশ'='পঞ্চগ্রন্থ' আছে। এদানিং আমরা পাঁচ-শালার পরিকল্পনা করি।

তা সে যাই হোক, আমাদের এই তৃতীয়/দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত পঞ্চতন্ত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাচীন ইরানে পেহ্‌লেভি ( সংস্কৃতে পহ্‌লভী ) ভাষাতে অনূদিত হয়। তার একটা বাইরের কারণও ছিল। প্রাচীন ইরানের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীস রোমের সম্পর্ক বহুকালের। কখনো যুদ্ধের মারফতে, কখনো শান্তির। শান্তির সময় উভয়ে একে অন্যের উপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু দ্বিতীয়/তৃতীয় শতাব্দীতে ইরানীরা গ্রীসের উপর বিরক্ত হয়ে ( ফেড্ অপ্ ) পূবের দিকে মুখ

১ এই শঙ্খচূর্ণ নিয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে এদেশে একটা 'কেলেঙ্কারি' হয়ে যায়। যেসব শাঁখারী পূর্ব বাঙলা থেকে এসে পশ্চিম বাঙলায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের দরকার শঙ্খের। শঙ্খ প্রধানত বিক্রি হয় মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং তার অন্যান্য খরিদ্দার আরব দেশ, মিশর ইত্যাদি। তারা শাঁখ গুঁড়ো করে ওষুধ বানায়। আমাদের গরীব শাঁখারীরা যে দাম দিতে প্রস্তুত ছিল ( সোজাসুজি, না পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মারফৎ, আমার ঠিক মনে নেই ) আরবরা তার কিঞ্চিৎ বেশী দাম দিতে রাজী ছিল বলে মাদ্রাজ তাবৎ শঙ্খ বিক্রি করে দেয় ওদের। ফলে বহু শাঁখারী বেকার হয়ে যায়।

২ কোনো কোনো পণ্ডিতের ধারণা আরবীর এই 'ওয়া'—'অ্যাণ্ড'—এবং থেকে বাঙলা 'ও' এসেছে।

ফেরালে। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র রাজা খুসরৌ অনুশিরওয়ানের[৩] আমলে পহ্‌লভীতে এবং অল্পকালের ভিতরই পহ্‌লভী থেকে সিরিয়াকে অনূদিত হল।

এই প্রথম—সর্বপ্রথম কিনা বলা কঠিন—একখানা আর্য ভাষায় লিখিত পুস্তক আর্যেতর ভাষায় অনূদিত হল,[৪] কারণ সিরিয়াক ভাষা হীব্রু, আরামায়িক ও আরবীর মত সেমিতি ভাষা। ইরাক সিরিয়া অঞ্চলে প্রচলিত এই সিরিয়াক ভাষা ও সাহিত্য (৩য় থেকে ১৪ শতাব্দী পর্যন্ত এর আয়ু) বরাবরই ইরানের সঙ্গে লেনদেন রাখতো বলে পহ্‌লভীতে কোনো উত্তম গ্রন্থ অনূদিত হলে সেটি সিরিয়াকেও অনূদিত হত। (পঞ্চতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আরেকখানি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ পহ্‌লভী হয়ে সিরিয়াকে অনূদিত হয়, এর পরবর্তী যুগে মধ্যপ্রাচ্য ও ইয়োরোপে পঞ্চতন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশী সম্মান পায়—তার কথা পরে হবে।)

বিষ্ণুশর্মা রচিত পঞ্চতন্ত্রের কপাল ভালো। পহ্‌লভীতে যিনি এ পুস্তক অনুবাদ করেন তিনি ছিলেন রাজ-বৈদ্য, অতএব সুপণ্ডিত। সিরিয়াকে যিনি তস্যানুবাদ করেন তিনিও জ্ঞানীজন, কারণ এ গ্রন্থ অনুবাদ করার পূর্বেই তিনি কিয়ৎপরিমাণ গ্রীক দর্শনও কৃতিত্বসহ সিরিয়াকে অনুবাদ করেছিলেন।

পহ্‌লভী অনুবাদটি লোপ পেয়েছে, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে অনূদিত সিরিয়াক অনুবাদটি ("কলিলগ্ ও দমনগ্") এখনো পাওয়া যায়।

এর প্রায় দু'শ বৎসর পর—মোটামুটি হজরৎ মুহম্মদের জন্মের দেড় শ' বৎসর পর—জনৈক আরব আলঙ্কারিক পঞ্চতন্ত্র আরবীতে অনুবাদ করেন। আরবী সাহিত্যের তখন কৈশোরকাল। এই পুস্তক অনুবাদ করার সময় অনুবাদক আব্দুল্লা ইব্‌ন্ অল্-মুকাফ্‌ফার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তরুণ আরব সাহিত্যিকদের

৩ এই খুসরৌর আমলেই চতুরঙ্গ খেলা ভারত থেকে ইরানে যায়।

৪ তার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, এই সর্বপ্রথম সেমিতি জগতে ভারতীয় সাহিত্য পরিচিত হল। বস্তুত এর অনেক পূর্বেই জাতকের বহু গল্প কাফেলা [ক্যারাভান] ও চট্টির কথকদের [স্টরি-টেলার] মারফতে গ্রীস রোম পর্যন্ত চলে গিয়েছে। বৌদ্ধ শ্রমণরা খৃষ্টজন্মের পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তারও পূর্বে লোহিত সমুদ্রের কূল ধরে ধরে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে; এমন কি প্রাচীনতম মোনজোদড়োর সঙ্গে ইরাকের সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু উপস্থিত এগুলো আমাদের আলোচনার বাইরে। এবং বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করলে যে সব গ্রন্থ অনূদিত হয় সেও এ আলোচনার বাইরে।

শলী বৈ স্টাইল শেখানো—বিশেষ করে যারা 'ব্যাল-ল্যাৎর্' বা রম্যরচনায় হাত পাকাতে চান।[৫] পহ্লভী সিরিয়াক হয়ে আরবীতে পৌঁছতে গিয়ে বিষ্ণুশর্মা নামটি কিন্তু এমনই রূপান্তরিত হয়ে যায় যে আরবরা ভাবে, ইনি বিদ্যাপতি, এবং সেই অনুসারে তাঁর নাম লেখা হয় বীদ্‌বা বীদপা বীদপাই ( আরবীতে 'প' অক্ষর নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে কাছাকাছি অন্য দুই অক্ষর দিয়ে 'প' ও 'চ' বোঝাবার চেষ্টা করা হয় )। আরবী অনুবাদ হয় অষ্টম শতাব্দীতে এবং তার হীব্রু অনুবাদ দ্বাদশ শতকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জনৈক ক্যাথলিক কার্ডিনালের জন্য এটি লাতিনে 'ডিরেক্টরিয়ুম ভিট্যে হুমান্যে' ( অর্থাৎ মোটামুটি 'মানব-জীবনের জন্য হিতোপদেশ'—'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' যে সংশ্লিষ্ট সে কথা মধ্যপ্রাচ্যে জানা ছিল ) নাম নিয়ে ইয়োরোপে প্রচারিত হয়, এবং এই অনুবাদের উপর নির্ভর করে পরবর্তী কালে ইয়োরোপের প্রায় তাবৎ অর্বাচীন ভাষাতে 'বীদপাই-এর নীতিগল্প' বা 'কলীলা ও দিম্‌না' রূপে অনূদিত হয়ে প্রখ্যাতি লাভ করে।

'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র' 'হিতোপদেশে'র বিজয়-যাত্রা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করছেন স্বর্গত ঈশান ঘোষ। তাঁর অতুলনীয় জাতক অনুবাদের ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি পৃথকভাবে কথিত নহে। এক একটি তন্ত্রে এক একটি কথাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া তাহার আশেপাশে অন্য বহু কথা সংযোজিত হইয়াছে। উত্তরকালে অস্মদ্দেশে বেতাল পঞ্চবিংশতি ও হিতোপদেশ প্রভৃতি আরবে নৈশোপাখ্যানমালা এবং য়ুরোপে Decameron, Pentameron, Heptameron, Canterbury Tales প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাতেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। পঞ্চতন্ত্রের কথাগুলি উক্তরূপে এক সূত্রে নিবদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় দেশদেশান্তরে ভ্রমণের সময় ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।' এ অনুচ্ছেদ ঈশান

৫ অধীন এই উদ্দেশ্য নিয়েই বছর ষোল পূর্বে 'পঞ্চতন্ত্র' সিরিজ 'দেশ' পত্রিকায় আরম্ভ করে। নইলে বিষ্ণুশর্মার অনুকরণ করার মত দম্ভ আমার কখনো ছিল না। এর অল্প পরেই Indian Council for Cultural Relations-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকাকালীন মরহুম মৌলানা আজাদের নেতৃত্বে আমরা একখানা আরবী ত্রৈমাসিক ( 'সকাফৎ-উল-হিন্দ্' 'ভারতীয় সংস্কৃতি' ) প্রকাশ করি ও ঐ সময় মিশরাদি একাধিক দেশ থেকে অনুরোধ আসে যে, যেহেতু অদ্যকার 'কলীলা ওয়া দিমনা' ও 'পঞ্চতন্ত্রে' প্রচুর তফাৎ, অতএব আমরা যেন একখানি নূতন অনুবাদ প্রকাশ করি। আমরা সে কাজ সানন্দে প্রাগুক্ত পত্রিকায় আরম্ভ করি।

ঘোষ শেষ করেছেন, এই বলে—'হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, পঞ্চতন্ত্রকার অতি শুভক্ষণে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকমুখে বা গ্রন্থাকারে তাঁহার কথাগুলি সভ্য অসভ্য সর্ব দেশে যেরূপভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীতে অন্য কোনো পুস্তকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে নাই।'[৬]

অজহর বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে যে পুস্তক-বিক্রেতা আমাকে 'কলীলা ওয়া দিম্না' বিক্রি করে, সে ইঙ্গিত দেয়, আরেকখানি ভারতীয় পুস্তক কপ্ট খৃষ্টানরা ( এঁরা নিজেদের ফারাওয়ের বংশধর বলে দাবি করেন ) কিছুদিন পূর্বে আরবীতে পুনঃপ্রকাশ করেছেন।

তখন কপ্ট বন্ধুদের কাছে অনুসন্ধান করে জানতে পারি, এর আরবী নাম 'সুৎরহ বার্লাম ওয়া য়ুআসফ'। এ পুস্তকের প্রধান নায়ক দু'জন খৃষ্টধর্মে সেণ্টরূপে স্বীকৃত হয়েছেন—ক্যাথলিক উভয়কে স্মরণ করেন ২৭ নভেম্বর ও য়ুআসফকে গ্রীক চার্চ স্মরণ করেন ২৬ অগস্ট ( সেণ্টস্ ডে )।

তখন অনুসন্ধান করে দেখি, 'য়ুআসফ' নাম এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে ও 'বার্লাম' এসেছে 'বুদ্ধ ভগবান'-এর 'ভগবান্' থেকে!

এ পুস্তকের কাহিনী পঞ্চতন্ত্রের চেয়েও বিস্ময়জনক॥

২।৪।৬৬

---

৬ ঈশান ঘোষের বাঙলা জাতক কী জর্মন, কী ইংরিজি, কী হিন্দী সব জাতকানুবাদের চেয়ে শত গুণে শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ পরিশ্রম ও অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ঈশান এই অনুবাদ সম্পন্ন করে বঙ্গবাসীকে চিরঋণে আবদ্ধ করে গেছেন। এ অনুবাদ প্রকাশিত হলে পর পালিপাণ্ডিত্যে আরেক ধনুর্ধর বিশ্বভারতীর অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী এর সমালোচনা করেন। পরম লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় ঈশানের অনুবাদ বহু বৎসর পূর্বে নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও এর পুনর্মুদ্রণ হয় নি। শুনতে পাই, সাহিত্য আকাদেমি স্বর্গত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙলা কোষ পুনর্মুদ্রণ করেছেন। তাঁরা যদি ( বিধুশেখরের আলোচনা সহ ) এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে সহায়তা করেন তবে গৌড়জন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

# বার্লাম ও য়োসাফট্

ইয়োরোপীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের চার-পাঁচটি ভাষা নিয়ে প্রায় ষাটটি ভাষায় অনূদিত 'বার্লাম ও য়োসাফট্' ইয়োরোপে ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকে খৃষ্টান মঠে তথা সাধুসন্ত ও পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সমাদৃত হয়ে ক্রমে ক্রমে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রধান কারণ, অতি সুমধুর সরল গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে বর্ণিত খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য ইতিপূর্বে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের কোনো ভাষাতেই রচিত হয় নি—এমন কি, খৃষ্টধর্মের প্রাচীনতম প্রধান বাহক গ্রীক, লাতিন এবং হীব্রুতেও না। তাই দেখতে পাই, ইংলণ্ডে ছাপাখানা নির্মিত হওয়ার পর উইলিয়াম ক্যাকস্টন যে-সব পুস্তক ছাপান, তার মধ্যে এই পুস্তকটিও ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদে আছে। অবতরণিকারূপে এখানে এ-পুস্তক সম্বন্ধে আরো বহু বিস্তর চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান তত্ত্ব তথ্য নিবেদন করা যায়, কিন্তু আমাদের ধারণা, পুস্তকের উপাখ্যানটি এস্থলে অতিশয়তম সংক্ষেপে বর্ণনা করে নিলেই সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করা হবে—পাঠক নিজের থেকেই অনেক-কিছু কল্পনা করে নিতে পারবেন।

ভারতবর্ষে এক পরাক্রমশালী নরপতি পুত্রহীন অবস্থায় অতিশয় মনোকষ্টে দীর্ঘকাল জীবনযাপন করার পর এক অভূতপূর্ব সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন পুত্রসন্তান লাভ করেন। মহাসমারোহে তাঁর নামকরণ করা হল য়োসাফট্ (গ্রীক অনুবাদে Josaphat) এবং রাজা সে-যুগের শ্রেষ্ঠতম শ্যালডীয় (Chaldaean) জ্যোতিষীদের নিমন্ত্রণ ক'রে রাজপুত্রের জন্মকুণ্ডলী নির্মাণ করার আদেশ দিলেন। তাঁরা সবাই একবাক্যে রাজাকে জানালেন, নবজাত কুমারের ভবিষ্যৎ সর্ব গৌরব ধারণ করে এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তিনি হবেন বিরলতম মহাত্মাদের মধ্যে বিরল, কিন্তু তিনি পিতৃ-পিতামহের সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করে সত্যধর্মের সন্ধানে গৃহত্যাগ করবেন। বলা বাহুল্য, নৃপতি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হলেন এবং এই মর্মন্তুদ ভবিষ্যদ্বাণী যাতে সফল না হয়, তার জন্য মন্ত্রণা গ্রহণ করে আদেশ দিলেন, রাজপুত্রকে যেন পরম রমণীয় এক রাজপ্রাসাদের ভিতর চিত্তাকর্ষণীয় সদানন্দময় পরিবেশে রাখা হয়। প্রাসাদ থেকে বাইরে এসে তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই জরামৃত্যুর (ইংরেজী অনুবাদ আছে misery and death, জর্মনে আছে ঐ একই—Elend und Tod, খুব সম্ভব জরার প্রকৃত প্রতিশব্দ ইয়োরোপীয় কোনো ভাষাতেই নেই বলে তৎপরিবর্তে 'মিজরি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে) সংস্পর্শে না আসতে পারেন; রাজা অনুমান করে নিয়েছিলেন, সদাসুখীজন যে

পরিবেশে আনন্দ লাভ করেছে, সেটা পরিবর্তন করে সে অন্য পরিবেশের সন্ধানে যাবে 'কোন্ দুঃখে' ?

কাহিনীর এই অংশটুকু শোনামাত্রই যে-কোনো ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বত-চীন-জাপান-শ্যামবাসীর মনে উদয় হবে, এ-যেন বড় চেনা-চেনা ঠেকছে, এ কি যুবরাজ সিদ্ধার্থের জীবনী নয় ? তাই যদি হয়, তবে সে-কাহিনী সর্বধর্মের সর্ব-সজ্জনকে উৎসাহ এবং আনন্দ দান করলেও সেটি খৃষ্টধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থরূপে সম্মানিত হবে কি প্রকারে ? কাহিনীর পরের অংশটুকু শুনলেই সেটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হবে। কিছুটা আগেও বলা হয়েছে, সেটা আমি ইচ্ছে করেই আগে বলি নি, কারণ, তা হলে সিদ্ধার্থকে চিনতে পাঠকের অসুবিধা হত।

কাহিনীতে আছে, রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করার পূর্বেই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল ( এটা অবশ্যই সত্য নয়, এবং এরকম আরো পরিবর্তন পরিবর্ধন পাঠক পাবেন ; কি উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলো করা হয়েছিল, পাঠক ক্রমশ বুঝতে পারবেন )[১] কিন্তু যুবরাজের পিতা সে ধর্মের ঘোরতর শত্রু ছিলেন এবং রাজ্যে তার প্রসার বেড়ে যাচ্ছে দেখে রাজাদেশ প্রচারিত করেন যে প্রজাসাধারণ, পাত্র-অমাত্য যে কেউ এই নবীন ধর্ম গ্রহণ প্রচার প্রসার করবে, সে দণ্ডনীয় হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজারই এক অন্তরঙ্গ সখা এবং মন্ত্রী খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণা করার জন্য মরুভূমিতে চলে যান ( মিশরের খৃষ্টান সাধুরা দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে প্রায়শ লীবিয়া-মরুভূমিতে অন্তর্ধান করতেন )। রাজাদেশে তাঁকে খুঁজে মরুভূমি থেকে ফিরিয়ে আনালে পর তিনি রাজসভায় তাঁর আচরণ বোঝাতে চেষ্টা করেন ও ক্ষমাভিক্ষাও করেন। রাজা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে নিজ রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেন।

এদিকে রাজপুত্র যৌবনে পদার্পণ করে আর প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকতে

১ ধর্মের ইতিহাসে এটা কিছু নূতন নয়। কাঠিয়াওয়াড়ের হিন্দু লোহানা রাজপুতদের ইসমাঈলীয়া ( ইসলামেরই এক ) সম্প্রদায়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কাহিনী নির্মিত হয় যে, হিন্দুদের যে কল্কি অবতারের আবির্ভূত হওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, ইতিমধ্যে মক্কা নগরে হজরৎ আলীরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। সত্যপীরও তুলনীয়।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে ফন হফমান্‌স্‌টালের কবিতার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আলোচনা হয় তিনিও এই গ্রন্থের গল্প মূলসূত্ররূপে নিয়ে তাঁর সৃজনীশক্তির প্রকাশ দেখিয়েছেন। নাম 'ইয়েডেরমান' = 'এভরিবডি'।

চাইলেন না; তাঁর ইচ্ছা, তিনি বাইরের বিশাল জগতে বেরিয়ে গিয়ে সেখানে নব নব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং সেই মর্মে পিতার অনুমতি ভিক্ষা করলেন। অতিশয় অনিচ্ছায় তিনি সম্মত হলেন। ফলে রাজপুত্র ক্রমে ক্রমে এক এক জন করে অন্ধ, কুষ্ঠরোগী, জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ও সর্বশেষে একটা মৃতদেহ দেখতে পেয়ে ব্যথাতুর হয়ে এর কারণ সম্বন্ধে কাতর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং উত্তরে শুনতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব মানুষমাত্রেরই ললাটে লেখা আছে। অত্যন্ত বিচলিত ও অভিভূত হয়ে তিনি অনুসন্ধানের ফলে আরো জানতে পান, এসব দুঃখ-দুর্দৈব থেকে চিরতরে নিষ্কৃতি পাবার পন্থা জানেন শুধু এক শ্রেণীর সাধুসন্ত—তাঁরা সংসার ত্যাগ করে নির্জনে ধ্যান-ধারণায় মগ্ন থাকেন। রাজপুত্রের প্রবল ইচ্ছা হল, এঁদেরই মুখ থেকে তিনি তত্ত্বকথা শুনবেন, কিন্তু তাঁর সে-ইচ্ছা পূর্ণ করা অসম্ভব, কারণ তাবৎ সাধুসন্তকে রাজাদেশে দেশ থেকে নির্বাসিত করে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে এক অতিশয় পূতপবিত্র তথা ধর্মজ্ঞ সাধু মণিকারের ছদ্মবেশ পরে রাজসভায় আবির্ভূত হলেন এবং রাজপুত্রের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বকথা তাঁকে বোঝাতে লাগলেন। সে সময় তিনি নানা গল্প, নানা কাহিনী কীর্তন করে সংসারের অসারতা ও প্রকৃতধর্ম কি, সে-সব সপ্রমাণ করেন।

(এই গল্পগুলো গ্রন্থের চিত্তাকর্ষক অংশ গ্রহণ করে আছে। এগুলোর অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে নিয়ে ইউরোপে প্রচুর গবেষণা করা হয় তবু সবগুলোর মূল তখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি, হয়তো কখনো পাওয়া যাবে না। তবে কয়েকটি নিঃসন্দেহে জাতক থেকে নেওয়া হয়েছে [ আশ্চর্য! স্বয়ং বোধিসত্ত্ব যে-সব গল্প জাতকে বলে গেলেন, য়োসাফট্‌রূপে তাঁকে আবার সেগুলোই উপদেশ-রূপে শুনতে হল। ] এবং কিছু মহাভারত থেকেও। এদেশে কোথায় কি পরিমাণ গবেষণা হয়েছে সেকথা বলা কঠিন—এই গ্রন্থ নিয়ে কোনো গবেষণা আমার চোখে পড়ে নি। এ কর্ম করার সর্বাপেক্ষা শাস্ত্রাধিকার ছিল স্বর্গত ঈশান ঘোষের। তিনি তাঁর জাতক-অনুবাদের উপক্রমণিকায় এ পুস্তক নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেখানে স্থান সংকীর্ণ এবং এর গল্পগুলো ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন পাঠে বড়ই ভিন্ন ভিন্ন—এমন কি জাপানী 'শক জিৎসু-রকু'ও যে এ-আলোচনায় স্থান পায় সে তত্ত্ব কয়েক বৎসর পূর্বে জর্মন গবেষক-গোষ্ঠী উল্লেখ করে গেছেন এবং এ দেশে বসে সেগুলো সংগ্রহ করা অসম্ভব না

হলেও সুকঠিন।)

যে-মণিকার রাজপুত্রকে উপদেশ দিলেন তিনিই এ গ্রন্থের বার্লাম। রাজপুত্র মনস্থির করলেন, তিনি বার্লামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। এ সংবাদ শুনে রাজা ক্ষোভে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায়। সর্ব প্রথমেই তিনি বার্লামকে বন্দী করবার আদেশ দিলেন, কিন্তু তিনি ততক্ষণে নগর ত্যাগ করেছেন। রাজা যখন দেখলেন পুত্র কিছুতেই সংকল্প ত্যাগ করবেন না তখন তিনি ধূর্ত পন্থা অবলম্বন করলেন। নাকোর নামক এক অচেনা জনকে তিনি নিযুক্ত করলেন, সে এসে সভাস্থলে খৃষ্টধর্মের স্বপক্ষে দুর্বল, ভ্রমাত্মক যুক্তি প্রয়োগ করে তর্কযুদ্ধে সভা-পণ্ডিতদের কাছে হেরে যাবে; এই করে খৃষ্টধর্ম সর্বজনসমক্ষে লাঞ্ছিত হলে যুবরাজ নিশ্চয়ই বার্লামের অনুসরণ করার ব্যর্থতা বুঝতে পারবেন। কিন্তু রাজপুত্র সংবাদ পেয়ে গোপনে নাকোরকে এমনই তিরস্কার করলেন যে, সে শেষ পর্যন্ত রাজসভায় বাগ্মিতাসহ অব্যর্থ যুক্তিজাল বিস্তার করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করল। এর পর নাকোরও খৃষ্ট সাধুরূপে নির্জন ভূমিতে অন্তর্ধান করে। রাজা তখন জাদুকরের শরণাপন্ন হলেন। সে তখন পার্থিব ভোগ-বিলাসের মায়াজাল বিস্তার করে যুবরাজকে প্রলোভিত করার চেষ্টা দিয়ে নিষ্ফল তো হলই পক্ষান্তরে যুবরাজ তাঁকে একটি কাহিনী বলে স্বধর্মে দীক্ষিত করলেন। এর সঙ্গে মার-এর মিল দেখা যাচ্ছে, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রে সে ধ্যানী বোধিসত্ত্বকে প্রচুর মারণাস্ত্র দিয়ে ভয়ও দেখায়।

সর্বশেষে রাজপুত্র বোধিসত্ত্ব বা য়োসাফট্‌রূপে রাজপুরী ত্যাগ করে বার্লামকে খুঁজে পেলেন। তাঁকে সখা ও সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে উভয়ে ধ্যান-ধারণায় নিমজ্জিত হলেন।

* *

এ গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের কাহিনী নিয়ে তার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম জুড়ে দিয়ে সে ধর্মের যে জয়জয়কার করা হল তার প্রণেতা কে জানবার উপায় নেই। পঞ্চতন্ত্রের মত এ-গ্রন্থও রাজা খুসরোর আমলে পহ্‌লবীতে অনূদিত হয় এবং ওরই মত, তারপর, সীরিয়াকে। তার থেকে হয় গ্রীক অনুবাদ এবং উপক্রমণিকায় বলা হয় 'একটি উপকারী কাহিনী···আবিসিনিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশ—যার নাম ভারতবর্ষ (!)—সেখান থেকে এটি আনয়ন করেন সাধু জন্।' ওদিকে আরবী অনুবাদও হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে গ্রীক অনুবাদের চেয়েও স্পষ্টতররূপে ধরা পড়ে যে এর মূল ভারতে ও বৌদ্ধধর্মে। এর পর লাতিন অনুবাদ এবং তার থেকে ইয়োরোপীয় সর্বভাষায়।

'বিষ্ণুশর্মা' প্রসঙ্গে নিবেদন করছি য়োসাফট্ এসেছে 'বোধিসত্ত্ব' থেকে ( আরবীতে আদ্যস্থলে 'ব' ও 'য়'-তে মাত্র একটি বিন্দুর পার্থক্য আছে বলে হয়ে যায় য়োদাসাফ ) এবং বার্লাম ( বুদ্ধ ) 'ভগবান' থেকে।

অতএব এক বুদ্ধদেব যদি দুই মূর্তি ধারণ করে খৃষ্টধর্মে সেণ্ট বা সন্তরূপে পূজা পান তবে নিশ্চয়ই আমাদের আনন্দের কথা॥

৯।৪।৬৬

## রবি-মোহন-এন্‌ড্রুজ

কয়েক দিন পূর্বে একখানা চটি বইয়ে রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাজী ও এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে একটি বিবরণীতে দেখি, আর সবই আছে, নেই শুধু একটি কথা :—এন্‌ড্রুজের পরলোকগমনের পর তাঁর স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হলেন কে, এবং সেই মহৎ চিন্তা মৃন্ময়রূপ দেবার জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কে, এবং এন্‌ড্রুজ ফাণ্ডের আজো সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট আছে—যদি আদৌ থাকে—তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাবো কাকে ?

অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ[১] হয় যে সময়, তখন রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমে। শুনেছি, সে-সময় তিনি নাকি সে-আন্দোলনের প্রশংসাই করেছিলেন। ফেরার সময় বোম্বায়ে নেমে তাঁর মত পরিবর্তন হয়, এবং আন্দোলনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষায় একাধিক প্রবন্ধে আপন মতামত ব্যক্ত করেন ( দ্বিজেন্দ্রনাথ কিন্তু বরাবরই গাঁধীকে উৎসাহ-হিম্মৎ যুগিয়ে যান )। এন্‌ড্রুজ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর

---

১ 'গুরুচণ্ডালী' নিয়ে আলোচনা একাধিক স্থলে দেখেছি। চলতি ভাষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এটাকে অমার্জনীয় অপরাধের অনুশাসনরূপে সম্মান করা হত—যদিও যে দ্বিজেন্দ্রনাথকে কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞরূপে সশ্রদ্ধ সম্মান জানাতেন, তিনি স্বয়ং সে অনুশাসন তাঁর কঠিনতম সংস্কৃত শব্দে পরিপূর্ণ বাংলা দর্শনগ্রন্থে পদে পদে লঙ্ঘন করতেন, এবং সকলকেই সে উপদেশ দিতেন। চলতি ভাষা চালু হওয়ার পর, পরলোকগমনের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও লেখেন 'গুরুচণ্ডালী এখন আর অপরাধ নয় ( 'বাংলা-অলঙ্কারের পিনাল-কোড থেকে গুরুচণ্ডালী সরিয়ে দেওয়া হল'—ধরনের অভিব্যক্তি )। অধীন দ্বিজেন্দ্রনাথের আদেশ বাল্যাবস্থা থেকেই মেনে নিয়েছে, যদ্যপি সে সদাই 'লড়াই শুরু হল' এবং 'যুদ্ধ আরম্ভ হল' তথা 'মোকদ্দমা শুরু হল' এবং 'তর্কবিতর্ক আরম্ভ হল' এ'দুয়ে পার্থক্য মেনে চলেছে।

উভয়েরই অতিশয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—( এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা সহকর্মী বিধুশেখর বা ক্ষিতিমোহনের মতো তো ছিল বটেই, বেশী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না )—তাই অনেকেই তাঁকে 'শান্তিনিকেতন-সাবরমতী-সেতু' নাম ধরে উল্লেখ করতেন।

এন্‌ড্রুজের ধর্ম ছিল দীননারায়ণের সেবা। ধর্মসঙ্গত রাজনৈতিক আন্দোলন-বিবর্তন সর্বদাই দীনের উদ্দেশে নিয়োজিত হয়; তাই সাক্ষাৎ রাজনীতি এড়িয়ে চললেও এন্‌ড্রুজ গাঁধী-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই এই মহান আন্দোলনের ব্যাপারে ভারতবর্ষের দুই মনীষীর মধ্যে মতানৈক্য যে সর্ব-প্রকারের ক্ষতিসাধন করতে পারে, সে-বিষয়ে তিনি সচেতন হন; তিনি মন স্থির করলেন, পত্র-পত্রিকার মারফৎ উভয়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক ভালো হয়, উভয়ে একসঙ্গে মিলিত হয়ে যদি ভাবের আদান-প্রদান করেন। বলা বাহুল্য গাঁধী-রবীন্দ্রনাথের সৌহার্দ্য জন্মায়, যখন গাঁধী এর কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় আমন্ত্রণে আফ্রিকা ত্যাগ করে সদলবলে শান্তিনিকেতন আশ্রমে যোগ দেন ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে সেখানে ছয় মাস থাকেন ( তখনো কলেজ-বিভাগ বা বিশ্বভারতীর জন্ম হয় নি )।

এ-আলোচনা হয় কলকাতায়, এবং এক এন্‌ড্রুজ ছাড়া সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন না।

কিন্তু কবির মত চিত্রকরও শুধু যে নব নব সৃজন কর্মে লিপ্ত থাকেন তাই নয়, নব নব গোপন তত্ত্ব, সৌন্দর্য আবিষ্কার করে রসিকজনের সম্মুখে রাখতে চান। কবি রবির ভ্রাতুষ্পুত্র 'ছবি-রবি' অবন ঠাকুর তাই মনে মনে ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীর মত মনীষী এ দেশে নিত্যি নিত্যি জন্মায় না; নিভৃতে এ দোঁহার মিলনের অন্তত সামান্য কিছুটাও যদি না দেখতে পেলুম, তবে এ-জীবনে দেখলুমটা কি? কথাটা ঠিক; হিমালয় আল্‌প্‌সে মিলন হয় না,—কিন্তু এ-মিলন তো তারো বড়ো।

উপযুক্ত তাবৎ কাহিনী আমি অন্যত্র সবিস্তর দিয়েছি বলে এস্থলে সংক্ষেপে সারি, কারণ অন্যকার কীর্তন ভিন্ন। 'অবন-ঠাকুর' চুপসে দরজার চাবির ফুটো দিয়ে এক লহমার তরে স্থিরদৃষ্টিতে দেখে নিলেন ভিতরকার 'ছবিটি'। সেইটেই তিনি এঁকে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে—যেখানে ঐ তিনজনের দুজনা, অর্থাৎ কবি ও এন্‌ড্রুজ স্থায়ীভাবে বাস করেন।

কিন্তু মূল কথায় ফিরে যাই—এটুকু শুদ্ধমাত্র এ-তিন মহাপুরুষের অন্তরঙ্গতা বোঝাবার জন্য পটভূমি নির্মাণ।

* *

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ( খুব সম্ভব ) গ্রীষ্মকালে অকস্মাৎ মহাত্মাজী অবতীর্ণ হলেন বোম্বাইয়ের জুহুবীচে। যুদ্ধ এবং জনরবে ভারতবর্ষ তথা তাবৎ পৃথিবী তখন গমগম করছে। প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর ইয়োরোপ জয় করার পর হিটলার তখন সদর্পে ককেশাসের তেল পানে ধাওয়া করবেন বা করেছেন—এমন সময় টলটলায়মান ইংরেজের চরম দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে ডমিনিয়ন বিয়ণ্ড দি সীজ-এর অন্যতম ভারতবর্ষ আরেকটা স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করবে কি? এই ছিল তখন দেশবিদেশে সর্বমুখে একমাত্র প্রশ্ন।

এমন সময় গাঁধী নামলেন জুহুবীচে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়জনক ব্যাপার; —যে গাঁধীকে আপাতদৃষ্টিতে সরল, ভালোমানুষ বলে মনে হয়, তিনি যে সাংবাদিকদের এড়াবার জন্য কত হুম্বুর-হেকমৎ রপ্ত করে বসে আছেন, সে তত্ত্বটি হাড়ে হাড়ে বিলক্ষণ জানে ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা—সেই গাঁধীই ডেকে পাঠিয়েছেন, নিজে যেচে, প্রেস-কনফারেন্স্। তিনি নাকি সর্বপ্রশ্নের উত্তর দেবেন।

এদিকে তিনি জুহুবীচে নেমেই খবর পাঠিয়েছেন বোম্বায়ের আশ্রমিক সঙ্ঘকে। তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনবেন।

বোম্বায়ে বিস্তর শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী আছে—তাঁদের প্রায় সবাই গুরুদেবের দু'দশটা গান গাইতে পারে, আর মহারাষ্ট্রবাসী হলে তো কথাই নেই, তারা গুরুদেবের কালোয়াতী গান পর্যন্ত গাইতে পারে, দু'একজন নিধুবাবু ঢঙে গুরুদেবের টপ্পা তক দখল করে বসে আছে। কিন্তু সব সময় সবাই তো আর বোম্বায়ে থাকে না। তবু ছিলেন সর্বাধিকারী স্বর্গত বচুভাই শুক্ল; ইনি শান্তিনিকেতনে প্রচলিত—অর্থাৎ সেখানে 'দৈনন্দিন এবং পালপরবে গীত—সব কটার এবং আরো প্রচুর অচলিত সুর আপন বিরাট দিলরুবাতে বাজাতে পারতেন। তারপর ছিলেন পিনাকিন ত্রিবেদী, গোবর্ধন মপারা, সুশীলা আসর ইত্যাদি। আমিও ছিলুম বচুভাইয়ের অতিথিরূপে। কিন্তু সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ আমার মত 'বেতালাকে' কাবু করতে পারেন এমন বেতাল-সিদ্ধ এখনো জন্মান নি!

আশ্রমিক সঙ্ঘ, এবং অধিনায়করূপে বচুভাই পড়লেন দুশ্চিন্তায়। গাঁধীজী কোন্ কোন্ গান শুনতে চাইবেন, বা কেউ গাইলে শুনতে ভালোবাসবেন সে

সম্বন্ধে কারোরই কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা বা আপন ধারণা নেই—বস্তুত শান্তিনিকেতনে বাসকালীন এবং বিশেষ করে সে-স্থল ছাড়ার এত যুগ পরেও যে তাঁর রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ রয়েছে সে-তত্ত্ব প্রাক্তন ছাত্রদের প্রায় কেউই জানতো না। অবশ্য অনেকেই জানতো 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' গানটি তাঁর বড়ই প্রিয় ( এবং সেই কারণেই নিউমেনের 'লীড কাইনড্‌লি লাইট এমিড্‌স্ট্ দি এন্‌সার্‌ক্লিং গ্লুম।' )।

আমি বললুম, 'এটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গাঁধীজী যে-সময়টা আশ্রমে কাটান, ঠিক সেই সময়ে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতই পাবে পয়লা নম্বর—বা ফার্স্ট প্রেফারেন্‌স্ তারপর নিশ্চয়ই স্বদেশী গান ( এখন যাকে গাল-ভরা নামে ডাকা হয় 'দেশাত্মমূলক সঙ্গীত' ), তার পর মন্দিরে উপাসনার সময় যে কটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাওয়া হয়। এর পরও আছে—কিন্তু অদ্দূর আমার এলেম যায় না, যেমন মনে করো গুরুদেব তাঁর আপন পছন্দের যে-সব গান বাছাই করে তাঁকে শুনিয়েছেন তাঁর হদীস পাবো কোথায়!' সবাই এক বাক্যে আমার বক্তব্য স্বীকার করে বললে, 'এই তিন দফেতে যে-সব গান পড়ে তারই সব কটা এত অল্প সময়ে কোরাসে তৈরি করা প্রায় অসম্ভব। অতএব এই নিয়েই উপস্থিত সন্তুষ্ট থাকা যাক।' আমি তখন স্কেল টি-স্কোয়ার সেট-স্কোয়ারসহ—কথার কথা কইছি—লেগে গেলুম জরিপ করতে, মহাত্মাজী যে-সময়টায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন ঠিক সেই সময়ে গুরুদেব কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন ( এস্থলে একটি ফরিয়াদ জানিয়ে রাখি : যাঁরাই গুরুদেব নিয়ে কোনো কাজ করতে চান, তাঁরাই চান, গুরুদেবের কবিতা যে রকম কালানুক্রমিক পাওয়া যায়, গানের বেলাও ঠিক সেই রকম হওয়া উচিত, বরঞ্চ বেশী উচিত। আমার এক মিত্র 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এরই অভাবে দিশেহারা হয়ে এগুতে পারছেন না। তাঁর মূল প্রশ্ন, একটা বিশেষ সময়ের পর—মোটামুটি ১৯১৮—রবীন্দ্রনাথ কি একেবারেই আর কোন ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন নি? করে থাকলে কটি?) অবশেষে কষ্টেশ্রেষ্ঠে মোটামুটি একটি ফিরিস্তি তৈরি হল। বেশীর ভাগ গায়কই গুজরাতী ; তাদের পছন্দের ধর্মসঙ্গীত—যেগুলো কারো না কারো ভালো করে জানা ছিল—সেগুলোও কোরাসে শিখে নেওয়া হল। সকলেরই এক ভরসা—গাঁধীজীর সুরজ্ঞান খুব একটা টনটনে নয়, মহারাষ্ট্রের মত গাঁধীর জন্মভূমি কাঠিওয়াড়-গুজরাতে গান-বাজনার প্রাচীন সর্বব্যাপী কোনো ঐতিহ্য নেই।

"শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর" শেষটায় এল। ওরা ধরে নিয়েছিল আমি সঙ্গে যাব। আমার এক কথা 'ক্ষেপেছ! আমি না পারি গাইতে, না জানি

বাজাতে। আমাদ্বারা কোনোপ্রকারের শোভাবর্ধনই হবে না—"শোভা" জিনিসটাই গাঁধীজী আদৌ পছন্দ করেন না।'

* *

মহাত্মাজী বললেন, 'গাও।'

ওরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'কি গান···?'

'তোমাদের যা জানা আছে।'

এসব আমার শোনা কথা। তার উপর ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে। সঠিক মনে নেই, প্রাক্তনদল সকলের পয়লাই রঙের টেক্কা, অর্থাৎ 'জীবন যখন শুকায়ে যায়—' মেরেছিল, না সেটাকে তাঁর আদেশের জন্য জীইয়ে রেখেছিল। কিন্তু মোদ্দা, তারা এক একটা গান শেষ হলে যখন থামে, তখন তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানান, এবং আরো গাইবার ইঙ্গিত করেন। তারা দু'একবার চেষ্টা দিয়েছিল গাঁধীজীর আপন পছন্দ জানাবার জন্য—ফলোদয় হয় নি।

সর্বশেষে মহাত্মাজী দু'একটি প্রশ্ন শুধোন। কেউ উত্তর দিতে পারে নি। মারাঠী মপারা বাড়ি ফিরে তো আমাকে এই মারে কি তেঁই মারে! আমি থাকলে নাকি চটপট উত্তর দিয়ে দিতুম। আমি বললুম, 'এগুলোর উত্তর তো বচুভাইও জানে, তদুপরি সে ওয়াডওয়ান অর্থাৎ গাঁধীজীর মতই কাঠিওয়াড়ের লোক—গুজরাতী—না, খাস কাঠিওয়াড়িতেই উত্তর দিয়ে তাঁর জান ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো!' সে নাকি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। 'আমি হতুম না, কি করে জানলে! ঐ সিংগির সামনে!'

কিন্তু এত বাহ্য!

আসলে পূর্বোল্লিখিত প্রেস-কন্‌ফারেন্স্ গাঁধীজী ডাকিয়েছিলেন ঐ দিনই, ঐ সময়ই, ঐ স্থলেই।

এখন আমি যা নিবেদন করবো, সেটা ঐ সময়কার খবরের কাগজ নিয়ে চেক্ অপ্ করে সন্দেহ-পিচেশ তথা গবেষক-পাঠক ধরে ফেলতে পারবেন, আমি কী "দারুণ" "গুল্‌মুগীর"! আলঙ্কারিকার্থে কিন্তু আমি "যদু" পতি বা "রাখাল" রাজা হওয়ার মত তাদের লক্ষাংশের একাংশ শক্তি ধরি নে বলে আমি নাচার; বেচারার পক্ষে গুল্ মারাই একমাত্র চারাহ্!

যতদূর মনে পড়ে সেই এণ্ডেমণ্ডে বিজড়িত ভারতের সর্বজাতের সাংবাদিক-গণই সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

গান শেষ হলে মহাত্মাজী ওঁদের বললেন, 'তোমাদের কি কি প্রশ্ন আছে,

শুধোও।' আর যায় কোথায়! দুনিয়ার যত রকম প্রশ্ন; আবার নূতন করে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হবে কি, এই কি তার জন্য উৎকৃষ্টতম মোকা নয়—মিত্রপক্ষ চতুর্দিকে বেধড়ক মার খাচ্ছে, আরম্ভ হলে কি প্রকারে হবে, ট্যাক্স বন্ধ করে না নয়া কোনো টেকনীকে, ১৯২০-এর মত ছাত্রদের ডাকা হবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি?

গাঁধীজী তাঁর চিরাচরিত ধৈর্যসহ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন—যদ্যপি আমার মনের উপর তখনকার, অর্থাৎ পরের দিনের খবরের কাগজ পড়ার পর যে দাগ পড়েছিল সেটা বোধ হয় এই যে, মোক্ষম প্রশ্নগুলো মহাত্মাজী এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ঐ সময়ে ভবিষ্যতের তাবৎ প্ল্যান ফাঁস করে দেওয়া যে সদ্বুদ্ধির কর্ম হত না, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

হঠাৎ মহাত্মাজী দু হাত তুলে প্রশ্নধারা নিরুদ্ধ করে বললেন, 'আমি বেনে। বেনে কাউকে কোনো জিনিস মুফতে দেয় না। আমিও খয়রাৎ করার জন্য তোমাদের ডাকি নি। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তো শুনলে। এবার আমার কথা শোনো। পোয়েট গত হওয়ার পূর্বে (তখনো বোধ হয় এক বছর পূর্ণ হয় নি) আমাকে আদেশ করেন, আমাদের উভয়ের বন্ধু এন্‌ড্রুজের স্মৃতিরক্ষার্থে যা কর্তব্য তা যেন আমি আপন কাঁধে তুলে নি। এখন দেখতে পারছি, আসন্ন ভবিষ্যৎ বড়ই অনিশ্চিত। তাই আজই আমি "এন্‌ড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ড"-এর জন্য অর্থসঞ্চয় আরম্ভ করলুম। দাও।'

মপারা রিপোর্ট দিতে গিয়ে আমায় বলেছিল, 'গাঁধীজী অনেকক্ষণ ধরে এন্‌ড্রুজ সম্বন্ধে বলেছিলেন, in a very touching manner। আর তার পর মহাত্মাজীর সামনে পড়তে লাগল, টাকা, পুরো মনিব্যাগ, গয়না, রিস্টওয়াচ, আংটি, কত কী! যেন বানের জলে ভেসে আসছে দুনিয়ার কুল্লে মূল্যবান জিনিস। অনেকে এমনই যথাসর্বস্ব দিয়ে ফেলেছিল যে, বোম্বায়ে ফেরার জন্য টিকিট কাটার পয়সা পর্যন্ত তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু জানেন তো, রেলও এখন আর পুরোপুরি ইংরেজের নয়। ভিলেপার্লে থেকে চার্চ গেট স্টেশন—সবাই জানে, কেন এদের টিকিট নেই।'

ফাণ্ডের টাকা যখন জমে উঠছে, তখন কে একজন বললে, 'মহাত্মাজী, এখন এসব কেন? স্বরাজ পাওয়ার পর এসব কাজ তো রাতারাতি হয়ে যাবে।'

আজ সত্যই আমার হাসিকান্নায় মেশানো চোখের জল নেমে আসে—এই ব্যক্তিটির ঐ মন্তব্যটির স্মরণে। তারই মত আমরা সবাই তখন ভাবতুম,

ইংরেজই সর্ব নষ্টের মূল। বিহারে ভূমিকম্প হলে ইংরেজই দায়ী, মেদিনীপুরে সাগর জাগলে ওটা ঐ ইংরেজেরই দুষ্কর্ম! ইংরেজকে খেদিয়ে দিয়ে স্বাধীন হওয়া মাত্রই—

When we shall have attained liberty, all those will be mere trifles!

গাঁধীজী সঙ্গে সঙ্গে মোক্ষম গরম, কড়া গলায় জবাব দেন, 'But Tagore did not wait to be born till India has attained her liberty!'

পরাধীন ভারতে যদি কবি জন্ম নেন, তবে তাঁর সখার স্মৃতিরক্ষার ভার পরাধীন ভারতের স্কন্ধেই!

তাই বলছিলুম, হাসি পায়, কান্নাও পায়—তখন আমরা কী naif (প্রায় 'ন্যাকার' মত)-ই না ছিলুম, যে বিশ্বাস করতুম—স্বরাজ পাওয়ার পরই 'পাঁচ আঙুল ঘিয়ে' আর 'ডেগ-এর ভিতর গর্দান ঢুকিয়ে ভোজন!'

তাই কি রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী বলেছিলেন, (উদ্ধৃতিতে ভুল থাকলে ক্ষমা চাইছি) 'একদিন (স্বরাজ লাভের পর) যেন না বলতে হয়, ইংরেজই ছিল ভালো!'

* *

কিন্তু কোথায় গেল সেই 'এনড্রুজ ফাণ্ড' যার মোটা টাকাটা তুলেছিলেন গাঁধীজী?

তা সেটা যেখানে যাক, যাক! দুঃখ এই, সেই চটি বইয়ে এবং অন্যত্র 'এ্যানড্রুজ ফাণ্ডে'র কথা উঠলে কেউ আর গাঁধীকে স্মরণ করে না, তিনি যে সেই সুদূর বোম্বায়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শুনিয়ে ফাণ্ডের গোড়াপত্তন করেছিলেন সেটা সবাই ভুলে গেছে!!

## 'ইজরায়েল বিশ্বের প্রবাদ-সত্য রূপে গণ্য হবে'

—বাইবেল

ঘরে ঢুকতেই বললেন, এদিকে এসো। অসাধারণ পণ্ডিত লোক। আমি তাঁকে বড্ডই শ্রদ্ধা করি, বলতে কি, ভালোবাসি। তিনিও আমাকে স্নেহ করেন। সত্যকার পণ্ডিত কখনোই মূর্খকে অবহেলা করে না।

ঘরে আর কেউ নেই। তবু তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'তোমরা কাল বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে আলোচনা করছিলে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা তোমার আটকাচ্ছিল কোথায়?'

'আজ্ঞে, আমি শুধাচ্ছিলুম, আল্লা যদি না-ই থাকবেন তবে এই দুনিয়াটা পয়দা করলে কে? আপনারাও তো—'

বাধা দিয়ে বললেন, 'আমাদের কথা বাদ দাও—তোমার মুশ্‌কিলটা কোথায় সেইটে খুলে কও।'

'শরণঙ্করসাধু' হীনযানপন্থী বৌদ্ধ: সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলছিলেন, সৃষ্টির আদিও নেই অন্তও নেই। অতএব সৃষ্টিকর্তারও প্রয়োজন নেই। তারপর বললেন, যদি তর্কস্থলে ধরেও নেওয়া হয় সৃষ্টিকর্তা আছেন, তবুও তো শেষ-সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্ন উঠবে, সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করলেন কে? শুনুন আজগুবী কথা! তারপর তিনি তাঁর গেরুয়া আলখাল্লার ভিতর থেকে নোটবুক বের করে আঁকলেন একটা চক্কর—সার্কল। বললেন এই সার্কলের যেমন কোনো জায়গায় আরম্ভও নেই, শেষও নেই, সৃষ্টিও হুবহু তেমনি। তারপর আপনি ঘরে ঢুকলেন। পাছে আপনাকে ডিসটার্ব করা হয় তাই আমরা আরো খানিকক্ষণ ফিসফিস করে কথা বলার পর উনি চলে গেলেন।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি অর্থাৎ প্রাচ্য-বিদ্যায়তন। তারই একটা কামরায় আমরা তিনজনা কাজ করি। একজনের বিষয়বস্তু ইরানী ফাইয়াঁস-পর্সেলিন—বিশ্বকলাসৃষ্টিতে তার স্থান। অন্যজন বাইবেলের ওল্ড-টেস্টামেন্টের হীব্রু পাঠের নয়া সম্পাদনা করছেন। আর আমি—তা সে যাক্‌গে। দু'জনাই বছর দশেক পূর্বে সর্বোত্তম শ্রেণীর ডক্টরেট নিয়েছেন; একজন আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

শুধোলেন, 'চক্কর এঁকে সাধু বললেন সৃষ্টি এরই মত আদিঅন্তহীন। তা, এতে আবার দুর্বোধ্য কি আছে? তবে হ্যাঁ, আরো সোজা করে বলা যেতে

পারতো। আচ্ছা, স্কচদের বিশেষত্ব কি—অন্তত তাদের কোন্ বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিশ্বের লোক হাসিঠাট্টা করে ?'

এক গাল হেসে বললুম, 'সে আর বলতে! কিপ্টেমী!'

'বিলক্ষণ! সেই গল্পটা জান তো—লণ্ডনের এক ইংরেজ কোম্পানি স্কট-ল্যাণ্ডের এবার্ডীন শহরে খুললে ট্রামওয়ে। হাড়কিপ্টে স্কচরা ট্রাম চড়বে না, কিছুতেই। কোম্পানি লাটে ওঠার উপক্রম। তখন লণ্ডন থেকে পাঠানো হল স্পেশালিস্ট—তাঁকে বের করতে হবে দাওয়াই, স্কচকে কি প্রকারে ট্রামে ঢোকানো যায়। তিনি এবার্ডীনে এসেই ট্রাম ভাড়া থ্রাপেন্স থেকে এক ঝটকায় এক পেনি কমিয়ে করে দিলেন টাপেন্স। পরের দিন তাঁর আপিসের সামনে মহাপ্রলয়ের ভিড়। তিনি তো ড্যাম্ গ্লাড্—নিশ্চয়ই তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে, ভাড়া কমিয়ে দেবার জন্য। ইয়াল্লা, তওবা, তওবা! এরা যে তাঁরই জানলা তাগ করে পচা ডিম হাজা টমাটো ছুঁড়ছে আর চিৎকার করছে, "কোত্থেকে এসেছে এই নচ্ছার! আগে আমরা পায়ে হেঁটে, ট্রাম ভাড়ার তিন পেনি বাঁচাতে পারতুম, এখন কুল্লে দু'পেনি! নিকালো রাস্কেলকো এবার্ডীনসে।" আচ্ছা, হলো। এবার বলো তো ইহুদিদের বৈশিষ্ট্য কি? পারলে না? আমিই বলছি, হুবহু একই গাধার এ-কান ও-কান। কিপ্টেমীতে।'

ইহুদিদের কিপ্টেমী সম্বন্ধে আমি কোনো গল্পই জানি নে, অতখানি বে-খবর বেরসিক আমি নই, কিন্তু বিশেষ কারণে আমি চুপ করে রইলুম। সে-কারণ একটু পরে পাঠক নিজের থেকেই বুঝে যাবেন।

তিনি বলে যেতে লাগলেন, 'একবার এক ইহুদি আর স্কচে ঝগড়া লেগেছে, কে কতক্ষণ ধরে ডুবসাঁতার দিতে পারে—দু'জনা দুই সুইমিং পুলে কাজ করতো আর দুই পুলের মধ্যে ছিল উৎকট রেষারেষি। শেষ পর্যন্ত বাজি ধরা হল এক শিলিঙ। বাজে লোকের কৌতূহল এড়াবার জন্য তারা নদীর এক নিভৃত জায়গায় দিল ডুব।'

তিনি চুপ মারলেন। আমি ভাবলুম, ওস্তাদ কথকের মত তিনি পজ্ দিয়েছেন আমার মনের উপর গল্পটা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে সেইটে দেখবার জন্য। কিন্তু কই? তা তো নয়। তিনি দেখি, পকেট থেকে ছুরি বের করে আপন মনে দিব্য পেনসিল কাটতে আরম্ভ করেছেন। তখন থাকতে না পেরে আমি শুধালুম, 'তারপর?'

উদাস স্বরে বললেন, 'কি করে বলবো ভাই কও। দু'জনার কেউই তো উঠলো না জলের তলা থেকে।' তারপর হন্তদন্ত হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, বলতে ভুলে

গিয়েছিলুম, ভাগ্যিস্, তারা বাজিটা পাকাপোক্ত করার জন্য তাদের এক উকীল বন্ধুর কাছে কাগজ-কলমে লিখিয়ে নিয়ে—অবশ্য সবকুছ মুফতমে—তারই জিম্মায় রেখে এসেছিল ; নইলে শহরের লোক কস্মিনকালেও জানতে পেতো না, এ দুটো শান্ত, অজাতশত্রু লোক হঠাৎ ইহসংসার থেকে কি করে কপ্পুর হয়ে গেল। হুঁ! এক শিলিঙ—বাপ্‌রে! চাট্টিখানি কথা!'

'কিন্তু—'

'এর মধ্যে "কিন্তু" "but" "mais" "aber" কিছুই নেই, ভাই। কিন্তু সেই যে, অন্তহীন চিরচক্রের দৃষ্টান্ত দিলেন সিংহলের মহাস্থবির, বলছিলুম কিনা, সেটা আরো সোজা করে বলা যেতে পারতো। তাই তোমাকে পয়লা বাজিয়ে নিলুম, তুমি ইহুদি স্কচ সম্বন্ধে চালু গল্পগুলোর খবর রাখো কিনা। সবাই বলে, ওরিয়েন্টালরা—এবং বিশেষ করে ইণ্ডিয়ানরা—নাকি সর্বক্ষণ মুখ গুমড়ো করে, নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করে আত্মচিন্তায় মগ্ন, রসকষের বালাই নেই। যতো সব! হ্যাঁ, অন্তহীন চিরচক্র সহজ করে বোঝাতে হলে বলতে হয়—স্কচ বিল শোধ করবে না আর পাওনাদার ইহুদিও তাকে ছাড়বে না। সে ধাওয়া করেছে স্কচের পিছনে। শহরটাও ছোট। তখন কি হয়? অন্তহীন চিরচক্র। এখনো যদি না বুঝে থাকো তবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কোনো ইহুদির দোকানে এপ্রেন্টিসি করগে।'

আমি বললুম, 'একটি কথা শুধোতে পারি—অপরাধ যদি না নেন, ব্যক্তিগত কথা।'

তিনি বললেন, 'মাই লাইফ ইজ এন ওপ্‌ন্ বুক। যা-খুশি শুধোতে পারো।'

'আচ্ছা, আপনি তো, বোধ হয় ইজ্‌রায়েলাইট—'

বাধা দিয়ে মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'অত ভদ্রতা করে, অন্য লোক হলে বলতুম ভণ্ডামি করে, ইজরায়েলাইট না বলে য়ুডে ( Jude=ইহুদি ) বলতে পারো, তার চেয়েও অবজ্ঞাসূচক Jut বলতে পারো, এমন কি পাঁচজন জর্মন আড়ালে যে "ফীজার য়োট" ( মোটামুটি, "ঘৃণ্য ইহুদির বাচ্চা" ) ব্যবহার করে সেও করতে পারো। আমি নির্বিকার।'

আমি জিভ কেটে বললুম, 'ছি ছি, কি যে বলেন—'

ফের বাধা দিয়ে বললেন,, 'শোনো, ভদ্র! তুমি কি বললে, কি না বললে কিচ্ছুটি এসে যায় না। এই দেখ আমার নাকটা—কি রকম বেঁকে গিয়ে হুকের মত ঝুলে আছে, তারপর আমার কান দু'খানা—মাথার সঙ্গে লেপটে না গিয়ে একটা ডান দিকে আরেকটা বাঁ দিকে যেন উড়ে যাবার পণ করেছে, দাঁড়াও,

তোমাদের দেশের হাতীর বোধ হয় এ রকম কান হয়, তারপর আমার চুল—কানের কাছে কি রকম যেন কোঁকড়া কোঁকড়া, নিগ্রোদের মত, আমাদের মিশর-বাসের সামান্য অবশিষ্ট—'

'থাক না। প্লীজ।'

একটু হাসলেন, তাতে কোনো তিক্ততা ছিল না। বললেন, 'এক ফার্লং দূরের থেকে লোক চিনতে পারে, ঐ আরেক ব্যাটা ইহুদি আসছে। তুমি ইজরায়েলাইট বললে, না যুডে বললে তাতে কি যায় আসে? তা সে যাক্ গে। তুমি কি যেন শুধোচ্ছিলে?'

'আপনি তো ইহুদি—'

'বলে ইহুদি! রীতিমত খানদানী মনিষ্যি আমি। কেন, নাম থেকে বুঝতে পারছো না? তোমাদের কুরান শরীফেও যে প্রফেট ইয়াকুবের (জেকব্) উল্লেখ আছে তাঁর তৃতীয় পুত্রের নাম লেভি। কিংবা বাইবেলের প্রথম অধ্যায়, জেনেসিসেও পাবে এ-গোষ্ঠীর খবর। কিন্তু থাক্, প্রপিতামহের শুকনো হাড় চিবিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। তবে এ-কথা ঠিক, আমাদের পরিবারের বংশানুক্রমে ইহুদি ধর্ম ও হীব্রুসাহিত্যের চর্চা আছে।'

'তা হলে আপনি ইহুদিদের কঞ্জুসী নিয়ে, আপন চেহারার ইহুদিলক্ষণ নিয়ে অত ঠাট্টা-মস্করা করেন কি করে?'

মিটমিট করে হেসে বললেন, 'কেন, শোন নি, স্কচদের সম্বন্ধে যে-সব নূতন নূতন গল্প বেরোয় তার অধিকাংশের জন্মস্থল এবারডান, জনক স্কচরা স্বয়ং? তত্ত্বটার সত্যি মিথ্যে জানি নে, কিন্তু ইহুদির কঞ্জুসী, সে নোংরা—স্নান করে না, যে-দেশে বাস করে সেটাকে মাতৃভূমিরূপে স্বীকার করে না, আরো কত কী—এসব নিয়ে যে-সব গল্প আছে তার একটা বিরাট ভাণ্ডার আছে আমার কাছে। পেয়েছি উত্তরাধিকারসূত্রে ঠাকুর্দার কাছ থেকে এবং এর অধিকাংশই ইহুদিদের তৈরি—কোনো সন্দেহ নেই সে-বিষয়ে। বাবার এসবেতে শখ নেই। তিনি পড়ে আছেন হীব্রুশাস্ত্র নিয়ে, আর অবসর সময়ে ঐ একই অভিনিবেশ সহকারে, জর্মন সাহিত্যচর্চা। কারো সঙ্গে মেশেন না বড় একটা, কিন্তু তোমাকে যতটুকু চিনতে পেরেছি তার থেকে মনে হয়, তোমাকে বাড়ি নিয়ে গেলে তিনি খুশী হবেন। প্রাণ ভরে তাঁর কাছ থেকে জর্মন সাহিত্যের খুঁটিনাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করতে পারবে। আসবে একদিন ডিনারে? বেশ। মাকে শুধিয়ে দিন ঠিক করে তোমাকে বলবো।'

'আচ্ছা, বলুন তো, এদেশে নাকি একটা পোলিটিকাল পার্টি দিন দিন শক্তি

সঞ্চয় করে চলেছে, আর তারা নাকি নির্বিচারে সব ইহুদিদের এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়—যারা পাঁচ শ' সাত শ' বছর ধরে জর্মনিতে আছে তাদেরও, যারা এক বর্ণ হীব্রু জানে না, সিনাগগে যায় না, নাস্তিক্যবাদের পক্ষ সমর্থন করে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছে তাদেরও। দোষটা কি ওদের ?'

এই তার মুখ একটুখানি গম্ভীর হল। সেটা যেন মুছে ফেলে মুচকি হেসে বললেন, 'এ তো কিছু নূতন নয়। বাইবেলের "এস্টার" পুস্তিকা পড়েছ ?'

আমি অভিমানের সুরে বললুম, 'আমি অগা। কিন্তু এস্টার পড়ি নি, এ-সন্দেহ কেন করছেন ? তবে হ্যাঁ, ওল্ড-টেস্টামেন্ট পড়া উচিত, তারই নির্মাতা কোনো ইহুদি রাব্বির কাছ থেকে। আমি পড়েছি খৃষ্টান—তাও লুথেরীয় অর্থাৎ কি না প্রটেস্টান্ট্—পাদ্রির কাছে। ওনরা তো এস্টারের ঐতিহাসিকতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না।'

'সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত অন্তত এটুকু মেনে নিতে পারো, সেখানে যে চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে তার অনেকখানি খাঁটি সত্য—তা সে যার মুখ দিয়েই বলানো হয়ে থাক না কেন এবং ইরানের রাজা গ্রীস-মিশর-বিজয়ী Xerxes ইহুদি-বালা এস্টারকে বিয়ে করে থাকুন, আর না-ই করে থাকুন। সেখানে Xerxes (বাইবেলের 'অহস্‌ভেরুস')-এর মন্ত্রী তাঁকে একদিন বললেন, "মহারাজের বিশাল সাম্রাজ্যে এক শ্রেণীর লোক সর্বদাই পাওয়া যায় (ইহুদি) যাদের আইনকানুন অন্য সব জাতদের থেকে ভিন্ন, এমন কি রাজাদেশও তারা মানে না; অতএব এক বিশেষ দিনে এদের সবংশে নির্বংশ করা হোক।"... তখনও প্রভু যীশুর জন্ম হয় নি, খৃষ্টধর্মের সঙ্গে বৈরীভাবের প্রশ্নই ওঠে না, আর, ঐ যে নয়া পলিটিকাল পার্টির কথা বলছিলে, যারা জাতে অ্যারিয়ান—তাদের ভিতর আবার নীল চোখ, ব্লণ্ড চুল-ওলা সর্বশ্রেষ্ঠ নর্ডিক জাত সম্বন্ধে প্রচার করতে গিয়ে তারা পিঠপিঠ বলে ইহুদিরা মানুষ পর্যায়ের নিম্নে (untermensch = under-man) সে পার্টি তো পর্শু দিনের—নিতান্ত শিশু। তা সে যাক্ গে—এই আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস জেনে তোমার যে কি লাভ হবে জানি নে। তোমাদের দেশে—'

'হালে আমাদের দেশে ইহুদিরা এসেছে ইয়োরোপ থেকে। তার বহু শতাব্দী পূর্বে ঝড়ের মারে একখানা নৌকায় করে সাতজন পুরুষ আর সাতজন স্ত্রীলোক এসে পৌঁছয় বোম্বাইয়ের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত চেমুল বন্দরের কাছে।[১]

১ মারাঠীতে 'চ' অক্ষরের উচ্চারণ 'ৎস'-এর মত। তাই টলেমি এ বন্দরকে তিমুলা, সিমুল্লা দুই উচ্চারণেই লিখেছেন। চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের (টিলক,

শাস্ত্রাদি সব লোপ পায় বলে লোকে এদের ইহুদি পরিচয় পায় নি ; শুধু শনিবারে এরা বিশ্রাম নিত বলে ( ইহুদির সাব্বাৎ ) এবং তেলীর ব্যবসা করতো বলে ( বোধ হয় মধ্য-প্রাচ্যের অলিভ তেল তৈরির কায়দা এরা তিল-সর্ষের উপর চালায় ) এদের নাম হয়েছিল "শনিবার-তেলী"। একশ' বছরও বোধ হয় হয় নি, তর্কাতীত সিদ্ধান্ত হয়েছে, এরা জাত-ইহুদি। কিন্তু এদের পিছনে তো কেউ কখনো লাগে নি—এস্টার কেতাবের পাইকিরি কচু কাটার নৃশংস প্রস্তাব কহাঁসে কঁহা !'

'জানি, তাই বলছিলুম, তোমার কি লাভ ? আর এদেশের আর্যেরা বলেন, ইহুদি লাভ, টাকা, সোনারূপো ভিন্ন অন্য চিন্তা অন্য বস্তু বোঝে না। রূপোর কথাই যদি উঠলো তবে একটি ইহুদি কথিকা—কঞ্জুসীবাবদ—ঠিক পপুলার গল্প নয়, হাফশাস্ত্র বাক্যের মত বলি,—শ্রবণ করো, এবং তারপর—'

ইঙ্গিত বুঝে বললুম, 'যাচ্ছি আপন টেবিলে হীব্রু ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করতে।'

ব্যাগ খুলে একটা আপেল বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'একদা জনৈক অর্থ-পিচেশ মজ্জা-কিপটে কোটিপতি—কখনো কানা কড়িটি দান করেছে এ-কথা তার কোনো হাতই জানে না—এসেছে এক রাব্বির কাছে। জানলার কাছে নিয়ে গিয়ে রাব্বি তাকে বললেন, "বাইরের দিকে তাকিয়ে আমায় বলো, কি দেখতে পাচ্ছো।"

ধনী বললে, "লোকজন—বিস্তর মানুষ।"

রাব্বি বললেন, "উত্তম প্রস্তাব।" তারপর একটা আয়নার সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে শুধোলেন, "এবারে কি দেখছ ?"

"আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি—" বললে কিপটে।

গোখলে ও যদি বেয়াদপি মাফ করেন তবে উল্লেখ করি, অধীনের অধুনা প্রকাশিত 'দু-হারা' পুস্তকের চরিত্র কাণে ) অনেকেরই নীল চোখ, কটা চুল ; এদের ভিতরেও কিংবদন্তী, এঁরাও ঝড়ের মারে কোঁকণ অঞ্চলে পৌছন।

বরদার সয়াজীরাও যেরকম রমেশ, অরবিন্দ, আম্বেডকরকে পৃষ্ঠপোষকতা দেন, ঠিক তেমনি এই সাত স্ত্রীপুরুষের বংশধর পণ্ডিত কাহিমকরকে বোম্বাই থেকে ধরে এনে বরদা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষের এঁরা প্রাচীনতম ইহুদি। এঁরা ইয়োরোপীয় বহু ইহুদির ন্যায় 'ইহুদি' শব্দটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন এবং নিজেদের 'বেনে-ইজরায়েল' [ বেনে—আরবী বিন—ইবন=পুত্র ; ইবন্ বৎতুতা তুলনীয় ]='ইজরায়েল-সন্তান' রূপে পরিচয় দেন। আমার পরম সৌভাগ্য বরদাবাসকালীন এই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয়। এই

"ততোধিক উত্তম প্রস্তাব"—বললেন রাব্বি, "এইবারে শোনো, বৎস, কান পেতে মন দিয়ে। জানলার শার্সি কাঁচের তৈরি, আয়নাও কাঁচের তৈরি—তফাৎ কি? আয়নার পিছনে রয়েছে অতিশয়, হাল্কার চেয়েও হাল্কা সা মা ন্য একটু রূপোর প্রলেপ—ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু বৎস, যেই না এল সামান্যতম রূপো, অম্নি তুমি আর অন্য মানুষকে দেখতে পাও না, দেখতে পাও শুধু নি জে কে॥[২]"

২৩।৪।৬৬

মাটির মানুষটির যৎপরোনাস্তি অনাড়ম্বরে প্রকাশিত বেনে-ইজরায়েল পুস্তিকা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতসমাজে, বিশেষ করে রাব্বিদের ভিতর যেন টর্পেডোর মত পড়ে। বস্তুত তারপর যে যা লিখেছেন বিশেষ করে ভিন্ন ভিন্ন এনসাইক্লোপিডিয়ায় —তার বেশীর ভাগ জজ কাহিম্‌করের কাছ থেকে নেওয়া। সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা সহ। বরদার দ্বিতীয় ইহুদি ছিলেন জর্মন। এ-লেখনের ডঃ লেভির মত, ডঃ কোন্‌-ভীনার ('কোন্‌-ভীনারের মা' পশু—পঞ্চতন্ত্র, ১ম)। —ইয়োরোপীয় ইহুদি ও কাহিম্‌করের কোঁকণী ইহুদিদের পাল-পরবের ক্যালেণ্ডার ভিন্ন ভিন্ন—আল্লাকে বে-শুমার শোকরিয়া। আমি কখনো বা জজ সাহেবকে নিয়ে কোন্‌-ভীনারের গৃহে, কখনো বা কোন্‌-ভীনারকে নিয়ে জজের বাড়িতে বহু বিচিত্র বহ্বান্ন ভক্ষণ করে—একই পরব দু'-দুবার যথা গোস্বামী মতে ইত্যাদি পালন করে, ধর্ম রক্ষা করতুম। বেনে-ইজরায়েলদের সম্বন্ধে আমার যেটুকু সামান্য জ্ঞানগম্যি সেটুকু সমূচহ জজের খয়রাৎ।

২ এ লেখনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও আমার অন্তরঙ্গ পাঠকদের না জানিয়ে কিছুতেই থাকতে পারলুম না যে ২৬ মার্চ (১৯৬৬) সন্ধ্যাবেলা প্যারিস বেতার থেকে ইন্দিরাজীর ফরাসীতে প্রদত্ত মঁসিয়ে দ্য গলের অভ্যর্থনার প্রত্যুত্তরের রেকর্ডিং। অনবদ্য রিসেপশনে—কলকাতা 'থ'-এর চেয়ে কোটিগুণে শ্রেয়। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ অতি সুন্দর, পরিষ্কার। অনভ্যাসবশত মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলেন বটে, কিন্তু উচ্চারণে বিদেশী আড় প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যুদ্ধের সময় আমি চার্চিলের ফরাসী ভাষণ বেতারে শুনেছি। ইংরিজীর জোরালো একসেণ্ট দ্বারা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ফরাসী উচ্চারণ। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, বেতার-যন্ত্রে কান সেঁটে না শুনলে মনে হবে, গাঁক-গাঁক করে ইংরেজ সাবলটর্ন কুচকাওয়াজের 'হুকুমদার' ঝাড়ছে। ফরাসীতে অনুনাসিকের ছয়লাপ। ইংরেজের কাছে সে বহু গোমাংস। অতএব বাংলার 'চাঁদ' যেন ইংরেজের মুখে 'চ্যানড্‌' হয়ে বেরুচ্ছিল। ইন্দিরাজীর ফরাসী উচ্চারণ চার্চিলের চেয়ে ইনফিনিটি পার্সেণ্ট শ্রেয়।

# এমেচার ভার্সস স্পেশালিস্ট

সব ব্যাপারেই আজকাল স্পেশালিস্ট। সেদিন মার্কিন মুল্লুকে এক স্পেশালিস্টই আবিষ্কার করেন যে শোভাযাত্রা, বয়কট বা ধর্মঘটে যাঁরা কালো ঝাণ্ডা তুলে হই হই করে, তাদের অনেকেই ভাড়াটে। এ তত্ত্ব আমাদের কাছে নূতন নয়; দিল্লিতে থাকাকালীন স্বর্গত অশ্বিনী গুপ্ত আমাকে দিল্লিতে যে 'হাঙার স্ট্রাইকে'র জন্য প্রতিষ্ঠান আছে, যিনি হাঙার স্ট্রাইক করবেন তাঁর জন্য শামিয়ানা, তাকিয়া-বালিশ, নির্জলা না হলে নিম্বুপানি—তদভাবে জিন্ (যদি তিনি মদ্যপ হন), কারণ বলতে গেলে একমাত্র জিনই সহজলভ্য কড়া ড্রিঙ্কের ভিতর জলের রঙ ধরে, আহারাদি, হ্যাঁ, আহারাদিই বলছি কারণ লুকিয়ে লুকিয়ে হাঙার স্ট্রাইকার যদি খেতে চান তবে গভীর রাত্রে তার সুব্যবস্থা—সেদিকে আমার ভোঁতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যিনি আজো এ-প্রতিষ্ঠানটি চালিয়ে যাচ্ছেন, তিনি মার্কিনী স্পেশালিস্ট নন, নিতান্ত দিশী মাল—এবং সর্বোপরি তিনি 'এমেচার'।

এসব তো মস্করার কথা—যদিও দুটোই ভাহা 'ইমানসে' সত্য। তবে দিল্লির প্রতিষ্ঠানটি নাকি 'সদাচার কদাচারে'র উৎপাতে এদানিং বড়ই উৎপীড়িত ('তংগ্ আ গয়ে'); তার অর্থ অবশ্য এ-নয় যে 'হাঙার স্ট্রাইক' করার কারণের কিংবা/এবং অকারণের অজুহাত অছিলার অভাব ঘটেছে, কিংবা 'হাঙার-এর' হাঙরদের ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটেছে—আসল কারণ ওটা নাকি রেশন্ড্ হয়ে গিয়েছে, 'অর্থাৎ হাঙার স্ট্রাইক', 'ফাস্ট্ আন্ টু ডেথ' এসব করতে হলে সেগুলো এখন করবেন সরকার স্বয়ং! আনাড়ি এমেচারদের হাতে আর এ-সব টপ প্রায়োরিটির বস্তু ছেড়ে দেওয়া যায় না। দেশ-বিদেশে বড্ড বেইজ্জতী হয়। আইরল্যাণ্ডের কে যেন ম্যাকসুইনি না কি যেন নাম সে নাকি বাষট্টি বা বিরানব্বই দিন নাগাড়ে উপোস মেরেছিল—এমতাবস্থায় ভারত যদি বাহান্ন দিনের রেকর্ড দেখায় তবে সেটা হবে সত্যই 'শরম্কী—' থুড়ি 'লজ্জাকী, ঔর আফসোস—' থুড়ি 'পশ্চাত্তাপকী বাৎ'।

তৎসত্ত্বেও এমেচারকে ঠেকানো যায় না—বারট্রাণ্ড রাস্লের মত নিরহঙ্কার লোক পর্যন্তও চেষ্টা দিয়ে হার মেনেছেন।[১] স্বয়ং রবি ঠাকুর এই এমেচারি কর্মে

১ এ বাবদে তাঁর বিদকুটে রায়: সর্ব পণ্ডিত যখন কোনো তত্ত্ব এক বাক্যে স্বীকার করে নেন, তখন তুমি এমেচার সেখানে ফপরদালালী করতে যেয়ো না। আর যেখানে তাঁরাই একমত হতে পারছেন না সেখানে তুমি নাক গলাতে যাও কোন্ দুঃসাহসে? এর বিগলিতার্থ তুমি এমেচার ঠোঁট দুটি সেলাই করে বসে

বড্ডই সুখ পেতেন। আমি তামা-তুলসী স্পর্শ করে একশ' বার কিরে কাটতে রাজী আছি, তাঁকে মধ্যম শ্রেণীর হোমেওপ্যাথ ডাক্তার বললে তিনি সেটাকে কবিতায় নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেয়ে লক্ষ গুণে শ্লাঘনীয় বলে মনে করতেন। ঠিক তেমনি স্পেশালিস্ট সত্যেন বোস তাঁকে দিলেন টুইয়ে—বিজ্ঞান শিখতে নয়, সেও না হয় বুঝি—শেখাতে। অর্থাৎ 'মেস্টারি' করতে। তাহলে পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজন। বাজারে যেগুলো মেলে সেগুলো লিখেছেন বটে বিশেষজ্ঞরা —একশ' বার মানি—কিন্তু যে বাঙলা ভাষায় লিখেছেন সেটা, ঐ যে ফরাসীতে বলে, 'ইল্‌জ এক্রিভ ফ্রাঁসে কম্ লে ভাশ্ এস্‌পানিয়োল'—তেনারা ফরাসী লেখেন স্প্যানিশ গাইয়ের মত।[২] রবি ঠাকুর আর যা করুন, তাঁর বাঙলাটা অন্তত বোধগম্য হবে। থাক না দু-পাঁচটা ভুল এদিক ওদিক। সেগুলো মেরামত করার জন্য তো ঐ হোথায় সত্যেন বোস বসে।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন শব্দতত্ত্ব নিয়ে তর্কাতর্কির দায়ে মজে যান। বৃদ্ধ বয়সে—বোধ হয় সুনীতিবাবু এবং/কিংবা গোঁসাইজীর প্ররোচনায়—তাবৎ বাঙলা ভাষাটা নিয়ে খুব একচোট তলওয়ার খেলা দেখিয়ে দিলেন। আহা সে কী স্বচ্ছ সুন্দর তরল ভাষা—যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে। কে বলবে, বিষয়বস্তু নিরস শব্দতত্ত্ব—হুস্ হুস্ করে পাতার পর পাতা সিনেমার ডেলি ক্যালেণ্ডারের পাতার পর পাতা ওড়ার মত পেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দুম করে সম্বিতে ফিরে

---

থাকো। এমন কি কেউ যদি বলে, Fine Weather—eh? তুমি হাঁ না বলতে পারবে না। তুমি ওয়েদারের জানো কি? প্রথম গ্রীনিজকে শুধোবে আবহাওয়ার দফতরে। তারা যদি বলে 'ফাউল' তবে ফাউল—তা তুমি যেখান থেকে কথা বলছো সেখানে থাক না মলয় পবন আর সূর্যাস্তের লালিমায় রঙিন গোলাপী আকাশ। এস্তেক তোমার নাম যদি 'অতুল' হয়, তবে তোমার বিপদ প্রত্যাসন্ন। শিশির ভাদুড়ী বলতেন অ (ঘর-এ যে 'অ' উচ্চারণ), আর রবি ঠাকুর বলতেন 'ওতুল'—কিন্তু তিনিও আবার 'ওতুলনীয়' না বলে বলতেন 'অতুলনীয়'। অর্থাৎ বারট্রাণ্ড রাস্‌লের অনুশাসন মানলে তোমাকে নাম বদলে 'মাকাল-টাকাল' কিছু একটা 'দশদিশি নিরদ্বন্দ্ব' নাম রাখতে হবে।

২ আমার টায়-টায় মনে নেই তবে রাজশেখর লেখেন, 'নেত্রজনের উপস্থিতিতে অসিতলীনের উপর কুলহরনীর প্রতিক্রিয়া' শুনে মনে হয় সকলের সজাগ দৃষ্টির সামনে (এখানে পাঠক আমার তরফ থেকে একটা ভদ্রজনোচিত গলাখাঁকরি অনুমান করে নেবেন। ধন্যবাদ।) কোনো একটা বেহেড্

আসবেন। এমেচার আর্টিস্ট যেন লাজুক হাসি হেনে ঘন ঘন করতালির মধ্যিখানে শেষ বক্তব্য নিবেদন করছেন। কি বলছেন? বলছেন, তিনি শব্দতাত্ত্বিক নন্—নিতান্ত এমেচার—তাই খুব সম্ভব হেথা হোথা বিস্তর গলদ থেকে যাবে।

তারপর তিনি যে মুষ্টিযোগের শরণ নিয়েছেন সেইটে তিনি কালিদাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছেন। সেটা তাঁর শক্তি (fort)ও বটে, দুর্বলতাও —যদি অপরাধ না নেন—বটে কিন্তু এস্থলে তিনি যে তুলনাটি ব্যবহার করেছেন সেটি উপমা কালিদাসস্যকেও হার মানায়। তিনি বলছেন, 'কোনো কোনো বিখ্যাত রূপশিল্পী শরীরতত্ত্বের যথাতথ্যে ভুল করেও চিত্রকলায় প্রশংসিত হয়েছেন, ( যেমন সেজানের ওয়েস্ট কোট-পরা ছোকরাটির হাত আজানুলম্বিত না বলে আগুলফ-লম্বিত বললেই ঠিক হয়—কিন্তু তৎসত্ত্বেও ছবিটি রসে ভর্তি—যাকে আজকের দিনে 'রসোত্তীর্ণ' বলা হয়। ) ঠিক তেমনি কবির ভাষা সম্বন্ধে এ-বইয়ে দু-পাঁচটা ভুল বা অর্ধসত্য পরিবেশিত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এসব ভুল মেনে নিয়েও দেখা যায় এরকম তুলনাহীন প্রবন্ধ হয় না। কারণ তথ্য-পরিবেশনে অসম্পূর্ণতা থাক আর নাই থাক, সবসুদ্ধ মিলিয়ে প্রবন্ধটি বাঙলা ব্যাকরণ ( খাঁটি বাঙলা ব্যাকরণ—বাঙলার ছদ্মবেশ পরে সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়। ) এবং খাঁটি বাঙলা অলঙ্কার নিয়ে এক অভূতপূর্ব রচনা। যেমন তিনি বলছেন, চলতি বাঙলাতে গুরুচণ্ডালী এখন আর দোষের মধ্যে গণ্য নয়।

ঠিক এই জিনিসটেই আমরা অন্যান্য সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা করি। কারণ সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাষার যে পরিচয় হয় সেটা আদৌ শব্দতাত্ত্বিক বা ভাষাতাত্ত্বিকের মত নয়। সে ভাষা ব্যবহার করে নূতন নূতন সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই তার ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। অত্যুত্তম গ্রন্থ লিখে ভাষাবাবদে আপামর জনসাধারণ তথা বৈয়াকরণিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেলেও লেখক তার পরবর্তী পুস্তকে সেই অনুমোদিত ভাষার পুনরাবৃত্তি করতে চায় না, রবীন্দ্রনাথের তুলনায়, আপনার মালের রিসীভার অব স্টোলেন প্রপার্টি হতে চায় না। তাই তাকে প্রতিদিন নিত্য নবীন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেখানে সে কোনো

বেলেল্লাপনা। উহুঁ, আপনার পাপ মন, পাঠক, আপনার পাপ মতি। ওর অর্থ হচ্ছে—আবার বলছি টায়-টায় মনে নেই—The reaction of chlorine ( কুলহরনীর ) on acitylene ( অসিতলীন ) where nitrogen ( নেত্রজন ) is present.

বৈয়াকরণিক, কোনো শব্দতাত্ত্বিকের সাহায্য পায় না। তাই প্রাচীন লেখক—যখন নূতন শব্দভাণ্ডার নূতন বচনভঙ্গী নিয়ে পুনরায় একখানা সার্থক গ্রন্থ লেখেন, তখন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ কর্ম শব্দতাত্ত্বিক করতে পারেন না—অবশ্য তিনি যদি সাহিত্যিকও হন ও তাঁর তত্ত্বগ্রন্থখানি সাহিত্যের পর্যায়ে তুলতে পারেন তবে অন্য কথা।

তাই ভাষার নব নব রূপ দেখাবার জন্য সাহিত্যিককেও এমেচারি শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়।

এবং শুধু সাহিত্যিকই না, যে-ব্যক্তিই জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অন্য যে-কোনো চিন্ময় বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন, আলোচনা করেন, তাঁকেই কিছু-না-কিছু শব্দতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই তত্ত্বটি আজ হঠাৎ আমার চোখের সামনে জলজল করে ফুটে উঠলো, মুসলমানদের সম্ভ ইমাম আবু হানীফার বিরাট ন'ভলুমী গ্রন্থের একটি জায়গা পড়ে।

ইমাম আবু হানীফা শিষ্যসমাবৃত হয়ে প্রতি প্রাতে বসতেন মুসলিম ধর্ম আলোচনায়। তাঁর রায় লিখে রাখা হত তো বটেই, তাঁর প্রধান শিষ্যদের কেউ ভিন্ন রায় ( মিনিট অব ডিসেণ্ট ) প্রকাশ করলে সেটিও সযত্নে পাশাপাশি লিখে রাখা হত।

একদা প্রশ্ন উঠলো, 'নগরে জুম্মার নমাজ অবশ্য পালনীয়; কিন্তু গ্রামে জুম্মার নমাজ হয় না'—এ-আদেশ শিরোধার্য করবো কি না? ইমাম সাহেব বললেন, 'শিরোধার্য করা, না-করার পূর্বে প্রথম দেখতে হবে "নগর" বলে কাকে, আর "গ্রাম" বলে কাকে?' জনৈক শিষ্য বললেন, 'অভিধান দেখলেই হয়।' এবারে ইমাম যা বললেন, সেটি মোক্ষম তত্ত্বকথা—সর্বভাষাতে সর্বকালে প্রযোজ্য। তিনি বললেন, 'কোষকার দেবে সাধারণ প্রচলিত অর্থ। পক্ষান্তরে আমরা ধর্মশাস্ত্রের অধ্যায়ন করে জনসাধারণের জন্য অনুশাসন প্রচার করি ( অর্থাৎ আমরা theologians, ); থিওলজিয়ানের দৃষ্টিবিন্দু থেকে কোন্‌টা শহর—যেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ—এবং কোন্‌টা গ্রাম যেখানে জুম্মার নমাজ অসিদ্ধ—তার শেষ বিচার তো আমাদের হাতে।'

অত্যন্ত খাঁটি কথা। যেমন ধরুন গরুর বাথান, যেখানে রাখালরা শীতকালে থাকে। সেটাকে হয়তো গ্রামের পর্যায়েও ফেলা যাবে না। কিংবা উত্তম মরুদ্যান পেয়ে হাজার লোকের কাফেলা ( ক্যারাভান ) কয়েক দিন বিশ্রাম করলো। সেখানে জুম্মার নমাজ সিদ্ধ না অসিদ্ধ?

ইমাম সাহেব বলছেন, থিয়োলজিকাল অর্থে কোন্‌টা গ্রাম, আর কোন্‌টা

শহর, তার সংজ্ঞার ( definition-এর ) জন্য কোষকার তো আসবে আমাদেরই কাছে।

ঠিক তেমনি আইনজ্ঞ পণ্ডিতরা সংজ্ঞা দেন কোন্‌টা crime, আর কোন্‌টাই বা tort ; তবে তো কোষকার সেটা তার অভিধানে লিপিবদ্ধ করে। সে তো আর বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটিতে বিশেষজ্ঞ নয় যে, নিছক আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক শব্দের সংজ্ঞা দেবে, বর্ণনা দেবে, প্রতিশব্দ দেবে।

ঠিক এই জিনিসটি বাঙলা দেশে এখনো আরম্ভ হয় নি।

সবাই তাকিয়ে আছেন কোষকারের দিকে। সে পরিভাষা বানিয়ে দেবে। আর সে বেচারী তাকিয়ে আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, চিকিৎসা, আইন ইত্যাদির পণ্ডিতদের দিকে। তাঁরা সংজ্ঞা দেবেন—এবং তাঁদের অধিকাংশই শব্দ বা ভাষা-তাত্ত্বিক নন, সে বাবদে নিতান্তই এমেচার—তবে তো কোষকার সেগুলো লিপিবদ্ধ করবে॥

## মিজোর হেপাজতী

নেফা অঞ্চল বাদ দিলে আসামে যে কটি পার্বত্য অঞ্চল গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তার ভিতর পড়ে খাসিয়া, গারো নাগা ও লুসাই। এর সঙ্গে ত্রিপুরার কুকি অঞ্চলেরও নাম করতে হয়, কিন্তু নানা কারণে সেখানকার কুকিরা এযাবৎ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে নি—এবং যেহেতু ত্রিপুরা আসামের অংশরূপে গণ্য হয় নি, তাই সে-দেশ এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। কিন্তু মণিপুর সম্বন্ধে এস্থলে কিছু না বললে তাদের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা বাঙালী ধর্মপ্রচারকদের প্রতি অবিচার করা হয়।

আসামের অন্যান্য পার্বত্য জাতির মত মণিপুর অনুন্নত নয়। মহাভারতের অর্জুন-চিত্রাঙ্গদার মণিপুর ও বর্তমান মণিপুর একই কিনা সে নিয়ে তর্কাতর্কি করার শাস্ত্রাধিকার আমার নেই—এবং যেহেতু মণিপুর অধীনের জন্মভূমির প্রত্যন্ত ভূমিতে অবস্থিত, সে তার প্রতিবেশীকে অহেতুক ক্ষুব্ধ করতে চায় না, কিন্তু এ কথা সত্য যে, যদ্যপি সাধারণ মণিপুরীদের চেহারার ছাপ মঙ্গোলীয়, ওদের ভিতর হঠাৎ বিশুদ্ধ আর্য টাইপও পাওয়া যায়—এবং যেহেতু পার্শ্ববর্তী আর্য বাংলা-ভাষাভাষী সিলেট কাছাড়ে এ টাইপ দুর্লভ, তাহলেই প্রশ্ন উঠবে, কান্যকুব্জ অঞ্চলের এই আর্য টাইপ হঠাৎ মণিপুরে আবির্ভূত হল কি প্রকারে? পশ্চিম-

বাংলার সঙ্গে মণিপুরের সরাসরি যোগসূত্র না থাকা সত্ত্বেও বাঙালী আজ মণিপুরী নৃত্যের কথা ও সে নৃত্য যে রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছে, সে-কথা জানে—বস্তুত ভারতবর্ষে অধুনা যে চার রকমের শাস্ত্রীয় নৃত্যপদ্ধতি স্বীকৃত হয়, এ নৃত্য তারই অন্যতম—কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম মণিপুরে প্রচার ও প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, অতএব এ নৃত্যকে আড়াই হাজার বছরের ঐতিহ্য দিয়ে মহাভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করা কঠিন।[১]

কিন্তু এহ বাহ্য। আসল প্রশ্ন এই : ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজাদেশে মণিপুর যে বৈষ্ণবধর্ম 'রাষ্ট্রধর্ম'-রূপে গ্রহণ করল সেটা সম্ভব হল কি প্রকারে? আসামের আর পাঁচটা পার্বত্য জাতি যে রকম আর্য জনপদ থেকে দূরে হাজার হাজার বৎসর ধরে আপন আপন প্যাটার্ন অব্ কালচার বুনে যাচ্ছিল মণিপুরও করছিল তাই। তাদের মাঝখানে একমাত্র মণিপুরই বা বৈষ্ণব হয়ে গেল কেন? এ কথা সত্য যে শিলচর থেকে মণিপুর পৌঁছানো সহজতর। কিন্তু মৈমনসিং থেকে গারো পাহাড় যাওয়াও তো কঠিনতর নয়, গারোরা অতিশয় শান্তিপ্রিয় এবং দু-একটি গারো মুসলমানের সঙ্গেও আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। পক্ষান্তরে নেফার অধিবাসীদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা কঠিনতর; অথচ লোকমুখে শোনা, সেখানকার কোনো কোনো উপজাতি সর্বৰাবদে অ-হিন্দু হয়েও মাথার এক দিকের খানিকটা চুল কামায় ও চিহ্নস্বরূপ দেখিয়ে বলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নাকি তাদের অর্ধ-হিন্দুরূপে পরিণত করে বলেন যে, তিনি আবার এসে তাদের পূর্ণ-হিন্দু করে দেবেন—তারা এখনো সেই প্রতীক্ষায় আছে। তা সে যা-ই হোক, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের বাঙালী শিষ্যেরাই যে মণিপুরে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মণিপুরী ভাষা বাংলা অক্ষরে লেখা হয়; পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগে খৃষ্টান মিশনারিরা পার্বত্যবাসীদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করার পর তাদের

---

১ দক্ষিণ ভারতের ভরতনাট্যম নিয়ে যতখানি গবেষণা এই উত্তর ভারতেই হয়েছে, এই উত্তর ভারতের ঘনিষ্ঠতর মণিপুরী নৃত্য নিয়ে তার এক-দশমাংশও হয় নি। এ নৃত্য সত্যই রহস্যময়। মূল নৃত্য শান্ত ও লাস্যরসাশ্রিত কিন্তু প্রারম্ভিক অবতরণ নৃত্য (এর টেক্‌নিকাল নামটি আমি ভুলে গিয়েছি) অত্যন্ত প্রাণবন্ত, দুর্দান্ত—তাণ্ডব নৃত্যের কাছাকাছি এবং পার্শ্ববর্তী অনুন্নত অঞ্চলের সংগ্রাম-নৃত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য ধরে। হয় তো বৈষ্ণব হয়ে যাওয়ার পরও মণিপুরীরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যগত পার্বত্য নৃত্য ত্যাগ করতে চায় নি বলে 'অর দ্য ভ্র' রূপে—প্রস্তাবনারূপে—সেটিকে রক্ষা করেছে।

ভাষা রোমান বা অন্তকার দিনের ইংরিজী অক্ষরে লেখেন।[২]

কিন্তু সব চেয়ে বড় তত্ত্বকথা, মণিপুরবাসী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করতে (এবং পরবর্তী যুগে কাছাড়ে আশ্রয়গ্রহণকারী কিছু মণিপুরী ইসলাম গ্রহণ করাতে) কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতিগত বা অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্ট হয় নি। রাজনৈতিক সমস্যার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বাঙালী মিশনারিরা মণিপুরের সিংহাসনে কোনো বাঙালীকে বসাতে চান নি। অর্থনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মণিপুরবাসী ও পার্শ্ববর্তী কাছাড়বাসীর মধ্যে দ্রব্যবিনিময়ের ফলে উভয়েই উপকৃত হন। এই অর্থনৈতিক দিকটা পাঠক বিশেষভাবে মনে রাখবেন। আমার মনে হয়, নাগা এবং মিজোদের অর্থনৈতিক সমস্যাটা কেউ সবিশেষ চিন্তা করে দেখেন নি।

আমার বাল্যকালে সিলেট জেলার একাধিক জায়গায় নিয়ত বর্ধিষ্ণু খৃষ্টান মিশন ছিল এবং সে যুগে ভারতের তাবৎ প্রটেস্টান্ট্ মিশনারিদের ভিতর দক্ষিণ-শ্রীহট্টে কর্মরত ওয়েল্‌শ্ মিশনের (এখনো মিজোদের ভিতর এই মিশনই সর্বপ্রধান এবং যে ক'জন মিশনারির খবর অধুনা পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁরা খুব সম্ভব এই মিশনেরই।) রেভারেণ্ড পিন্‌গোয়র্ন জোন্‌স্ তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা—বাংলা, ইংরেজী, ওয়েল্‌শ্ তিন ভাষাতেই—চরিত্রবল ও ধর্মানুরাগের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আমি পাঠশালা যাবার সময় থেকেই তাঁর গির্জা ও সান্‌ডে স্কুলের রীতিমত অনুরাগী অংশগ্রহণকারী ছিলুম বলে প্রায়ই টিলার উপরে অবস্থিত তাঁর ছিমছাম বাংলোতেও যেতুম। মিশনে বাস করতো আরো বিস্তর ছেলেমেয়ে—প্রধানত চা-বাগিচার সাহেব ও দিশী রমণীর মিলনজাত পুত্রকন্যা এবং কিছু কিছু খাসিয়া, গারো, নাগা ও লুসাই (মিজো) খৃষ্টান। খাস বাঙালী প্রায় চোখেই পড়ে নি। আমি বিশেষ করে এই পার্বত্য খৃষ্টানদের সম্বন্ধেই কৌতূহলী ছিলুম এবং হাইস্কুলে ঢোকার সময় একটি লুসাই ছেলের সঙ্গে হৃদ্যতা হয়। সে সময় লুসাই ভাষা

---

২ এ যুগে মণিপুরে যে রকম হঠাৎ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়, সে রকম উদাহরণ কী অদূর অতীত কী বর্তমানে আমি অন্যত্র কোথাও পাই নি। মালকানা রাজপুতদের অল্পসংখ্যক লোকই বিংশ শতাব্দীতে 'আর্য-সমাজে' দীক্ষা নেয়। শিলঙ শহর প্রায় শত বৎসর ধরে হিন্দুপ্রধান। সেখানে ব্রাহ্ম ও ইসলাম মিশন স্থাপিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান মিশনারিরাই সব চেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করেন। এখনও আসামের সর্ব পার্বত্য অঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারিই অগ্রগামী—এবং কোনো কোনো লাগোয়া সমতল ভূমিতেও।

শিখতে গিয়ে—যদিও শেখা হয় নি—আবিষ্কার করি যে, অন্তত লুসাই ভাষাতে বাংলার বহু বহু শব্দের কোনো প্রতিশব্দ নেই ( পরে জানতে পারি, অলিখিত ভাষা মাত্রেরই সাধারণত এই হাল )।

জোন্‌স্ সায়েব থাকতেন ছিমছাম বাংলোয়, জানলায় পর্দা টানানো। সায়েব-মেম খানা খেতেন ছুরি-কাঁটা দিয়ে, ধবধবে সাদা টেবিলক্লথে ঢাকা খানা-টেবিলের পাশে। আমার বয়স তখন তেরো। কিন্তু তখনই মনে হয়েছিল, ধর্মযাজকের এতখানি বিলাস ভালো না—বিশেষ করে তিনি যখন মিশনের আর সবাইকে তাঁর মত 'বিলাসে' রাখতে পারেন না। ( পরবর্তী যুগে ইংলণ্ড এবং কন্টিনেন্ট ঘুরে বুঝতে পারলুম, জোন্‌স্ সায়েব তাঁর দেশের পাদ্রী-ভাইদের তুলনায় কতখানি আত্মত্যাগ করে ওই বিদেশ-বিভুঁইয়ে কতখানি সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন ; তাঁর আত্মাকে স্মরণ করে আজ ক্ষমা ভিক্ষা কার )।

আমার এবং আমার হিন্দু-মুসলমান বন্ধুদের মনে পাদ্রী সায়েবের ছিমছাম বাড়ি, আসবাবপত্র কোনো প্রলোভনের উদ্রেক করতো না। আমরা যেন কিছুটা বুঝে কিছুটা না বুঝে মনে মনে যুক্তি করতুম, 'খৃষ্টান হলে এ সব পাওয়া যায় ; কিন্তু আমরা তো ধর্ম বেচতে চাই নে।' তাই বোধ হয় জোন্‌স্ সায়েব তাঁর জোরদার বাগ্মিতা-শক্তি দ্বারাও কোনো বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে পারেন নি—করে থাকলেও অত্যন্ত দুঃস্থ দূর গ্রামাঞ্চলের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে। আমরা কখনো তার খবর পাই নি।

আমার কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগতো, মিশনের এই খাসি লুসাইরা কি জোন্‌স্ সায়েবের মত ফিটফাট বাড়িতে থাকতে চায় না ?

মণিপুরে যে সব বৈষ্ণব 'মিশনারিরা' গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সেখানে কোনো উচ্চতর মানের জীবনযাপন করেন নি। বস্তুত আজও মণিপুরের গ্রামবাসী সুর্মা উপত্যকার চাষার চেয়ে অনেক সচ্ছল। কাজেই এ নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব সেখানে উপস্থিত হয় নি।

কিন্তু নাগা-লুসাইদের মধ্যে কি হল ?

যারা লেখাপড়ায় সামান্য ভালো—এ কথা মানতেই হবে, খৃষ্টান মিশনারিরা তাঁদের সামর্থ্যে যতখানি কুলোয় ততখানি অর্থ শিক্ষার জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঢেলে দিয়েছিলেন এবং একদা সেখানে সাক্ষরের সংখ্যা বাংলার তুলনায় ছিল বেশী—তারা কোহিমা আইজলে পড়তে এল, পরে শিলঙে এবং কেউ কেউ কলকাতা পর্যন্ত। এবং যারা আপন গ্রাম থেকে বেরুলো না, তারা অন্তত পাদ্রী সায়েবের বাড়ি, তাঁর তৈজসপত্র দেখেছে। শিলঙে যে দু-চারজন চাকরি

নিয়ে থেকে গেল তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা বাড়ির টানে গাঁয়ে ফিরে গেল, এবং যারা গাঁয়েই ছিল এদের অনেকেই কি তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নততর করে পাদ্রী সায়েবের মানের কাছে আসতে চাইলো না ?

এ তো আমাদের চোখের সামনে নিত্য নিত্য ঘটছে। আমাদেরই গ্রামের ছেলে শহরে এসে আর গ্রামে ফিরে গিয়ে নিম্নমানের জীবনযাপন করতে চায় না। বস্তুত ফ্রান্স, জর্মনি সর্বত্রই ক্রন্দনরব উঠেছে, গ্রামের বুদ্ধিমান কর্মঠ ছেলে মাত্রই আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। পড়ে থাকে নিষ্কর্মাগুলো। দি ভিলেজেস আর বীইং ড্রেনড্ অব দেয়ার ব্রেনস—শহর ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রামের প্রতিভাকে। বিশ্বব্যাপী এই যে একতরফা ভাটা, এরই ফলে যে গ্রামোন্নয়ন করা যাচ্ছে না এ সম্বন্ধে 'উনেস্কো' বহুকাল ধরে সচেতন, বিস্তর গবেষণা করেছেন, দাওয়াই খুঁজে পাচ্ছেন না।

কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি হয় না, কারণ, যে গ্রামের ছেলে শহরে থাকতে চায় তার জন্য আশেপাশে বিস্তর ছোট-বড় শহর আছে—বোলপুর, শিউড়ি, বর্ধমান, শেষটায় যদি তাতেও প্রাণ না ভরে, তবে কলকাতা। রেলের চাকরি করে ভাগলপুর, পাটনা হয়ে কত কী !

কিন্তু মিজো-লুসাইবাসী যাবে কোথায় ? আইজল, লুঙলে তাদের কি দিতে পারে ? তারপর শতাধিক মাইলের ধাক্কা পেরিয়ে শিলচর—সে আমাদের সিউড়ি-বর্ধমানের তুলনায় কসমপলিটান শহর বটে—কিন্তু তারই বা মুরদ কতটুকু ? তার নিজেরই দুঃখের অবধি নেই। আসাম সরকার তাকে—যাক্, আবার না আরেকটা বাঙ্গাল খ্যাদানো আরম্ভ হয়ে যায় ( ভালো তো কারো করতেই পারি নে, মন্দটা না-ই বা করলুম ! ), আর কেন্দ্রীয় সরকার ? কতবার বুঝিয়েছি, এই শিলচরে বেতারের কেন্দ্র বানিয়ে নাগা-লুশাইদের কণ্ট্রোল করো—কে বা শোনে কার কথা ( এস্থলে বলে রাখা ভালো আমার জন্মভূমি কাছাড় নয় ) ! থাক সে কথা। মিজো যদি বা শিলচর পেরুতে চায় তবে সামনে যে খাঁড়া পাঁচিল—হিল্ সেক্শন—তারপর সেই সুদূর গৌহাটি। এখানে খাসিয়াদের সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যাবে, একে তাদের চাষের পদ্ধতি উন্নত, শিলঙ গৌহাটির ভাষা তারা মোটামুটি জানে, জিনিসপত্র সেখানে বেচতে পারে, চাকরিনোকরি মিস্ত্রিগিরি করে পয়সা কামাতে পারে। আর শিক্ষিত সম্পদশালী বহু খাসিয়া শিলঙ শহরের পাদ্রীর বাঙলোর চেয়েও ফিটফাট বাঙলোয় বাস করেন। তাই স্বভাবতই খাসিয়ারা অনেকখানি সন্তুষ্ট এবং তাই শান্ত।

কিন্তু মিজো যায় কোথায় ?

১৯১০।১৯১১ থেকে তাদের ভিতর আরম্ভ হয় খৃষ্টধর্ম প্রচার এবং ১৯৩১ নাগাদ অর্ধেক লুসাইবাসী হয়ে গেছে খৃষ্টান। তারপর কি হয়েছে জানি নে। নিশ্চয়ই বেড়েছে। কারণ মিশনারিদের কাজ বন্ধ হয় নি। আদমশুমারীর হিসাব দেখে লাভ নেই। ঐ সময় থেকেই আরম্ভ হয়, পরের সেনসাসে কার স্বার্থ অনুযায়ী কি দেখাতে হবে তাই নিয়ে ছিনিমিনি, ইংরিজীতে যাকে বলে 'কুকিং'।

পার্বত্যাঞ্চলবাসী অনেক সময় আমাদের হিসেবে নিষ্ঠুর কিন্তু তারা সরল। সরল বিশ্বাসে তারা মনে আশা পোষণ করেছিল, যারা তাদের খৃষ্টান করেছে তাদেরই জাতভাই ইংরেজ সরকার একদিন তাদের বাসনা-কামনা পূর্ণ করে দেবে। 'জুম' খেত করে যে তার পয়সায় পাদ্রীর বাঙলো বানানো যায় না সেটা তারা বোঝে না। আমার মনে হয়, ইংরেজ-রাজ থাকলেও আজ না হোক কাল বা পরশু মিজোদের রুদ্ধ আক্রোশ ইংরেজকেই আক্রমণ করতো। তবে ইংরেজ ধাপ্পা মারতে ওস্তাদ—বাঙালীর মত চালাক জাতকেও কতবারই না একটা কুমীরছানাকে বারোটা করে দেখিয়েছে! কবিগুরুর মত বিচক্ষণ জন এবং তাঁর চেয়ে দু'দে বহু পলিটিশিয়ান 'ব্রিটিশ জস্টিসে' বহুকাল ধরে বিশ্বাস রেখে আশা করতেন, সময় এলে আমরা ইংরেজের কাছ থেকে জস্টিস—সুবিচার পাবো।

অবশ্য এ-কথাও স্বীকার করি—যাঁরা আমার সঙ্গে একমত নন তাঁদের কাছে মাফ চাইছি যে, দেশ-শাসন ব্যাপারে ইংরেজের অনেকগুলো সদগুণ আছে এবং সেই অনুপাতেই আসাম সরকার,—থাক, আবার কেন? তবে আসাম সরকার না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মিজোদের ভার নিলেই যে মুশকিল আসান হয়ে যেত সেটা আমি বিশ্বাস করি নে। যাই বলুন, যাই কন, আসাম সরকার বাস করেন শিলঙে—খাসিয়াদের মধ্যিখানে। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরে নেফা অঞ্চলেও রয়েছে আরো গণ্ডায় গণ্ডায় উপজাতি। তাদের অনেকেই প্রতি হাটবারে নেমে আসে সমতলে, ক্ষেতের জিনিস, এটা-সেটা (তখনকার দিনে চামর, মৃগনাভি, হাতীর এবং 'গণ্ডারের দাঁত—ভয়ঙ্কর মূল্যবান জিনিস, মধ্যপ্রাচ্যে 'হারেম' পোষণের জন্য মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় নিত্যকাম্য এফ্‌রডিসিয়াক ইত্যাদি) বিক্রি করে প্রধানত নুন, কেরোসিন[৩] (সর্বনাশ! আমাদেরই যা হাল, ওদের হচ্ছে

৩ এক সিলেটী মুসলমান ডাক্তার বহু বৎসর আইজল-লুঙলেতে কাটিয়ে এসে আমায় বলেন, মিজোরা দু-দিন তিন-দিনের পাহাড়ের চড়াই-ওৎরাই পথ পেরিয়ে লুঙলে আসতো কেরোসিন কিনতে। সে কেরোসিন আসতো শিলচর থেকে, বেশীর ভাগ পথ মানুষের কাঁধে, বাঁকে করে। একবার একজন বাহকের কলেরা

কি ? তবে হ্যাঁ, ডিগবয় ওদের অতি কাছে ) কিসে নিয়ে যাবার জন্য। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসী আসামীদের অনেকেই তাদের চেনেন। কাছাড়বাসী ক'জন সদস্য আসাম মন্ত্রিমণ্ডলীতে আছেন সঠিক জানি নে ; যে কজন আছেন একমাত্র তাঁরাই ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাবাসীদের তুলনায় নাগা-মিজোদের বিলক্ষণ চেনেন, সদুপদেশ দিতে পারবেন, অবশ্য শর্ত, যদি কেউ চায়। এঁদের তুলনায় নাগা-মিজোদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের জ্ঞান সীমাবদ্ধ—এ বিষয়টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে বুঝিয়েছিলেন নাগাদের প্রথম গ্র্যাজুয়েট, সে-সময় আপন মাতৃভূমি নাগা পাহাড়েই এস ডি ও শ্রীযুত কে ভি চুসা, ট্রেনে শেয়ালদা থেকে সিলেটের কুলাউড়া পর্যন্ত দিল্লি থেকে মুককচঙ ফেরার পথে। সুযোগ পেলে সে কাহিনী আরেক দিন হবে। শ্রীচুসা অর্থনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করেন।

মিজোরা সরল বিশ্বাসে ভাবছে, আমরা—তা সে কেন্দ্রীয় সরকারই হোক, আর আসাম সরকারই হোক—বিধর্মী ( নাগারাও কড়া সুরে বলে, 'যারা আমাদের সঙ্গে আমাদের গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে না তারা আমাদের ঘৃণা করে।' সেটা না হয় করা গেল, কিন্তু খেতেও হবে তাদের সঙ্গে এবং স্বর্গস্থ প্রভু জানেন, একমাত্র চারপাই ছাড়া সর্ব চতুষ্পদই তারা খায়। সঙ্গে সঙ্গে পান করতে হবে শুকনো লাউয়ের পাত্রে ভর্তি ভাত পচিয়ে তৈরী লিটার লিটার বিয়ার। কোহিমার ছোকরা ইংরেজ শাসনকর্তা এ-তিনটির প্রথমটি করে পুণ্যসঞ্চয় করতেন, বাকি দুই বাবদেও তেনারা সমগোত্রীয়, এমন কি প্রয়োজন হলে village belle-কেও তাঁরা নিরাশ করতেন না—কারণ ব্যাচেলার ভিন্ন অন্য কাউকে সেখানে সচরাচর পাঠানো হত না ) এবং যেহেতু আমরা বিধর্মী তাই আমরা তাদের ন্যায্য পাওনা দিচ্ছি না। আমরা সরে গেলেই তাদের সর্ব বাসনা কামনা পূর্ণ হয়ে যাবে। মোস্ট প্রিমিটিভ জুম চাষ করে যে এবসার্ড জীবনমান উচ্চ পর্যায়ে তোলা যায় না সেটা বোঝাবে কে ?

---

হয় নির্জন পথিমধ্যে। বাঁশের স্ট্রেচার বানিয়ে অন্য চারজন বেহারা রোগীকে নিয়ে লুঙলে পানে রওয়ানা দেয়—দশ টিন কেরোসিন পায়ে চলার 'পথের' উপর রেখে দিয়ে। গণ্ডায় গণ্ডায় কেরোসিনকামী খৃষ্টান অখৃষ্টান চলেছে লুঙলের দিকে, কিন্তু তাদের ধর্মবোধ এমনই প্রবল যে তারা কেরোসিনের দিকে ফিরেও তাকালো না। বেহারারা লুঙলে থেকে ফিরে এসে সমুচা সব কটা টিন যথাস্থানে পায়—তারাও জানতো, লোপাট হবে না, তাই লুকিয়ে রাখার প্রয়োজনও বোধ করে নি। সেই মিজোরাই এখন লুঙলেতে লুটতরাজ করলো।

অবশ্য মিজোদের অসন্তোষের অন্যান্য কারণও আছে। আমি শুধু একটা কারণ দেখালুম—অন্তত মার্কসিস্টরা খুশী হবেন—তাঁদের অনেকেরই মতে এইটেই একমাত্র কারণ। একমাত্র কারণই হোক আর প্রধানতম কারণই হোক, অর্থনৈতিক কারণটার সন্ধান নেওয়া সর্বক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। লেনিনের সমসাময়িক ভিয়েনার অর্থডক্স অর্থনীতি পণ্ডিত শুমপেটার এবং তাঁরই মত কট্টর বার্লিনের জমবার্ট কেউই এই দৃষ্টিবিন্দুটি অবহেলা করেন নি।

স্বীকার করে নিচ্ছি, আমার এ বিশ্লেষণ ভুল হতে পারে, কিন্তু তথ্যগুলো সঞ্চিত হয়েছে বিশ্বস্তজনের কাছ থেকে।[৪]

---

৪ (ক) মিজো প্রবন্ধটি লিখে 'দেশ' দপ্তরে পাঠিয়ে দেবার পর দুটি তাৎপর্যপূর্ণ খবর বেরিয়েছে। প্রথমটিতে মাদ্রাজের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীযুত বিষ্ণুরাম মেধী বলেছেন—'যাতে করে মাল চলাচল জাম্ না হয়ে যায় ( "transport bottleneck" ), মিজো, নাগা এবং অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে রেল-লাইন বসানো উচিত।' তিনি General council meeting of the All-India Railwaymen's Federation-এতে এ বিবৃতিটি দেন ও ২৭ ৩-[illegible]-ব কাগজে এটি বেরোয়। মিজো নাগারা যে রেলের অভাবে বাদবাকি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, সে-কথা আমি প্রবন্ধে নিবেদন করেছি।

(খ) পার্বত্য-অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যাপক রিপোর্ট দেবার জন্য যে পাটস্কর্ কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল তার রিপোর্টের কয়েকটি প্রধান সুপারিশ ৩১ মার্চ বেরিয়েছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না পড়ে কিছু বলার উপায় নেই, কিন্তু যেটুকু বেরিয়েছে তার থেকে মনে হল 'আধুনিক ঘটনার আলোকে' রিপোর্টটি আউট অব ডেট—তামাদি না হলেও বর্তমানের প্রশ্নবাণ সইতে পারবে না।

১৬।৪।৬৬

# গাড়োলস্য গাড়োল

আদরের ডাক-নাম য়প্‌প্‌ বা ইয়প্‌প্‌—সারা দেশটা জুড়ে। তোলা-নাম হার ডক্টর ইয়োজেপ (য়প্‌প্‌) গ্যোবলস্‌, রাষ্ট্রের প্রপাগাণ্ডা-মন্ত্রী, রাজধানী বার্লিনের গাও-লাইটার (অঞ্চলাধিকারী) এবং ফুরার অ্যাডল্‌ফ্‌ হিটলারের শেষ জুয়ো-খেলার পাশা যখন ব্লাঙ্কো মেরে মেরে যাচ্ছে, তখন সর্বাত্মক, টোটাল ওয়ারের জন্য কুল্লে তাগৎ 'ইকট্রে' করার জন্য সর্বাধিকারী। পার্টির ব্রেন-বাক্সো। শত্রু-মিত্র সবাই এক সুরে বলেছেন, 'হাঁ, প্রপাগাণ্ডা কারে কয়, সে-বস্তু দেখিয়ে গেছে ঐ ব্রেন-বাক্সোটা।' বাক্সোটির এক দিক দিয়ে ঢুকতো সাদামাটা তথ্য, হাফ-তথ্য, তাহা মিথ্যে, ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন বেরিয়ে আসতো অন্য দিক দিয়ে। এক-একখানা চাঁছাছোলা, নিটোল, অব্রণ, অনিন্দনীয় কলাসৃষ্টি। দাঁড়ান, এই 'কলা-সৃষ্টি' রহস্যটা একটু গুছিয়ে বলতে হয়—কারণ, এ-বাবদ তাবৎ টেকনিক্যাল টার্ম একমাত্র ফরাসীর মারফতে প্রকাশ করা সম্ভবে। তদুপরি গ্যোবল্‌স্‌ সায়েবের দিলের দোস্ত থেকে জান্‌-এর দুশমন্‌ তক্‌ স্বীকার করেছেন, ভোঁতা হোঁৎকা টিউটন নাৎসী পাঁঠাদের ভিতর ঐ গ্যোবলস্‌ই ছিলেন একমাত্র জিনিয়াস, যাঁর স্কন্ধে বিরাজ করতো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মস্তিষ্ককুণ্ডলী পরিপূর্ণ লাতিন মাথা—তাই তাঁর লিখন-কথন উভয়েতেই ছিল, ফরাসীসুলভ স্ফটিক স্বচ্ছতা।[১] এ-কলাসৃষ্টিকে অ্যভ্‌র্‌ দা'র বলা যেতে পারে, মাস্টার পীস অব আর্ট বললে ঠিক ঠিক মানেটা ওৎরায় না। অব্‌জে দা'র শব্দসমষ্টি আমি শুনেছি; এটা বোধ হয় morale-এর মত ইংরিজিতে চালু ভেজাল ফরাসী মাল (আমরা যেরকম কলকাত্তাই উর্দুতে 'একঠো' 'দুঠো'র ভেজাল বরাব্বর ব্যবহার করে আসছি।) অর্থ, যে-কলাসৃষ্টি

১ অক্সফোর্ডের ইতিহাস-অধ্যাপক ট্রেভর-রোপারের মত জর্মনির জাতশত্রু শতেকে গোটেক; তদুপরি তিনি একটি আস্ত স্নবস্য স্নব। তিনি বলেন, 'and it was the Latin lucidity of his (Goebbels') mind, the un-German suppleness of his argument which made him so much more successful as a preacher than the frothblowing nationalists of the South.'

অবশ্য অধ্যাপককে বোঝা ভার। তিনি শতাধিক বার বলেছেন, জর্মনরা অতিশয় অগা জাত। উত্তরে বলি, অগারা পরিষ্কার যুক্তি বোঝে না; রহস্যের সন্ধানে কোটে মাথা। তাই জর্মন দার্শনিকদের ভিতর লাতিন ধরনের স্বচ্ছ লেখক শোপেনহাওয়ার ভোঁতা লেখক হেগেল্‌-এর তুলনায় অবহেলিত।

কোনো কাজে লাগে না, যেমন 'পাপিয়ে মাশে'তে তৈরী কাশ্মীরী ফুলদানি-পারা সৃষ্টিছাড়া বস্তু, যেটাতে ফুল রাখা যায় না বটে, কিন্তু দেখতে খাসা। গ্যোবলস্ সায়েবের বেতার বক্তৃতা বা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বিলকুল বেকার নয়—টায়-টায় কাজে লাগতো। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি টলস্টয়কে নিশ্চয়ই পরম আপ্যায়িত করতে পারতেন; পার্থক্য মাত্র এইটুকু যে, টলস্টয় তাঁর কলা দ্বারা নির্মাণ করতেন স্বর্গারোহণের সোপান, য়প্‌প্‌ নির্মাণ করতেন রসাতলের খাড্ডায় সবেগে নিপতিত হওয়ার তরে অত্যুত্তম পিচ্ছল সানুপ্রদেশ। আর ইহুদিকুলের কল্যাণার্থে গ্যাস-চেম্বার!

হিটলারের বক্তৃতা-গর্জনও রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যতুল্য প্রলয়ঙ্কর, কিন্তু সেটাকে অত সহজে বিশ্লেষণ করা যায় না। সেটাও কলাসৃষ্টি এবং সেটি য়প্‌প্‌-মার্কার চেয়ে লক্ষগুণে কার্যকরী। কড়া পাক।

দুজনার মুখে একই জিগির: ইহুদিকুল সর্বনেশে। এদের সমূলে বিনাশ করতে হবে।[২]

কিন্তু দুজনের মনের ভিতর দু' প্রকারের যুক্তি। য়প্‌পের বিশ্বাস, ইহুদিরা সর্ব ব্যাপারেই সাতিশয় ধুরন্ধর। এদের সঙ্গে 'নর্ডিক আর্যরা' অর্থাৎ জর্মনর কিছুতেই পাল্লা দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে হিটলার এটা মানতে পারেন না—জান্ কবুল। তাঁর মতে, এই বসুন্ধরায় যে-কটা ডাঙর ডাঙর জাত, গোষ্ঠী, বংশ—যা খুশি বলুন, ইংরেজীতে Race, জর্মনে Rasse—তার মধ্যে 'আর্য'-রেস সর্বোত্তম। এবং সেই আর্য রেসের ভিতর সর্বোত্তমেরও সর্বশ্রেষ্ঠ জর্মনির নর্ডিক, নীল চোখ, ব্লন্‌ড্‌ (সোনালী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূপালীও—যেটাকে বলা হয় প্লাটিনাম ব্লন্‌ড্‌) চুলধারী 'আর্য' রেস। ইহবিশ্বের সর্ববাবদে তারাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্পন্ন শক্তিমান যুবার শরীরেও যেমন ক্যানসার দেখা দিতে পারে, ঠিক তেমনি জর্মন সমাজে এসে ঢুকেছে ইহুদি গোষ্ঠী। এরা

২ ন্যুরনবেরগের মোকদ্দমায় যখন আসামী নাৎসিদের বিরুদ্ধে বলা হলো যে তাঁদের ফ্যুরার গুরুই ইহুদিদের ausrotten='সবংশে নির্বংশ' করবেন বলে একাধিকবার সর্বজনসমক্ষে পণ করেছিলেন, তখন আসামী পক্ষ বলে, 'ওসব কথার কথা। কেউ যখন বলে, "তোমার চামড়া দিয়ে ডুগডুগি বাজাবো" (বাঙলায় বলতে গেলে এই অনুবাদই জুৎসই) তখন অন্য পক্ষ সেটা সিরিয়াসলি শব্দার্থে নিয়ে বিশ্বের তাবৎ ডুগডুগি বানাবার যন্ত্রপাতি বিনষ্ট করতে মাথায় গামছা বাঁধে না।'

ছারপোকার মত ভার্মিন। ছারপোকা বেশী বুদ্ধিমান না মানুষ বেশী বুদ্ধি ধরে, এ প্রশ্ন বুদ্ধিমান মানুষ তুলবে না—বুদ্ধিমান বা মূর্খ ছারপোকা তুলবে কি না, সেটা হিটলার বলেন নি।

য়প্‌প্‌ বললেন, 'এটা হল তুলনা। তুলনা যুক্তি নয়।'

ফ্যুরার বললেন, 'তুলনা মাত্রই তিন ঠ্যাঙের উপর দাঁড়ায়। টায়-টায় যুক্তির স্থান নিতে পারে না সত্য, কিন্তু আপন বক্তব্য জোরদার ও প্রাঞ্জল করার জন্য তুলনার ব্যবহার করেছেন সর্বগুণীজ্ঞানীই।'

য়প্‌প্‌ বললেন, 'তর্কস্থলে মেনে নিলুম।' গ্যোবলস্‌ বড়ই প্রভুভক্ত ছিলেন। নইলে প্রভুর আত্মহত্যার চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর তাঁর ছ'টি শিশুপুত্রকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে খুন করিয়ে সস্ত্রীক আত্মহত্যা করবেন কেন?[৩] বললেন, 'তাই সই। কিন্তু আমি আপনাকে হাতেনাতে দেখিয়ে দেব, ইহুদিরা অন্তত ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্যের চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে।'

'কোনো ক্ষেত্রেই না।'

'বাজী ধরুন।'

'বিলক্ষণ! কত?'

'এক লাখ।'

'গেমাখ্‌ট্‌—পাক্কী বাৎ।'

দুজনাতে ছদ্মবেশে বেরুলেন। তার জন্য বেশী বেগ পেতে হল না। এমনিতেই ঠোঁটকাটা বার্লিন-কক্‌নিরা বলতো ফ্যুরারের চুল নেবে পড়ে কপাল ঢাকে নি—এটা অকল্পনীয়; আর গ্যোবল্‌স্‌ এক লহমার তরে বকর বকর বন্ধ করেছে—এটা ততোধিক অবিশ্বাস্য। হিটলার তাই চ্যাটচেটে পমেটম দিয়ে যেন প্রায় ভৈরবচণ্ডীর মত চূড়ো-খোঁপা বাঁধলেন—এবারে আর চুল খসে পড়ে, কপাল ছাপিয়ে চোখ এস্তেক ঢেকে দেবে না। বাস্‌, এতেই হয়ে গেল ছদ্মবেশ। আর য়প্‌প্‌? তিনি বললেন, তিনি প্রতি দশ মিনিটে একটি মাত্র সেনটেনস বললেন। এ-রকম বিকট চুপচাপ লোককে কে চিনবে য়প্‌প্‌ বলে!

য়প্‌পেরই প্রস্তাবমত দুজনাতে ঢুকলেন এক পাঁচমিশিলি খাঁটি আর্য দোকানে। চাইলেন একটা টী সেট। দোকানী একটি রমণীয় ট্রের উপর সব কিছু সাজিয়ে সামনে ধরলো। গ্যোবলস্‌ তো তাঁর মুণ্ডটি ডান থেকে বাঁয়ে,

৩ সবিস্তর কাহিনী পাঠক পাবেন, অধীনের 'দু-হারা' পুস্তকে, হিটলারের 'শেষ দশ দিন' প্রবন্ধে।

ফের বাঁ থেকে ডাইনে নাড়িয়ে নির্বাক প্রশস্তি শুনিয়ে দিলেন। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়লো ঐরকম ভাবখানা করে বললেন, 'কিন্তু আমার যে-দোস্তকে আমি এই জন্মদিনের সওগাৎটা দেব তিনি তো ন্যাটা; আপনাদের কাছে কি লেফট-হ্যাণ্ডারদের জন্যে কোনো-টী সেট আছে?' হিটলার বললেন, 'হুঁ।' ভদ্র আর্যসন্তান আমাদের দোকানী তো বেবাক বে-বাক্—অবাক। 'লেফটহ্যাণ্ডারস টী সেট?' সে আবার কি গব্বযন্তণা রে বাপু! বাপের জন্মে নাম এন্তেক শোনে নি। অনেকক্ষণ ঘাড় চুলকে, বিস্তর আন্দেশা করে আপসাআপসি করে সবিনয় জানালে,তার কাছে নেই।

হিটলার দিল্‌দরাজ আদমী। এক গাল হেসে বললেন, 'মাখ্‌ট্‌ নিক্‌স্‌, মাখ্‌ট্‌ নিক্‌স্‌—বিলক্ষণ, বিলক্ষণ! তাতে এসে যায় না। আমরা অন্য দিন দুসরা জিনিসের জন্য আসবো'খন—খাসা দোকানটি কিন্তু! কি বলো হ্যার ডক্—থুড়ি! ঔফ বীডার জেএন! গুটে নাখ্‌ট্‌! আসি তবে। হেঁ হেঁ, হেঁ হেঁ।'

এবারে য়প্‌প্‌ প্রভুকে নিয়ে ঢোকালেন এক ইহুদির দোকানে।

দোকানী ছিল না। তার চোদ্দ বছরের ছেলে ছুটে এসে অদৃশ্য শ্যাম্‌পুতে (কথাটা আজকাল বড্ডই 'ফেশিনিবিল' হয়েছে; আম্মো ব্যাভার করতে চাই) হাত কচলাতে কচলাতে একবারের জায়গায় তিন-তিনবার বলে বসলো, 'য়ুটন ময়েন, য়ুটন ময়েন, য়ুটন ময়েন (গুটন্‌ মর্গেনের অর্ধশিক্ষিত উচ্চারণ), মাইনে হেরেন্‌।'

উত্তরে হিটলার বিড়বিড় করে কি একটা বললেন, ঠিক ঠাহর করা গেল না। দক্ষিণের কোনো কোনো ব্রাহ্মণ নাকি একদা রাস্তায় ('সড়ক' 'সরকে' বা 'সরণিতে'—ওঃ! কী স্টর্ম ইন এ টী 'সেট'!) বেরলে চিৎকার করতেন, অস্পৃশ্য যেন সরে যায়, তার ছায়া যেন ওঁর গায়ে না পড়ে—তবে এদের পঞ্চাশ বা ষাট লক্ষকে বামুন গ্যাস চেম্বারে[৪] খুন করে পুড়িয়েছে একথা কখনো শুনি নি। অতএব হিটলার যে ইহুদি ছোকরাকে হেল-ফেলো-উয়েল-মেট (hail-fellow-well-met) করেন নি, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়। ইহুদি

৪ এর অন্যতম বড়কর্তা হ্যোস হ্যুরনবের্গ মোকদ্দমায় সাক্ষী দেন, এবং পরে এঁর ফাঁসি হয়। দু'জন হাড়ে-পাকা মনস্তত্ত্ববিদ মার্কিন চিকিৎসক এঁকে আগা-পাশতলা পুন লুন পরীক্ষা করেও এঁর ভিতর কোনো কিছু অ্যাব নরমাল পান নি। ইনি বলেন, 'হাজার খানেক মানুষ গ্যাস দিয়ে মারতে আমার ১০ থেকে ১২ মিনিট সময় লাগতো, কিন্তু আসল মুশকিল ছিল এদের পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করা—

ছোকরা কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'আমার বলে দেওয়া উচিত, সরকারের হুকুম, কোনো "আর্য" যদি ইহুদির দোকানে ঢোকেন তবে দোকানদার যেন তাঁকে সতর্ক করে দেয়, এটা ইহুদির দোকান, এখানে কেনাকাটা করলে আর্যই দায়ী। সাইনবোর্ডেও স্পষ্ট করে লেখা আছে, আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেন নি।'

হিটলার বিড়বিড় করলেন, 'শোন্ গুট্ শোন্ গুট্'—অনেকটা যেন ঠিক আছে, ঠিক আছে, মেলা বকো না।

টী সেট চাওয়া হল। এল। গ্যোবলস্ ন্যাটার সেট্ চাইলেন।

ছোকরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই সম্বিতে ফিরে এক গাল হেসে বললে, 'এখখুনি নিয়ে আসছি, স্যার!' বলে যে সেট ট্রে'র উপর সাজিয়ে রেখে দেখিয়েছিল সেইটে তুলে নিয়ে গুদোমঘরে অদৃশ্য হলো। দু-মিনিট পরেই আরেকটা আরো বাড়িয়া ট্রে'র উপর সাজিয়ে নিয়ে এল ন্যাটাদের সেট্।

তালেবর ছোকরা করেছে কি, এবারে ঐ আগেকার সেটই উল্টো করে সাজিয়েছে, অর্থাৎ টী-কাপগুলোর আঙটাগুলো রয়েছে খদ্দেরের বাঁ দিকে; তার মানে, খদ্দের বাঁ-হাত বাড়ালে আঙুল ঠিক আঙটার যথাস্থানে পড়বে।

গ্যোবলস্ বাক্যব্যয়ে না করে যথামূল্যে সেট্ কিনে নিলেন।

বেরিয়ে এসে বললেন, 'দেখলেন ইহুদিটার চালাকিটা?'

হিটলার অতিশয় সরল দরদী কণ্ঠে বললেন, 'চালাকিটা আবার কোথায়? 'বেচারী আর্যের ন্যাটা সেট্ ছিল না স্টকে, তো সে আর করবে কি?'

* *

এবারে সিরিয়স কথা:—ব্যাটারা বলে, তারা নাকি আর্যোত্তম। আরে মোলো, আর্যোত্তম যদি হবিই, তবে সর্ব-আর্যের—তা সে গ্রীকই হোক, লাতিনই হোক কিংবা তাদের বহু পূর্বের মিটানির হিটাইটই হোক—সর্বপ্রাচীন সংহিতা চতুর্বেদ আছে ভারতীয় আর্যের শ্রুতিতে ভিন্ন অন্য কোন্ 'আর্য' গোসাইয়ের পট্টাঙ্গ প্রত্যঙ্গে?

---

দিনের পর দিন নাগাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা চুল্লিগুলো চালু রেখেও কাজ খতম হত না।' গ্যাস চেম্বারে ইহুদিদের চাবুক মেরে মেরে ঢোকানো থেকে, চুল্লি চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখে তাতে লাশ পুড়িয়ে ছাই করে জলে ভাসানো পর্যন্ত সব কাজ করতো কোনো কোনো স্থলে ইহুদিরাই। তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এই প্রলোভনে। পরে অবশ্য তাদেরও ঘাড়ে গুলি করে মারা হত, পিছন থেকে, অতর্কিতে।

কিন্তু, আমরা তো দিয়েছি আশ্রয়—প্রথম ইহুদিরা যখন জীবনমৃতাবস্থায় নিমজ্জমান তরণীতে করে বোম্বাই উপকূলে পৌঁছয়। গ্যাস-চেম্বারের কথা এই দু বা আড়াই হাজার বছর ধরে আমাদের মাথায়ই খেলল না! তবে, হ্যাঁ, এদানির কেউ কেউ বলেন, আমরা যে অস্মদ্দেশে ইজরায়েল প্রেসিডেন্টের শুভাগমনোপলক্ষে উদ্বাহু হয়ে 'লৃত্ত' করি নি সেটা গ্যাস-চেম্বারে পোরার চেয়েও সখ্‌ৎ গুনাহ্‌! তোবা! তোবা!!

## ভাষা

হাট-বাজার, শাক-সবজি,[১] দান-খয়রাৎ, দুখ-দরদ, ফাঁড়া-গর্দিশ, মান-ইজ্জৎ, লজ্জা-শরম, ভাই-বেরাদর, দেশ-মুল্লুক, ধন-দৌলত, রাজা-বাদশা, ঝড়-তুফান, হাসি-খুশী, মায়া-মহব্বৎ, জন্তু-জানোয়ার, সীমা-সরহদ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এস্থলে লক্ষ্য করার প্রথম তত্ত্ব এই যে, প্রত্যেক সমাসের প্রথম শব্দটি খাঁটি দিশী ভারতীয় শব্দ; হাট, শাক, দান, দুখ, মান, লজ্জা, দেশ ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় শব্দটি যাবনিক (আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হীব্রু গয়রহ্‌), যেমন বাজার, সবজী, খয়রাৎ, দর্দ্‌ ইত্যাদি। এবং দুটি শব্দই প্রায় সমার্থসূচক।

তাহলে প্রশ্ন, এ 'কুকর্মের' কি প্রয়োজন?

আমরা যখন সাধারণের কোনো অজানা ভাষা থেকে উদ্ধৃতি দিই, তখন বাঙলা অনুবাদটি দি তার পরে। তাই আমরা যদি ইংরিজী প্রবন্ধে সংস্কৃত বা বাঙলা উদ্ধৃতি দিই তবে ইংরিজী অনুবাদটি দি পরে। অর্থাৎ যাকে বোঝাতে যাচ্ছি, তার ভাষা আসে পরে।

তা হলে মনে করুন, মুসলমানের আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু (বা নবদীক্ষিত মুসলমানও হতে পারে, কারণ হিন্দু ধর্মবর্জন করে মুসলমান হয়ে গেলে রাতারাতি তার আরবী ফার্সী রপ্ত হয়ে যায় না) গেল মুসলমান শাসনকর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, 'ধর্মাবতার, হুজুর!—দেশ—' বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে 'হুজুর কি "দেশ" শব্দটা জানেন! হুজুর তো হাট-বাজারে ঘোরাঘুরি করে দিশী শব্দ শেখবার ফুর্সৎ পান না'—(অথচ আমাদের হিন্দুটি পেটের দায়ে, কাজের তাড়ায় বিদেশাগত মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা

১ কিন্তু শাক-ভাত, শাক-পাত, শাক-পাতেড়, শাকান্ন, শাক-মাছ অন্য সমস্যার অঙ্গ। স্থানাভাব না হলে সেটিরও আলোচনা করা হবে।

করার ফলে কিছু কিছু যাবনিক শব্দ শিখে গিয়েছে ) তাই 'দেশ' বলে থমকে গিয়ে বললে 'মুল্লুক'—ওটা হুজুরের যাবনিক শব্দ। অতএব শেষ পর্যন্ত তার নিবেদন দাঁড়ালো, 'দেশ-মুল্লুক ছারখার হয়ে গেল। রাজা-বাদশা ( আবার রাজা বলে থমকে গিয়ে যাবনিক "বাদশা" বললে) আমাদের মত কাঙাল-গরীবের ( গরীব আরবী ) দুখ-দরদ্ ( দরদ্, দর্দ ফার্সী ) কে বুঝবে ? আমাদের মান-ইজ্জৎ ( ইজ্জৎ আরবী ) ধন-দৌলত ( দৌলত যাবনিক ) সব গেল। মেয়ে-ছেলের লজ্জা-শরম ( শর্ম যাবনিক )ও আর বাঁচে না। রাস্তায় বেরোলেই দেখতে পাবেন, কারো মুখে হাসি-খুশী ( খুশী ফার্সী ) নেই। হুজুর অনুমতি দেন —ভাই-বেরাদর ( বেরাদর ফার্সী ) নিয়ে মগের মুল্লুকে চলে যাই।'

মনে করুন, কথার কথা কইছি, হুজুর সত্যকার হুজুর ছিলেন। হুঙ্কার দিয়ে প্রতিবিধান করলেন।

আমাদের বঙ্গসন্তানটি বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে আনন্দে ডগমগ হয়ে বললে, 'বুঝলে গিন্নী, হুজুর যা আমায় খাতির—' ( বলেই থমকে দাঁড়ালো ; হুজুরের দরবারে 'খাতির' কথাটি খুবই চালু, সেইটেই এতক্ষণ ধরে দরবারে সে শুনেছে, তাই দুম্ করে সেটা ব্যবহার করে দুশ্চিন্তায় পড়লো, গিন্নী তো যাবনিক শব্দটা বুঝবে না, গিন্নী তো হাট-বাজারে গিয়ে যবনের সঙ্গে মেলা-মেশা করে এসব শব্দ শেখে নি—তাই সঙ্গে সঙ্গে বললে ) 'যত্ন—হুজুর যা খাতির-যত্ন করলেন কি বলবো। আবার দোকান ( ফের মুশকিল—দোকান ফার্সী শব্দ, তাই বললে "হাট" [ হট্ট ] হাট খুলবে,—কোনো চিন্তা করো না গিন্নী! নারায়ণ, নারায়ণ।'

এ যুগে আবার ফিরে আসবো। কিন্তু তার পরবর্তী যুগে দেখুন, ইংরেজ boss-কে বলছি, 'স্যার! আমি উকিল—( বলেই থমকে দাঁড়ালুম, উকিল যদ্যপি আসলে আরবী শব্দ, এদানির ইটি খাঁটি বাঙলা, স্যার কি বুঝবেন ?—তাই হন্তদন্ত হয়ে বললুম ) ব্যারিস্টার ( উকিল-ব্যারিস্টার ) লাগিয়েছিলুম। ঘটি-( ঐ যা! স্যর বুঝবেন কি ? ) গেলাস ( glass—এবার স্যর বুঝবেন! )—ঘটি-গেলাস বন্ধক দিয়েছি— তেনাদের জন্য এরেক ( ফের ইংরাজি 'ব্রাণ্ডি' ) ব্রাণ্ডি, বিড়ি-সিগারেট ( দ্বিতীয়টা ইয়োরোপীয় ) যা গেছে সে আর বলে কাজ নেই।'

এই সব বলে-কয়ে তো ছুটি নিয়ে দেশে গেলুম। প্রথমেই ঠাকুরমাকে পেন্নাম।

বললুম, 'ঠাকুমা, পরে সব গুছিয়ে বলবো, এই বেলা শুনে নাও সংক্ষেপে। বড় মাসীর গুণধর ছোট ভাইটি নিয়েছেন ফ্ল্যাট ( আবার সেই হাঙ্গামা—ঠাকুমা তো 'ফ্ল্যাট' বুঝবে না, অতএব বললুম ), ফ্ল্যাট-বাড়ি। আমাদের কাউকে না

শুনিয়ে করেছেন বিয়ে। কিন্তু ঠাকুমা, মেয়েটি কী সুন্দর! একেবারে ডল ( doll—সর্বনাশ, ঠাকুমা তো বুঝবে না, তা হলে 'পুতুল' বলি )-পুতুলের মত। কিন্তু হলে কি হয়! গুরু আছেন, ধম্মো আছেন। ব্যাস! এল তেড়ে টাইফয়েড-জ্বর ( টাইফয়েড তো জ্বরই বটে—তবু ঠাকুমা যদি না বোঝেন, অতএব 'জ্বর'টা বলতে হল ) ; তুমি ভাবছো আমরা কিছুই করি নি। ডাক্তার ( আবার সেই বিপদ, তাই বলতে হল ) বদ্যি ( ডাক্তার-বদ্যি ) নিয়ে এলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।'

তাই আবার নিবেদন করছি, যাকে বোঝাচ্ছি তার বোধ্য শব্দটি আসে পরে।

এটা কিছু নূতন তত্ত্ব, আমাদের দেশের আজগুবী ব্যাপার নয়। ইংলেণ্ডেও নরমান বিজয়ের পর ইংরেজ যখন বিদেশী হুজুরের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ বা রিপোর্ট দিত, তখন বলতো, 'He is very meek and humble ( meek খাঁটি ইংরিজি, কিন্তু humble বিজয়ী নরমানদের শব্দ ), Sir, but it is odd and strange ( odd ইংরিজী, strange নরমান ), that although we thought it meet & proper ( meet ইংরিজী, proper নরমান ) that we should search every nook and corner ( nook ইংরিজী, corner নরমান ), our sorrow and grief ( sorrow ইংরিজী, grief নরমান ) know no bound that we did not find him'

তফাৎ শুধু এইটুকু যে ইংরেজ তখন দিশী ও বিদেশী শব্দের মাঝখানে and বসিয়েছে—meek and humble, odd and strange ; আমরা বাঙালীরা 'and' 'এবং' বসাই নি ; আমরা বলেছি, হাসি-খুশী, মান-ইজ্জৎ, দেশ-মুল্লুক।

পাঠক কিন্তু ভাববেন না, আমাদের সব সমাসই এ রকম।

জল-পানি, বাজার-উটকো, মাল-মশলা, ঘটি-বাটি, টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসা, ইস্কুল-কলেজ অন্য ধরনের সমাস ॥

## কবিগুরু ও নন্দলাল

রসাচার্য নন্দলাল বসুর জীবন এমনই বহু বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, তিনি এতই নব নব অভিযানে বেরিয়েছেন যে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া অতি কঠিন, শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। তদুপরি যিনি সে পরিচয় দিতে যাবেন তাঁর সর্বরসসৃষ্টিতে অপর্যাপ্ত কৌতূহল ও সে রস আস্বাদন করার মত অপ্রচুর

স্পর্শকাতরতা থাকার একান্ত, অত্যন্ত প্রয়োজন। মানবসমাজে নন্দলাল ছিলেন স্বল্পভাষী তথা আত্মগোপনপ্রয়াসী—তাঁর নীরবতার বর্ম ভেদ করে তাঁকে সর্বজন সম্মুখে স্বপ্রকাশ করার মত ক্ষমতা, সে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শৈলী ও ভাষার উপর অধিকার এ-যুগে অত্যল্প আলঙ্কারিকেরই আছে। আমাদের নেই; আমরা সে দুঃসাহস করি নে।

আমরা তাঁকে চিনেছি, গুরু রূপে, রসসৃষ্টির জগতে বহু বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সতত রত স্রষ্টা রূপে এবং কবিগুরুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও সহকর্মী রূপে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বভারতীতে প্রধানত পণ্ডিতদেরই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—আচার্য বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন, অ্যানড্রুজ, কলিন্‌স, শ্যামের রাজগুরু, উইনটারনিৎস, লেভি, গোস্বামী নিত্যানন্দ, জগদানন্দ ইত্যাদিকে। এঁদের কেউই রসস্রষ্টা ছিলেন না, এমন কি যে দিনেন্দ্রনাথ সঙ্গীতে, কাব্যে অসাধারণ সৃজনশক্তি ধরতেন তিনি পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব সৃজনশক্তির দ্বার রুদ্ধ করে সর্বক্ষমতা নিয়োজিত করেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের রক্ষণাবেক্ষণ কর্মে। একমাত্র নন্দলালই এই পরিপূর্ণ পাণ্ডিত্যময় বাতাবরণের মাঝখানে অপ্রমত্ত চিত্তে আপন সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত ছিলেন।

রবি নন্দ সম্মেলন যেন মণিকাঞ্চন সংযোগ। এ তত্ত্ব অনস্বীকার্য যে রস কি, চিত্রে, প্রাচীরগাত্রে তথা দৃশ্যমান কলার অন্যান্য মাধ্যমে তাকে কি প্রকারে মূর্তায় করা যায় এ-সম্বন্ধে নন্দলাল তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে উৎকৃষ্টতম শিক্ষাদীক্ষা লাভ করেন। তাই নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আগমন করার পূর্বেই বঙ্গদেশ তথা ভারতে সুপরিচিত ছিলেন ও পশ্চিমের বহু সদাজাগ্রত রসিকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কবিগুরুর নিত্যালাপী সখা, সহকর্মী ও শিষ্য রূপে শান্তিনিকেতনে আসন গ্রহণ করার পর তাঁর চিন্ময়ভুবন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধতর হতে লাগলো ও রবীন্দ্রাহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সংস্পর্শে এসে তিনি এমন সব বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি হলেন যেগুলো সচরাচর সাধারণ আর্টিস্টকে আকৃষ্ট করে না। একটি মাত্র উদাহরণ নিবেদন করি: দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন, বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায় তথা অন্যান্য জ্ঞানচক্রে শতাধিকবার আলোচনা করেছেন, তর্কবিতর্ক উদ্বুদ্ধ করেছেন। ১৯২১ থেকে পূর্ণ কুড়িটি বৎসর এসব সম্মেলনে নন্দলাল উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু আমি তাঁকে কখনো (১৯২১-২৬) এ সবেতে অংশগ্রহণ করতে দেখি নি।

অথচ ১৯৩৬।৩৭-এ বরোদার মহারাজা যখন তাঁকে সেখানকার কীর্তিমন্দিরে দেয়ালছবি (ম্যুরাল) আঁকতে অনুরোধ করলেন তখন তিনি চার দেয়ালে এঁকে

দিলেন 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা'। ১। 'গঙ্গাবতরণ' ( গঙ্গা বিনা যে ভারতে আর্যসভ্যতার পত্তন ও বিকাশ হত না সে কথা বলাই বাহুল্য ), ২। 'কুরুক্ষেত্র', ৩। 'নটির পূজা', ৪। 'মীরাবাঈ' ( 'সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঁঈ'—চিত্রে )। আর্য, হিন্দু, বৌদ্ধ, মধ্যযুগীয় ভক্তি এই চার দৃষ্টিবিন্দু থেকে নন্দলাল দেখেছেন ভারতের সমগ্র ইতিহাস।

কিন্তু এহ বাহ্য। আসলে যদ্যপি চিত্রের মাধ্যমে রসসৃষ্টি সম্বন্ধে নন্দলাল পরিপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষা গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, সে রস কাব্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে কি ভাবে প্রকাশ পায় সেটি তিনি দেখতে পেলেন দিনের পর দিন, বহু বৎসর ধরে শান্তিনিকেতনে। রসের প্রকাশে কোন্ কলার অধিকার কতখানি নন্দলাল সে সম্বন্ধে পরিপূর্ণ মাত্রায় সচেতন হলেন শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে। কারণ রবীন্দ্রনাথ প্রকৃত আলঙ্কারিকের ( নন্দনতত্ত্বজ্ঞের ) ন্যায় রস নিয়ে আলোচনা করার সময় নিজেকে সাহিত্য, সঙ্গীত বা নাট্যরসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন না। স্বনামধন্যা স্টেলা ক্রামরিশের সঙ্গে তিনি দিনের পর দিন রস নিয়ে যে আলোচনা ( হোয়াট ইজ আর্ট ? ) করেন তাতে টলস্টয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রও বাদ পড়তো না এবং তিনি বেটোফনের 'ক্রয়েৎসার সনাটা'-র বিরুদ্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন সেটিও উভয়ের মধ্যে আলোচিত হত। এসব আলোচনা সাধারণত হত বিশ্বভারতীর সাহিত্য সভায়—এবং নন্দলাল সে-স্থলে নিত্য-নীরব শ্রোতা। সে-সময় নন্দলালের চিন্তাকুটিল ললাটের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেই স্পষ্ট বোঝা যেত, আর্ট সম্বন্ধে তাঁর যা ধারণা, অভিজ্ঞতা, তাঁর যা আদর্শ সেগুলোর সঙ্গে তিনি এ-সব আলোচনার মূল সিদ্ধান্ত, মীমাংসাহীন জল্পনা-কল্পনা সব কিছু মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছেন।

স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, নৃত্য যতখানি গতিশীল ( ডাইনামিক ) চিত্র ততখানি হতে পারে না। পক্ষান্তরে নটনটী রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভানুমতী থেকে যায় শুধু স্মৃতিতে—বাস্তবে সে অবলুপ্ত। কিন্তু চিত্র চোখের সামনে থাকে যুগ যুগ ধরে—এবং চিত্রের মত চিত্র হলে প্রতিবারেই যে তার থেকে আনন্দ পাই তাই নয়, প্রতিবারেই সেই প্রাচীন চিত্রে নব নব জিনিস আবিষ্কার করি, নিত্য নিত্য নবীন রসের সন্ধান পাই। তাই কোনো নৃত্য-দৃশ্য যদি চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট করা যায়, তবে মঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে যে-চিত্রের চিরতরে অবলুপ্ত হওয়ার কথা ছিল, সে হয়ে যায় অজর অমর। কিন্তু 'চিত্রে সার্থকরূপে পরিস্ফুট' করার অর্থ, সে যেন ফটোগ্রাফ না হয়—তা হলে মনে হবে, নর্তক-নর্তকী নৃত্যকলা প্রকাশ করার সময় হঠাৎ যেন মুহূর্তেক তরে পাষাণ-

পুত্তলিকায় পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। যাঁরাই নন্দলালের 'নটীর পূজা' চিত্রটি প্রাচীরগাত্রে দেখেছেন, তাঁরাই আমার সামান্য বক্তব্যটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। সে চিত্র তো স্টাটিক নয়, 'স্তম্ভিত' নয়—বস্তুত তার দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, এই বুঝি নটী আরেকখানি অলঙ্কার গাত্র থেকে উন্মোচন করে দর্শকের দিকে, আপনারই দিকে অবহেলে উৎক্ষেপ করবে, এই বুঝি মৃদঙ্গে ভিন্ন তাল ভিন্ন লয়ের ইঙ্গিত ভেসে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে নটী তার নৃত্য দ্রুততর করে দেবে, লাস্য-নৃত্য তাণ্ডবে পরিণত হবে, মন্দমন্থর 'নমো হে নমো' অকস্মাৎ অতিশয় দ্রুত 'পদযুগ ঘিরে' 'চন্দ্রভানু'র মদমত্ত নৃত্যে নবীন বেশ গ্রহণ করবে।

বস্তুত আপন মনে তখন প্রশ্ন জাগবে, নন্দলাল মঞ্চে বিভাসিত যে-নৃত্য স্বচক্ষে দেখেছিলেন, সে-নৃত্য কি সত্যই এতখানি প্রাণবন্ত, উচ্ছ্বসিত—শান্ত থেকে মন্থর, মন্থর থেকে উন্মত্ত—প্লাবন বেগে ধাবিত ছিল, না তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর নিজস্ব কল্পলোকের মৃন্ময় নৃত্যের আদর্শ প্রকাশ।

* *

সুন্দরের পরিপূর্ণ আনন্দ-রূপের ধ্যানের বীজমন্ত্র নন্দলাল গ্রহণ করেন কবি-গুরুর কাছ থেকে। এবং তার সর্বোচ্চ বিকাশে সে বীজের যেন কোনো চিহ্নই নেই। সে যেন পত্রপুষ্পে বিকশিত মহীরূহ।

এবং একমাত্র নন্দলালই তাঁর গুরুর উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। সকলেই জানেন, পরিপূর্ণ বৃদ্ধ বয়সে কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রের মাধ্যমে আপন সৃজনী-শক্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু কবির প্রভাবে ছবির নন্দলাল তো কখনো কবিতা রচনা করেন নি!॥

## খেলেন দই রমাকান্ত

ইহুদি যাজক সম্প্রদায়ের সুপুত্র শ্রীযুত লেভির সঙ্গে তাঁর বাড়িতে খানা খেতে যাচ্ছি। তাঁর আছে গল্পের অফুরন্ত ভাণ্ডার। তারই একটা ছাড়লেন:

"জারের আমলে রববার দিন গির্জেয় গেছে গ্রামের সবাই। রুশ জাতটা একদা ছিল বড়ই ধর্মানুরাগী। কুলোকে বলে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূতপ্রেত-তাবিজ-কবচে-বিশ্বাসী উজবুকের ভায়রাভাই। এবং সাতিশয় পাষণ্ডেরা বলে, সেই প্রাচীন কুসংস্কারই আজ তাদের টেনে নিয়ে যায় লেনিনের দর্গায় শির্ণী চড়াতে।

তা সে যাক্ গে—মোদ্দা কথা : তারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে, তাদের গাঁয়ের পাদ্রি সায়েব যা বলেন তাই আপ্তবাক্য। যদ্যপি এসব পাদ্রিদের অনেকেই নিজের নামটি পর্যন্ত সই করতে পারে না—"

আমি শুধালুম, "নিরক্ষর জন গির্জায় ধর্মোপদেশ দেয় কি প্রকারে ?"

বললেন, "আশ্চর্য ! রাসপুতিন যে কী মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কুল্লে আড়াই আউন্স বাইবেল গলাধঃকরণ করতে পেরেছিলেন সে না হয় পড়ো নি, তাই জানো না। নিচ্চেভো—অর্থাৎ কুছ পরোয়া নেহী। সেই আড়াই আউন্স বাইবেল ডাইলুট করে তিনি মহারাণী জারিনা মায় জার প্রাসাদ জয় করলেন। তাঁকেও নাম সই করতে হলে ঘেমে নেয়ে কাঁই হতে হত।

আর এরই উল্‌টো দিক—অর্থাৎ ভালোর দিকের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ খুঁজতে হলে অন্তত তোমাকে তো আর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু অবধি মাকু মারতে হবে না। তোমার নবী পয়গম্বর তো ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ! তা সে যাক্ গে !

সে রববারে পাদ্রি সায়েবের সারমন বা বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ইহুদিরা কী অন্যায়ভাবে প্রভু যীশুকে ক্রুশের উপর খুন করলো। এ বিষয়ে বক্তৃতা শিক্ষিত অশিক্ষিত সব পাদ্রিই দেন। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, শিক্ষিত পাদ্রি জানেন, প্রভু যীশু ক্রুশের উপর থেকে তাঁর হত্যাকারীদের ক্ষমা করে গিয়েছিলেন। তাই তিনি বক্তৃতা দেবার সময় সতত সতর্ক থাকেন, অজ্ঞ খৃষ্টানগণ যেন উত্তেজিত হয়ে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ না করে। কিন্তু ঐ যে রুশ পাদ্রির কথা বলছিলুম, তিনি সেদিন উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন, কি প্রকারে মূঢ় জনতাকে প্রতিহিংসাপরায়ণ করে তোলা যায়। অবশ্য তার জন্য অত্যধিক বাগ্মিতাশক্তির কোনো প্রয়োজন নেই—কারণ রুশ দেশে আবহমান কাল থেকে ইহুদিবৈরিতা বংশানুক্রমে চলে আসছে। কাজেই সারমন শেষেই বিক্ষুব্ধ চাষীরা একজোট হয়ে ধাওয়া করলো মাঠের অন্য প্রান্তের খাস ইহুদি গ্রামটার দিকে। দূর থেকে তাদের চিৎকার হুঙ্কার শুনে ইহুদিরা ব্যাপার কি জানবার জন্য গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল। তাদের চিৎকারে তখন পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে—'খুন করবো, ব্যাটাদের খুন করে রক্ত দিয়ে রক্তের দাদ নেব !'

সবাই একে অন্যকে চেনে। তাই ইহুদি গাঁওবুড়ারা করজোড়ে শুধালে, 'আমরা কি অপরাধ করেছি যে আমাদের খুন করবে, এতকাল ধরে পাশাপাশি গ্রামে বাস করছি—'

উত্তেজিত জনতা বললে, 'চালাকি রাখো। তোমরা আমাদের প্রভুকে খুন করেছ, তার দাদ আমরা নেবই নেব।'

যেন পর দিনের ঘটনা! লেভি গল্প বলা ক্ষান্ত দিলেন। কারণ হঠাৎ পিটির পিটির করে বৃষ্টি নামলো। এই পোড়ার দেশে মনসুন নেই বলে বারো মাসের যে কোনো দিন আচম্‌কা বৃষ্টি নামে। আমি বললাম, "চলুন, হ্যার ডক্টর, ট্রাম শেড্‌-এ আশ্রয় নি।"

বললেন, "ছোঃ! কিস্‌সু জানো না। ইহুদিরা ছাতা কেনে না কেন, তার খবর রাখো? খৃষ্টানদের বিশ্বাস, ইহুদিরা এমনই দুর্দান্ত চালাক যে, বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে জামাকাপড় বাঁচিয়ে দিব্য চলাফেরা করতে পারে। তারপর কি বলছিলুম? —সেই রুশ ইহুদিদের কথা। তারা ছিল সত্যই চালাক। চট করে ভেবে নিয়ে দেখলে, ঐ সব জড়ভরত কেরেস্তান রুশদের বোঝানো হবে অসম্ভব, ঘটনাটা ঘটেছে দু' হাজার বছর পূর্বে, রুশ দেশে নয়—বহু দূর-দূরান্তরের প্যালেস্টাইনে—যারা মেরেছিল, তারা সেই দেশ ছেড়ে কবে কোন্ আদ্যিযুগে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সর্বত্র, বিয়ে করেছে জাতেবেজাতে—এখন যাদের ঠ্যাঙাতে যাচ্ছো—"

আমি বললুম, "বুঝেছি। খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবর্দ্ধন।"

লেভি বললেন, "লাখ কথার এক কথা।"

অতএব ইহুদি ডাক্তরিয়ারা হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'ইহুদিরা প্রভু যীশুকে না হক খুন করেছিল. এ তো অতিশয় সত্য কথা—বিশ্ব-সংসার জানে। কিন্তু ভাই, তোমরা করেছ ভুল। আমরা, এ গাঁয়ের লোক, ওঁকে মারি নি—তা কখনো পারি! মেরেছ—' বলে আঙুল দিয়ে দেখালে পাশের গাঁ। বলল, 'মেরেছে ঐ ও—ই গাঁয়ের ইহুদি রাস্কেলরা!' বুঝলে তো ভায়া?" বলে লেভি গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আমি একগাল হেসে বললাম, "যা শত্রু পরে পরে। কিন্তু গল্পটা তো সে রকম ঝাঁঝালো না—আপনার সেদিনকার রাব্বি, জানলার শার্সি আর আয়নাতে তফাৎ নিয়ে গল্পটার মত?"

লেভি বললেন, "ক্যারেকটারিস্টিক গল্পের ফান্‌কশন হচ্ছে কোনো বিশেষ জাত বা শ্রেণী বা যা-ই হোক না কেন, তার ক্যারেকটার, তার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। ভেড়ার বাচ্চা আর নেকড়ে বাঘের মধ্যে তর্কাতর্কি নিয়ে যে গল্প ঈসপ লিখেছেন, সেটাতে ঝাঁঝ কোথায়? কিন্তু গল্পটা সাতিশয় ক্যারেকটারিস্টিক—অর্থাৎ ভেড়া আর নেকড়ের ক্যারেকটার ওতে চমৎকার ফুটে উঠেছে—নইলে গল্পটা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়লো কি করে, আর এত যুগ ধরে বেঁচে আছেই বা কি করে? আমি রুশ ইহুদিদের সম্বন্ধে যে গল্পটা বললুম—গল্প না হয়ে সত্য ঘটনাও হতে পারে—সেটা কিন্তু সর্ব-ইহুদিদের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বিপদকালে তারা

এক হতে তো জানেই না, বরঞ্চ নিজেকে বাঁচাবার জন্য তার জাতভাই অন্য ইহুদিকে বিসর্জন দিতেও তার বাধে না।"

আমি বললুম, "উঁহু।"

"মানে?"

আমি বললুম, "আমার দেশ বাঙলার উত্তর প্রান্তে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়, স্বার্থ থাক আর নাই থাক, তাঁরা একে অন্যের সাহায্য কস্মিনকালেও করেন না। একটা নদী পেরুবার সময় নাকি পর পর পাঁচজন ব্রাহ্মণ একটা পাথরে ঠোক্কর খান, কিন্তু কেউই পরের জনকে হুঁশিয়ার করে দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শেষটায় একজন যখন 'বাপ রে' বলে অন্যদের সাবধান করে দিলে, তখন তাঁরা সবাই সমস্বরে চিৎকার করে বললেন, 'ব্যাটা নিশ্চয়ই আমাদের শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নয়।' তখন ধরা পড়লো, সত্যি, সে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—বর্ণচোরা আঁবের মত এঁদের সঙ্গে মিশে এঁদেরই একজন হতে চেয়েছিল। গল্পটা আপনারই সংজ্ঞা অনুযায়ী খুবই ক্যারেকটারিস্টিক বটে, কিন্তু আমার মনে এ বাবদে একটা ধোঁকা রয়ে গেছে।"

লেভি বললেন, "তুমি দেখি হেরোডকেও হেরোডত্ব শেখাতে চললে—অর্থাৎ যাকে বলে গুরুমারা বিদ্যেতে ওস্তাদ হয়ে উঠছো। বুঝিয়ে বলো।"

আমি বললাম, "যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর গল্পটি আপনাকে বললাম, তাঁরা যে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এবং বুদ্ধিমান জীব মাত্রেই ঐক্যে বিশ্বাস করে। তাই আমি বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলুম, এঁরা একে অন্যকে খুবই সাহায্য করে থাকেন—যে রকম ফ্রীমেসনরা একে অন্যের প্রতি বড়ই সদয়—কিন্তু সে সাহায্যটি করেন অতিশয় সঙ্গোপনে। এবং অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা যাতে করে এ-তত্ত্বটি আবিষ্কার না করতে পারেন, তাই তাঁরা নিজেরাই বাজারে একাধিক কামুফ্লাজ গল্প ছেড়েছেন এই মর্মে যে, তাঁদের ভিতর মারাত্মক ঐক্যাভাব। তাই আমার মনে হয়, আপনি যে গল্প দিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, ইহুদিরা সঙ্ঘবদ্ধ হয় না, সেটা স্বয়ং ইহুদিরাই তৈরি করেছেন, খৃষ্টানদের সন্দেহ না জাগানোর জন্য।"

ইহুদি আর স্কচমেনের একটা মহৎ গুণ—তাদের নিয়ে কেউ রসিকতা করলে সেটা তারা উপভোগ করতে পারে। লেভি আমার সত্য-সিদ্ধান্ত শুনে হেসে বললেন, "এটা আজ খানা-টেবিলে আমি পেশ করবো। দেখি, ঠাকুদা-বাবা কি বলেন। কিন্তু জানো, এর থেকে একটা গুরুতর সমস্যায় উপনীত হওয়া যায়। তুমিই সেদিন প্রশ্ন করেছিলে, ইহুদিরা যে প্যালেস্টাইনে 'হোম' বানাতে

চায়, সেটা ভালো না মন্দ? আমি বলেছিলুম, সময় এলে আলোচনা করা যাবে। তাই এস্থলে প্রশ্ন শুধানো যায়, পৃথিবীর সব ইহুদি এই হোম চায় কি না? এই দাবির পিছনে কি তারা ঐক্যবদ্ধ? তোমার প্যারা কবি হাইনে একদা এই আন্দোলনের সঙ্গে—ঠিক ঠিক বলতে গেলে ঐ আন্দোলনের আলোচনা-চক্রের সঙ্গে—সংযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই তিনি সে-চক্র থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলেন। তার থেকে অবশ্য এ'টা বলা চলে না, প্যালেস্টাইনে ইহুদি হোম নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। আসলে ব্যাপারটা অন্য ধরনের; সংখ্যালঘুদের ভিতর এক রকম লোক থাকে, যারা আপন সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায় না—তারা ভাবে, বাড়িতে বাপ-ভাই তো সে-গণ্ডি বানিয়ে রেখেছেনই, বাইরে গিয়েও তাঁদেরই জাতভাইদের সঙ্গে মিশে কি লাভ? আমার মনে হয়, হাইনের বেলা হয়েছিল তাই।" তারপর হঠাৎ রাস্তার উপরই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমার দেশে তুমিও তো লঘু সম্প্রদায়ের লোক। তুমি দেশে কাদের সঙ্গে মেলামেশা করো?" উত্তর দেবার পূর্বেই তিনি বললেন, "এ-বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলতে পারে, অতএব এটা এখন মুলতুবী থাক, কারণ, বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি।"

বাউমশূল আলের শেষ প্রান্তে ছোট্ট একখানা ছিমছাম তেতলা বাড়ি।

ল্যাচ কী দিয়ে দরজা খুলে বললেন, "স্বাগত জানাই তোমাকে। মঙ্গল হোক, জয় হোক তোমার। তোমার বংশধর যেন অসংখ্য হয়।" ॥